উজ্জ্বল উদ্ধার

উজ্জ্বল উদ্ধার

পরেশ ভট্টাচার্য

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩,

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
তরুণ চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ
২৩ জানুয়ারী
১৯৬০

উজ্জ্বল উদ্ধার

॥ ১ ॥

ছেলে বেরিয়ে গেলে অঞ্জলি দেবী হাঁটু ভেঙে ঘরের মাঝখানে সুটকেস গুছোতে বসলেন। একটি মাদুর পেতে তার উপর ছড়িয়ে ফেললেন সব জামা-কাপড়, দেখে ভেবে ভেবে ঠিক করতে লাগলেন, কোনটা যাবে আর যাবে না।

গরম কাপড়ের সুটকেস। সব কিছু রোদে দিয়ে দু'দিন যাবৎ মটমটে করে শুকোনো হয়েছে, টুটা-ফাটা সেলাই করা হয়েছে, ধোপা দিয়ে ইস্তিরি করানো হয়েছে। বেশিরভাগই জীর্ণ, সেগুলো দেয়ার কোনো মানে হয় না, মিছিমিছি ভা'র বাড়ানো। সরিয়ে রাখলেন সেগুলো।

বেলা পড়ে এসেছে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন, পাশের বাড়ির দেয়ালে প্রতিহত হয়ে দৃষ্টি ফিরে এলো। বড্ড চাপা বাড়িটা। একটা দিকেও তাকিয়ে আকাশ দেখা যায় না। অথচ এ বাড়ির ভাড়াই একশো পঁচিশ টাকা।

পুরন্দর 'বদলাবো' 'বদলাবো' করছিলো, এরই মধ্যে যাওয়া ঠিক হয়ে গেল।

ছেলের যাবার কথা ভেবেই চোখ সজল হয়ে উঠলো, ভেবে পেলেন না ওকে ছেড়ে তিনি থাকবেন কী করে। জীবনধারণের আর কী অর্থ বাকি থাকবে ও চলে গেলে। অথচ এমন একটা সুযোগ পেয়েও না যাবার কথা ওঠে না। তাছাড়া বিদেশ যাওয়া ওর চিরকালের বাসনা।

ছোট্ট পুরন্দরকে মনে পড়লো তাঁর, এইটুকু একরত্তি একটা মানুষ মা ছাড়া যার কেউ নেই, প্রতি পলকে যার মায়ের প্রয়োজন, যে মা তাকে ফেলে অতি দুঃখেও গলায় দড়ি দিতে পারেনি।

ভাবা যায় না। সেই ছেলে তাঁর সত্যি বেঁচে থেকে লেখাপড়া শিখে এতো বড়ো হয়েছে। এতো যোগ্য হয়েছে। আর এখন একটা বৃত্তি নিয়ে বিলেত যাচ্ছে আরো উচ্চতর শিক্ষার আকাঙ্ক্ষায়। আহা, সোনা আমার, তোর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক, তুমি বড়ো হও, আরো, আরো বড়ো, সব অর্থেই বড়ো হয়ে ওঠো, আর আমার চাইবার কিছু নেই।

অঞ্জলি শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে কাজে মন দিলেন। সুটকেসটা উপুড় করে ঝেড়ে নতুন কাগজ পাতলেন, পুরনো কাগজটা ফেলে দিতে গিয়ে পোকায় কাটা হলদে হয়ে যাওয়া একটি পোস্টকার্ড সাইজ ছবি টুক করে কোলের উপর যেন আশ্রয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভুরু কুঁচকে চোখের কাছে তুলে এনেই তিনি নিস্তব্ধ হলেন।

ঠিক পুরন্দরের বয়সী আর একটি যুবক। সুন্দর দেখতে, ঘন চুল উলটে আঁচড়ানো, হাতে সিগারেট, মুখে মৃদু একটি হাসির আভা। ছবিটা কবে তোলা হয়েছিলো, কে তুলেছিলো সব মনে পড়ে গেল। তিনি গুছোবার কথা ভুলে তাকিয়ে রইলেন ছবিটার দিকে, ভুলে থাকা সমস্ত অতীত একসঙ্গে প্রচণ্ড ঢেউ হয়ে এসে আছড়ে পড়লো হৃদয়ের তটে।

ভাবতে গেলে সারাটা জীবন কী ভাবেই না কাটলো। সেই কোন বালিকা বয়েস থেকে কেবল দুঃখের স্বাদ ছাড়া আর কিছুই জুটলো না কপালে। কেন? কী অপরাধ তিনি করেছিলেন? মায়ের মৃত্যুর দিনটা ভাবলে এখনো বুকের মধ্যে ভয় আর কষ্ট একসঙ্গে চাপ দিতে থাকে। মায়ের চেহারাটা একটুও মনে নেই। শুধু ধু ধু একটু স্মৃতি। অথচ মা যে মারা গেলেন, বাড়িতে যে একটা চাপা-চাপা কোলাহল উঠলো, কাকগুলো যে উঠোনের এঁটো বাসনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কা কা করে উড়তে লাগলো, এই দৃশ্যগুলো এখনো স্পষ্ট।

সবাই বলছিলো, 'ইস, কী ভাবে মারা গেল! এরই নাম অপমৃত্যু।'

মফস্বল শহর, মাকে বাঁচাবার জন্য রক্ত দরকার ছিলো, মনে আছে বাবা উদ্‌ভ্রান্তের মতো কলকাতা চলে গেলেন রক্ত কিনতে, যখন ফিরে এলেন, শুধু রক্তই নয়, একজন ডাক্তারও এলেন সঙ্গে। কিন্তু মা ততোক্ষণে ছেড়ে গেছেন সবাইকে।

বাবা গিয়েছিলেন ভোর ছটায়, বাবা ফিরেছিলেন ছটা বেজে তেত্রিশ মিনিটে। ডাক্তার ভদ্রলোককে শেষে চিকিৎসার বদলে মৃত্যুর পরোয়ানা লিখতে হলো।

প্রতিবেশীরা সব ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলো। ঠাকুমা ছিলেন, ঠাকুমার কোলেই মাথা রেখে টান টান হয়ে শুয়ে ছিলেন মা, গায়ের গন্ধ নিয়ে মায়ের শাড়িগুলো আলনায় ঝুলছিলো, দুটো ব্লাউজ পাট পাট করে ভাঁজ হয়ে পড়ে ছিলো খাটে, চুলের কাঁটা ফিতে, পায়ের স্যান্ডেল সব, সব তেমনি টাটকা ব্যবহৃত চেহারা নিয়ে এখানে ওখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, হঠাৎ মা-ই কোথায় চলে গেল। সাত-আট বছরের মেয়ে অঞ্জলি মৃত্যুকে তখনো সম্যক উপলব্ধি করতে শেখেনি। সে খানিকক্ষণ কাঁদছিলো, খানিকক্ষণ খেলছিলো, খানিকক্ষণ ব্যস্ত ছিলো খাওয়াদাওয়া নিয়ে। মাকে যে কখন বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে গিয়েছিলো সে দেখেনি। তার আগেই তাকে তাদের কোনো আত্মীয়া ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে অবিশ্যি সে ক্রমাগতই বাড়ি ফেরার জন্য কান্নাকাটি করছিলো, তার কেমন একটা নির্বোধ কষ্ট হচ্ছিলো বুকের মধ্যে, সব কিছুর মধ্যেই সে কান্নার উপাদান খুঁজে পাচ্ছিলো। মা যে চোখ বুজে ঠাকুমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন, এই দৃশ্যটা যতোবার মনে পড়ছিলো ততোবার সে ফুঁপিয়ে উঠছিলো ভিতরে ভিতরে। আত্মীয়া বলেছিলেন, 'কাঁদছো কেন? তোমার মা শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন।'

হাউহাউ করে উঠে সে বলছিলো, 'না, মা ঘুমুবে না, ঘুমুবে না। আমি মার কাছে যাবো, মাকে জাগিয়ে দেবো।'

তবু ওরা তাকে বাড়ি নিয়ে এলো না। কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে জোর করে রেখে দিল, খাওয়ালো, ঘুম পাড়ালো। এলো পরের দিন দুপুরে। এসে দেখলো, বাবা লম্বা হয়ে পড়ে আছেন মেঝেতে, দুই চোখ লাল। ঠাকুমা তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। সে ব্যাকুলভাবে বললো, 'মা কই? আমার মা

কই?' ঠাকুমা ঠোট কামড়ে বললেন, 'স্বর্গে।' মাথা ঝোঁকে সে বললো, 'আমিও স্বর্গে যাবো। আমি মার কাছে যাবো।'

ঠাকুমা বললেন, 'ষাট, ষাট, ওকথা বলতে হয় না, ঈশ্বর মাকে নিয়েছেন, মা শান্তিতে আছেন। মা কষ্ট পাচ্ছিলেন, এখন আর তাঁর কোনো কষ্ট নেই।'

এ কথা শুনে হঠাৎ চিৎকার করে সে কাঁদতে লাগলো, ও ঘর থেকে বাবার কান্নাও সশব্দ হলো। ঠাকুমাও আর পারলেন না, বুক চাপড়ে বললেন, 'হতভাগী, এ তুই আমাকে কী জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে রেখে গেলি!'

ঠাকুমা মাকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসতেন। মায়ের মৃত্যুতে তাঁর সন্তানশোক হয়েছিলো। ঐ এক ছেলে নিয়ে অল্প বয়সের বিধবা তিনি, ছেলে তাঁর অতি দুঃখের ধন, অতি যত্নে তাঁকে মানুষ করেছিলেন। বাবা চাকরি করতে শুরু করলেই বিয়ে দিতে উৎসুক হলেন। বললেন, 'ঘর ভরুক। আর আমি একা পারি না।' ঘর ভরতে অবশ্য একটু দেরি হয়েছিলো, বিয়ের পাঁচ বছর বাদে তার জন্ম হলো। ভগবানের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন করতে হয়েছিলো সেজন্য, অনেক ঠাকুরকে অনেক ফুল-বেলপাতার অঞ্জলি দিতে হয়েছিলো, আর সেইজন্যই নামও তার অঞ্জলি হলো।

আদর আর আদব। সারা বাড়িটা একেবারে উন্মুখ হয়ে থাকতো সেই অঞ্জলিকে ভালোবাসার জন্য। অঞ্জলি তাদের অনেক আরাধনার ধন। অঞ্জলিকে পেয়ে তারা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ, জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ।

মা বাবা ঠাকুমা — ছোট সংসারের সকল সুখ উপচে পড়ছিলো তাকে নিয়ে।

আট বছর বাদে মা যখন আবার অন্তঃসত্ত্বা হলেন ঠাকুমার আর আনন্দ ধরে না। কতো যে যত্ন করতেন। এতোদিন পরে বলে কতো ডাক্তার, কতো ওষুধ। বলতেন, ভগবান যখন আবার দয়াই করেছেন, এবার একটি ছেলে হোক, আর চাই না।'

কিন্তু সেই সাধ আর মিটলো না। একদিন খুব বৃষ্টি নামলো, উঠোনে শুকনো কাপড় তাড়াতাড়ি তুলতে এসে মা পা হড়কে পড়ে গেলেন। ভীষণভাবে পড়লেন, মাথায় চোট লেগে সাংঘাতিক আহত হলেন, তার উপরে পেটে চোট লেগে সমস্ত উঠোনময় রক্তগঙ্গা বয়ে গেলো। 'সর্বনাশ হয়েছে' বলতে বলতে দৌড়ে এলেন ঠাকুমা, আর বারান্দায় বসে খেলতে খেলতে অঞ্জলি কেঁদে উঠলো জোরে।

না আর থামলো না সেই কান্না। আজ পর্যন্তও সেই কান্নাই কেঁদে চলেছেন তিনি। ভাবতে ভাবতে বড়ো বড়ো চোখে তাঁর বিষাদ ঘনিয়ে এলো। হাতের ছবিটা আস্তে আস্তে রেখে দিলেন পাশে।

এক সময়ে সবাই তাঁকে সুন্দর বলতো। ঠাকুমা বলতেন মায়ের রূপ পেয়েছে। অঞ্জলি দেবী ভাবেন, মায়ের রূপটা না পেয়ে কপালটা কেন পেল না। মা যতোদিন বেঁচেছিলেন, ভালোভাবেই তো ছিলেন। স্বামীর প্রেম, শাশুড়ির স্নেহ, সন্তানের মমতা, সব ছিলো। সব নিয়েই তিনি গেছেন। মেয়ের জন্য আর অবশিষ্ট রেখে গেলেন না কিছু।

মা গো, তুমি আমাকেও কেন নিয়ে গেলে না?

আরো অনেক দিনের মতো অঞ্জলিদেবী আজো মনে মনে এই কথা বলে অব্যক্ত অস্ফুট কান্নায় অভিভূত হলেন।

॥ ২ ॥

অবশ্য মা না-থাকলেও ঠাকুমা ছিলেন, ঠাকুমার আদর অল্প দিনের মধ্যেই ছোট অঞ্জলির কচি অন্তরের কাঁচা ঘা শুকিয়ে দিয়েছিলো, মায়ের বুকের তাপ সে ঠাকুমার বুকের মধ্যেই আবার ফিরে পেয়েছিলো।

তাছাড়া বাবা — বাবাও তো ছিলেন? স্ত্রীর শোকে পাগল বাবা, মেয়ের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন। বৈধব্য পালন করছিলেন বাবা। সাদা কাপড় পরতেন, মাছ খেতেন না, দাড়ি কামাতেন না। যতোটুকু আফিস শুধু সেটুকুই ছিলো তাঁর বাইরের জীবন, বাদ বাকি সমস্ত সময়টাই কাটতো মেয়েকে নিয়ে। একেবারে চোখে হারাতেন।

শহরের প্রান্তে ছোট একটা নদী ছিলো, মা বেঁচে থাকতে বাবা আর মা প্রায়ই রাত্রিবেলা হেঁটে হেঁটে সেই নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন, অঞ্জলিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যেতেন তাঁরা, সে শুয়ে থাকতো ঠাকুমাব কাছে। নদীটাব নাম ছিলো নিস্তারিণী। মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা একা একাই সেই নিস্তারিণীর ধারে গিয়ে শুয়ে থাকতেন। ঠাকুমা চিন্তা করতেন তাই নিয়ে, যতোক্ষণ না বাবা ফিরে আসতেন ঘুমুতে পারতেন না। একদিন আপিস থেকে ঠাকুমা বাবাকে জলখাবার দিয়েই অঞ্জলিকে হাত মুখ মুছিয়ে লাল ফ্রক পরিয়ে, মাথায় লাল রিবন বেঁধে সাজিয়ে দিলেন। শিখিয়ে দিলেন, 'বাবাকে বলো গিয়ে, তোমাকে নিয়ে নিস্তারিণীর ধাবে বেড়াতে যেতে।'

ছোট্ট অঞ্জলি খুশিতে হাততালি দিলো, 'আমি নদীব ধারে যাবো, আমি নদীর ধারে যাবো.' বাবার গলা ধরে ঝুলে পড়লো, 'আমাকে নিয়ে চল বাবা।'

বাবা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললেন, 'চলো।' ঠাকুমার কৌশল কাজে লাগলো। বাবা যেতেন রাত্রিবেলা খেয়ে উঠে, ফিরতেন অনেক দেরিতে। কিন্তু ঐটুকু মেয়েকে নিয়ে সেটা সম্ভব নয়। বিকেলে গিয়ে খানিক বাদেই ফিরে আসতে হতো। সেই থেকে সেটাই নিয়ম হলো।

এই করে করেই মাস পাঁচেক কেটে যাবার পরে অনেকটা শান্ত হলেন তিনি, বাড়ি থেকে শোকের ছায়াটা আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগলো। ঠাকুমা বললেন, 'এইবার অঞ্জুকে ববং বড়ো ইস্কুলে ভর্তি করে দে।'

মা থাকতে বাড়ির কাছেই একটা ছোটদের ইস্কুলে যেতো সে। মা নিয়ে যেতেন, নিয়ে আসতেন। সেই পড়া সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিলো, মা-ই বড় ইস্কুলে ভর্তি করার তোড়জোড় করছিলেন।

তার মধ্যেই এই।

বোধ হয় সেই কথা মনে পড়ে গেল বাবার, চুপ করে থেকে বললেন, 'এখন কী? যাক না আর কিছু দিন।'

ঠাকুমা বললেন, 'পাড়ায় কোনো সমবয়সী ছেলেমেয়ে নেই, একা একা ঘুরে বেড়ায়, ইস্কুলে বন্ধুবান্ধব হলে কতো ভালো লাগবে।'

কথাটা মনে ধরলো বাবার, মেয়েকে আদর করে বললেন, 'কী, মা-মণি, রাজি?'

রাজি তো একবাক্যে। ইস্কুলে না জানি কতো সুখ, তাই ভাবছিলো অঞ্জলি। খেলার সঙ্গীর জন্য সে পাগল হয়ে বললো, 'হ্যাঁ বাবা, আজ, আজই ভর্তি করে দাও।'

মফস্বলের ইস্কুল, কলকাতার মতো এমন চাপ নেই যে ভর্তি করা যাবে না। ইস্কুলের দরজা সব সময়েই খোলা। ভর্তির পক্ষে অসময় হলেও অসুবিধে নেই।

নিয়ে গেলেন বাবা, আর গিয়েই দেখা গেলো হেডমিস্ট্রেস ভদ্রমহিলাটি তাঁর চেনা। কালো মোটা আঁটোসাঁটো কড়া চেহারা, চুলের ডৌলটি সুন্দর, গম্ভীর মুখে কাজ করতে করতে চোখ তুলে তাকালেন। প্রথমে বাবা চিনতে পারেননি, বোধ হয় ভালো করে তাকিয়ে দেখেননি, মেয়েকে ভর্তি করতেই ব্যস্ত ছিলেন।

ছোট শহর, সবাই সকলের ঘরের খবর রাখে, আলাপ-পরিচয় করে, তাই মনোরমা খাস্তগীর যখন সহানুভূতির সুরে বললেন, 'আমি শুনেছি কিছুকাল আগে আপনার স্ত্রী মারা গেছেন, ভারি দুঃখের কথা। সেই দুঃখের দিনে আমার নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু পেরে উঠিনি বলে ক্ষমা করবেন।' তখনো বাবা ভেবেছিলেন মহিলাটি ভদ্র বলেই এ বিষয়ে এভাবে কথা বলছেন। মৃদু হেসে বললেন, 'না, না, তাতে কী হয়েছে। ওতে কিছু এসে যায় না।'

মনোরমা খাস্তগীর বললেন, 'আপনার যায় না, কিন্তু আমার তো কর্তব্য আছে?' বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন তিনি, তার গাল টিপে আদর করে দিয়ে বললেন, 'যাও ইস্কুলটা দেখে এসো একটু, তোমার ক্লাস দেখে এসো।'

হঠাৎ কেমন ভয় করলো অঞ্জলির, সে বাবার গা ঘেঁসে দাঁড়ালো। আর তখুনি বাবা মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়ের বিষয়েই কিছু একটা বলতে গিয়ে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, আপনি কি তাপস খাস্তগীরের বোন?'

মনোরমা অভিমানের ভঙ্গি করে বললেন, 'যাক, এতক্ষণে তা হলে চিনতে পেরেছেন? আমি ভেবেছিলাম, না চিনলে আর পরিচয়ই দেবো না। আত্মসম্মান বলেও তো একটা কথা আছে?'

'কী আশ্চর্য। আসলে আমি লক্ষ্যই করিনি এতক্ষণ। ভালো আছেন?'

'এই তো দেখছেন, পনেরো বছর যাবৎ গোরু তাড়াচ্ছি।'

'তাপস কোথায়?'

'দেওঘরে কাঠের ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছে, খোঁজটোজ নেয় না, আমরাও বিরক্ত করি না।'

'আপনার মা—'

'আছেন, আমিই দেখাশুনো করি।'

'কদ্দিন এখানে এসেছেন?'

'তা, মাস আষ্টেক তো হবেই।'

'আট মাস? কী কাণ্ড। কিছুই জানি না, নইলে কবেই দেখা হতে পারতো।'

'তা পারতো বটে।'

'আমি যে এখানে আছি, তা কি জানতেন আপনি?'

'খুব অল্পদিন আগেই জানলাম। আমাদের সেক্রেটারি হরিধনবাবুই একদিন বলছিলেন কীভাবে মারা গেলেন আপনার স্ত্রী, এমনিই অন্য কোনো প্রসঙ্গে উঠে পড়েছিলো কথাটা। আমি আপনার নাম শুনেই খোঁজখবর করলাম।'

'ও।'

'আমাদেরও একটা ভারি দুর্ঘটনা ঘটলো।'

'কী?'

'আমার দিদিকে বোধ হয় আপনি দেখেননি, গৌহাটিতে থাকতেন, হঠাৎ মারা গেছেন।'

'ইশ্‌।'

'খবর পেয়েই চলে গেছেন মা, দুটি বাচ্চা আছে—'

'কত বড়ো?'

'এই এর মতোই একটি, আর একটি তার চেয়ে ছোটো।'

বাবা সজল হয়ে উঠলেন, 'এখন কী হবে?'

'আর কী। আমাদের কাছেই থাকবে, আমরাই মানুষ করবো।'

মনোরমা খাস্তগীর আবার অঞ্জলির দিকে তাকালেন, অপেক্ষমান বেয়ারার দিকেও নজর গেলো তাঁর, গলায় কোমলতা ঢেলে বললেন, 'যাও, ওর সঙ্গে গিয়ে ক্লাস দেখে এসো, কিছু ভয় নেই।'

গলায় যতোই কোমলতা ঢালুন, অঞ্জলি মনোরমার মোটা কাচের চশমার ফাঁকে চোখের দৃষ্টিতে যেন অন্য লিপি পাঠ করলো।

শিশুরা কি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা? শিশুদের হৃদয়ে সত্যিই কি দেবতাদের বাস? নইলে সেই আট বছরের ছোট মেয়েটির তার বাবার সঙ্গে তাদের স্কুলের বড় দিদিমণির পরিচয় থাকাটা কেন ভালো লাগছিল না? কেন মনে হচ্ছিলো, এখুনি দৌড়ে পালিয়ে যায় এখান থেকে? কেন একটুও ক্লাসে যেতে ইচ্ছে করছিলো না? কিন্তু যেতে হলো। মনোরমার মুখের কোমল কথা আর চোখের কড়া দৃষ্টি তার মনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলো।

বেয়ারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে সারা ইস্কুলটাই দেখালো। মন্দ লাগলো না। ইস্কুলটা সুন্দর ছিলো। লোকেরা বলতো লালকুঠি। কবে কোন নীলকর সাহেবের বাড়ি ছিলো, সেটাই স্কুল। লাল টালির ছাদ, প্রকাণ্ড একটা বাংলো। ভিতরে বাঁধানো উঠোনে শুকনো ফোয়ারা, ফোয়ারার মাথায় পরীমূর্তি। সামনের মাঠে বাগান। ঘরে ঘরে টানা পাখা, সাদা পাথরের মেঝে।

এ-গাছে ও-গাছে হাত দিয়ে সে একাত্মবোধ করেছিলো, বেয়ারাকে আপন মানুষ মনে

হচ্ছিলো, প্রথম দর্শনেই মনোরমার প্রতি অকারণ বিরাগ ভুলে গিয়েছিলো। কিন্তু ঘুরে এসেই মনে পড়ে গেলো। দেখলো, বাবা বেশ উৎফুল্ল মুখে তখনো গল্প করছেন মনোরমার সঙ্গে। তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তা হলে আসি?'

'খুব ভালো লাগলো দেখা হয়ে, কত দিনের কত কথা মনে পড়ে গেলো।' মনোরমাও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

'সেটা উভয়তই।'

'আসবেন মাঝে মাঝে।'

'নিশ্চয়ই।'

'কলকাতা থেকে এসে এই মফস্বলে শহরের একঘেয়ে জীবন—'

'ঠিক তাই। আপনি তো মাত্র কয়েক মাস, আমার তো কয়েক বছর। তবু মন টিকছে কই।'

'আমার কোয়ার্টার একটু দূরে, নদীর কাছাকাছি সন্ধ্যাবেলা সেখানেও আসতে পারেন। একেবারে একা থাকি একটি দাই নিয়ে, মা এলে বাঁচি।'

'আমি যাবো। নদীর ধারে তো আমি রোজই বেড়াতে যাই।'

মনোরমা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন তাদের। পথে আসতে আসতে বাবা খুশি গলায় বলেছিলেন, 'কেমন লাগলো ইস্কুল?'

অঞ্জলি বলেছিলো 'বিচ্ছিরি।'

'কেন? বিচ্ছিরি কেন? কী সুন্দর বাড়ি, বাগান, স্কুলের বড়দিদিমণি কেমন ভালো, আমার চেনা।'

অজ্ঞাতভাবেই যে মানুষটাকে সে পরম অপছন্দের ঘরে ঠেলে রেখেছে বাবার মুখে তার প্রশংসা শুনে মুখ ভারি হয়ে উঠলো।

সেদিনের সেই অনুভূতিটা আজকেও তিনি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছেন। আসলে তাঁর মাকে ছাড়া আর একজন মহিলার সঙ্গে বাবাকে সেই ধরনের হাসি হাসি মুখে কথা বলতে দেখাটাই বোধ হয় তার সবচেয়ে অসহ্য বোধ হচ্ছিল। মানুষের মনের অজ্ঞাত রহস্যের তল নেই। সেই অন্ধকারে সেই ছোট অঞ্জলির ভিতরে কী যেন ঘটে গেল। সে চুপ করে রইলো।

বাবা বললেন, 'কী গো অঞ্জুরানী, কথা নেই কেন? কী হলো?'

আদর করে 'কী গো অঞ্জুরানী,' ডাকটাও বাবার ফিরে পাওয়া ডাক। অর্থাৎ মা বেঁচে থাকতে ফুর্তির সুরে এই ডাকটা বাবার মুখে মুখে ছিলো। এই ডাক ডাকবার সময় বাবা হাসতেন, গাল টিপে দিতেন আর মেয়েকে আদর করতে করতে এদিক ওদিক তাকিয়ে মাকেও আদর করতেন।

মায়ের মৃত্যুর পরে শোকার্ত গম্ভীর বিষণ্ণ বাবার আদর অন্যরকম ছিলো। আবেগভরে নিঃশব্দে জড়িয়ে ধরেছেন, চোখে জল এসে গেছে। কাছে শুয়ে পাখার বাতাস করতে করতে 'সোনা আমার, মা আমার' বলে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন গায়ে, চোখে জল এসে গেছে। আপিসে যাবার সময়ে গাল টিপে আদর করে বলেছেন, 'লক্ষ্মী হয়ে থেকো, কেমন?' চোখে জল এসে গেছে।

এই মুহূর্তে তাঁর মুখে হাসির ঢেউ অঞ্জলির প্রাণে কান্নার ঢেউ হয়ে ধাক্কা দিলো। তার চোয়াল ব্যথা করছিলো, সে বাবার হাত ছেড়ে হনহন করে আগে চলে যাচ্ছিলো, বাবা তাকে ধরে ফেলে বললেন, 'ভারি দুষ্টু হয়েছ তো!'

বাড়ি ফিরে সমস্তটা সময় মন খারাপ করে ছিলো অঞ্জলি। রাত্তিরে ঠাকুমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে তাকে ফেলে স্বর্গে চলে যাওয়া নিষ্ঠুর মায়ের জন্য ভীষণভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো।

পরের দিন নটা বাজতেই তাড়া দিলেন বাবা, 'শিগগির চান করে নাও, ইস্কুল যেতে হবে।'

অঞ্জলি আব্দার করলো, 'আমি যাবে না।'

'যাবে না মানে?'

ঠাকুমা এসে আগলালেন, বললেন, 'না হয় নাই গেল। কী জানি কেন কাল আবার বড্ড কান্নাকাটি করেছে।'

'না, না, বাজে আদর দিয়ো না। এমনিতেই ভর্তি করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে, ক্লাসের পড়া অনেক এগিয়ে গেছে, এখন এ সব আদরে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না কিছু।'

এর পরে আর ঠাকুমা কিছু বললেন না। তৈরি করে দিলেন তাকে, খাইয়ে দাইয়ে আদর করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বাবার সঙ্গে। যদিও বেশ ঘুর হয় তবুও আপিসের পথে বাবাই নিয়ে এলেন স্কুলে, গেট পর্যন্ত এনেই ছেড়ে দিলেন না, প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গেও একবার দেখা কবে গেলেন। সহাস্যে বললেন, 'দিয়ে গেলাম মেয়েকে, দায়-দায়িত্ব সব এবার আপনার।'

'আমার?' ইঙ্গিতপূর্ণভাবে হাসলেন মনোরমা 'একেবারে সব দায়দায়িত্ব?'

বাবাও তাকিয়ে থেকে হাসলেন, ঠাট্টার সুরে বললেন, 'মন্দ কী।'

আর সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলির মন যে কোথায় বিগড়ে গেলো কে জানে, স্কুল তার কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য মনে হলো। অথচ, ঐসব নির্দোষ ঠাট্টাতামাশা তো সব সময়ে সব বন্ধুবান্ধবরাই করে থাকে।

মাসখানেক বাদে দেখা গেলো অঞ্জলির অবচেতন উপলব্ধিকে সত্য করে বাবার সঙ্গে মনোরমার বেশ ভাব হয়েছে। কবেকার কোন বন্ধু তাপস খাস্তগীরের বোনকে তিনি রীতিমতো প্রীতির চোখে দেখতে শুরু করেছেন। দু-একদিন বান্ধবী হিসেবে বাড়িতেও নিয়ে এলেন, নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন, রাত্রিবেলা পৌঁছে দিয়ে আসতে গিয়ে অনেক দেরি করে ফিরলেন।

মনোরমার প্রতি অঞ্জলির মনও যেমন বিমুখ ছিলো, বোধ হয় ঠাকুমাও তেমনি সুখী ছিলেন না। একদিন বললেন, 'দ্বিজু, তুই কি রোজ সন্ধ্যাবেলাই মনোরমার ওখানে যাস?'

বাবা তৎক্ষণাৎ উদ্ধত হয়ে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, দোষ আছে কিছু?'

'আমি তো দোষের কিছু বলিনি।'

'নিশ্চয়ই বলেছ, তোমার কথায় অভিযোগ ছিলো।'

এবার ঠাকুমাও রাগ করে বললেন, 'যদি থাকেই সেটাও অস্বাভাবিক নয়।'

'কেন নয়?'

'লোকেরা নিন্দে করছে।'

'আমি লোকেদের গ্রাহ্য করি না।'

'তা না করতে পারিস, কিন্তু স্কুলের কর্তৃপক্ষও এটাকে সুনজরে দেখছে না। এতে মনোরমার চাকরি যেতে পারে।'

'তা যদি যায় তো যাবে।'

'তার পরের দায়িত্ব?'

'পরের কথা পরে। আপাতত যা দেখছি, তা পরের কথাও নয়, আসল গাত্রদাহটা তোমারই।'

'দ্বিজু—'

'রাগ করলে আমি নাচার, কিন্তু সেটাই সত্য।'

'না, সেটা সত্য নয়। যা সত্য তা হচ্ছে মাত্র এই পাঁচ-ছয় মাসের ব্যবধানেই আমি নিরুপমাকে তোর মতো মন থেকে বিসর্জন দিতে পারিনি।'

সহসা চুপ করে গেলেন বাবা। ঠাকুমা রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আমি জানি, কোনো শোকই চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু এও আমি দেখতে পাচ্ছি যে মনোরমার জন্য শেষে আমার ঘরের শান্তি নষ্ট হবে।'

বাবা আবার উত্তপ্ত হলেন, 'যাকে তুমি চেনো না জানো না তার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত তোমার অযৌক্তিক।'

'তোর মনে থাকতে পারে, আমাদের হ্যারিসন রোডের বাসায় তাপস কী অবস্থায় তার বৌকে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলো। এই মনোরমাই তার জীবন অসহ্য করে তুলেছিলো, সংসারটাকে ভেঙে দিয়েছিলো। তাপস তো তোর এমন কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো না, এসেছিলো নিতান্ত বিপন্ন হয়েই। বলেছিলো, "একটা রাত থাকতে দে, কালই আমি আমার স্ত্রীকে বাপের বাড়ি রেখে এসে এর বোঝাপড়া করবো।" মনের দুঃখে সে কী কী বলেছিলো তাও নিশ্চয়ই ভুলে যাসনি।'

'সবই শোনা কথা। আর এক পক্ষের কথাই আমরা শুনেছি শুধু। তা দিয়ে কিছু বিচার করা যায় না।'

'তাপসের বউকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিলে এরা মা মেয়ে, এর চেয়ে সাংঘাতিক—'

'বাজে কথা।' বাবা আলনা থেকে শার্ট টেনে নিয়ে দুমদাম পা পেলে বেরিয়ে গেলেন অসময়ে। ঠাকুমা পিছে পিছে উঠে এসেছিলেন, ডেকেছিলেন, বাবা ফিরলেন না।

অঞ্জলি বই মুখে নিয়ে অবুঝ হৃদয় দিয়ে ঘটনার পারম্পর্য তেমনভাবে উপলব্ধি না করতে পারলেও এটা বুঝেছিলো ব্যাপারটা তেমন সুখের দিকে গড়াচ্ছে না।

গড়ালোও না। দেখতে দেখতে বাবা কী রকম অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। কোথায় গেলো ঠাকুমার সঙ্গে একাত্মবোধ, অঞ্জলির সঙ্গে আদর-আব্দার, মৃত পত্নীর শোকে থান ধুতি— সব একেবারে ওলোটপালোট। ঐ কালো মোটা চেহারা নিয়ে বয়স্ক মনোরমা বাবাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেললেন।

তিনি যে বাড়িতে আছেন এটাই প্রায় টের পাওয়া যায় না। ঘুম থেকে উঠে মনোযোগ দিয়ে

কাগজ পড়েন, সময়মতো উঠে স্নান করে খেয়ে আপিসে যান, আপিস থেকে ফেরেন, চা খেয়েই আবার বেরোন, ফেরেন অধিক রাত্তিরে। এর মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারো সঙ্গেই একটা কথা বলেন না। না মায়ের সঙ্গে, না মেয়ের সঙ্গে।

আর ওদিকে স্কুলে আব সব শিক্ষয়িত্রী তাকে যথেষ্ট পছন্দ করলেও মনোরমা খাস্তগীর যে তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না সেটা অনুভব করে তার কান্না পায়। কী যে তাঁর আক্রোশ কে জানে, ডেকে পাঠিয়ে কেবল অকারণে ধমকান। সেই সময়ে অঞ্জলির ভীষণভাবে মাকে মনে পড়ে ভয়ানকভাবে দেখতে ইচ্ছে করে, নিজেকে সে সামলাতে পারে না।

সত্যি এখনো অঞ্জলি দেবী ভেবে পান না, বাবা কী দেখে ঐ মহিলার প্রতি ওরকম উন্মাদের মতো আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। প্রথম যৌবনে হলেও বা তার একটা ব্যাখ্যা ছিলো, কিন্তু চল্লিশ বছব বয়সের পরিণত মন নিয়ে, পত্নীবিয়োগের সদ্য শোক নিয়ে, চোদ্দ বছর নিরুপমার মতো একজন নিরুপমা স্ত্রী নিয়ে ঘব করেও এই রুচিবিকৃতি তাঁর কী করে ঘটলো। তা হলে শেষ পর্যন্ত এ কথাই কি ধরে নিতে হবে যে মনের চেয়ে শরীরের ক্ষুধাই তাঁর তখন অনেক বেশি প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিলো? আর ক্ষুধার মুহূর্তে তিনি যে কোনো খাদ্যকেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন বলে আর কোনো দিকে দৃকপাত করলেন না।

আসলে সবই বিধাতাব কারসাজি। যা হবার ঠিক তাই হয়। সব থরে থরে সাজানো থাকে, জীবনে আস্তে আস্তে ঘটতে থাকে। নিজের জীবন দিয়েই কি তিনি টের পাচ্ছেন না সেই অলঙ্ঘ্য নিয়তিকে? পাচ্ছেন। খুব ভালো করেই পাচ্ছেন। আর সেই অলঙ্ঘ্য নিয়তির তাড়নাতেই বাবা মায়ের মৃত্যুর ঠিক আট মাস বাদে কোনো এক রাত্রে ঠাকুমার ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

তখনো ঠাকুমা শোননি, বসে বসে সুপুরি কাটছিলেন, কোনো ভূমিকা না করে বাবা বললেন, 'মা, আমি মনোরমাকে বিয়ে করবো স্থিব করেছি।'

চমকে উঠে ঠাকুমা বললেন, 'স্থির করেছিস?'

'হ্যাঁ।'

ঠাকুমা আবার কটরকটর সুপুরি কাটতে লাগলেন। বাবা বললেন, 'আমি জানি তুমি দ্বিধান্বিত ওর বিষয়ে তোমাব কতগুলো ভুল ধারণা আছে।'

'ভুল ধারণা?'

'নিশ্চয়ই। স্ত্রীব পরামর্শে বিধবা মাকে, অবিবাহিত বোনকে একলা ফেলে ভিন্ন হয়ে গিয়ে তাপস বোনের দোষ দিয়ে নিজের বিবেক শান্ত করতে চাইছিলো।'

'জানি না।'

'কেন জানো না? একজনের কথায় বিশ্বাস করতে তুমি খুব বাজি, আরেকজনের কথা মনঃপূত নয় বলেই সেটা অসত্য?'

ঠাকুমা বললেন, 'বাবার মৃত্যুর পরে সেই এম-এ পড়ুয়া ছাত্র তাপস যখন মাকে বোনকে নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলো, সে অবস্থা আমবা দেখেছি। পাঁচটা টিউশনি করে. প্রেসে নাইট ডিউটি করে কী ভাবে সংসাব চালাতো তাও অজানা নয়। সেই অবস্থায় সে নিজে না পড়ে বোনকে পড়িয়েছে একটা ভালো বিয়ে দেবাব জন্য আপ্রাণ করেছে, অপরাধের মধ্যে হঠাৎ নিজে পছন্দ করে একটা

বিয়ে করে ফেলেছিলো, আর সেই হিংসায় এরা মা মেয়ে—'

'ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না,' বাবা চোখ কুঁচকোলেন, 'আমার যা জানাবার তাই জানালাম। আমি ভেবে দেখেছি এভাবে চলতে পারে না। অঞ্জুকে দেখার লোক দবকার, পড়াশুনোয় একেবারেই মনোযোগী নয় সে, আর তোমারও যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, তোমারও এখন সংসার নিয়ে এতো খাটাখাটনি চলে না।' একটু থেমে, একটু নরম গলায়, 'আর তুমিই তো বলেছিলে, বিয়ে না করলে ভাঙা ঘর আর জোড়া লাগবে না।'

ঠাকুমা হাতের সুপুরি কাটা থামিয়ে চুপ করে থাকলেন। মশারির ভিতর থেকে অঞ্জলির মনে হলো ঠাকুমা কাঁদছেন। সেও বালিশে মুখ গুঁজলো।

।। ৩ ।।

বিয়ে করলেন বাবা। খুব নিঃশব্দেই হলো। আর কী জানি কী কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষ মনোরমাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করলেন।

অবশ্য মনোরমার তাতে কিছু এসে গেলো না, তিনি জাঁকিয়ে সংসারের কর্ত্রী হয়ে বসলেন।

বিয়ের দিন সকালে বাবা ঠাকুমাকে বলেছিলেন, 'ওর গয়নাগুলো কোথায়?'

হঠাৎ বুঝতে না পেরে ঠাকুমা বললেন, 'কার?'

নামটা উচ্চারণ করতে হয়তো সংকোচ হচ্ছিল বাবার, তিনি ইতস্তত করে বললেন, 'জানোই তো মনোরমাদের অবস্থা ভালো নয়, ওর মা এসেছেন, কোনোরকমে কাজ সারছেন, কিন্তু আমাদের দিক থেকে তো কিছু করা দরকার। একেবারে শুধু গায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালে তোমারই অপমান।'

'ও।' এবার বুঝতে পারলেন ঠাকুমা। নিশ্বাস চেপে বললেন, 'অঞ্জু আছে, তার মায়ের গয়না তারই প্রাপ্য।'

বাবা অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বললেন, 'ঐটুকু একটা অঞ্জুর কথা তোমার এখনি ভাববার দরকার কী? যে আসছে সেও তো ওর মা হয়েই আসছে, চাবিটা আমাকে দাও।'

ঠাকুমা দিলেন। বাবা আলমারি থেকে বার করে নিলেন সব, বেরিয়ে গেলেন।

অনেক গয়না ছিলো মার। মায়ের বাপের বাড়ি থেকে যা পেয়েছিলেন, তার দেড়া দিয়েছিলেন ঠাকুমা নিজে। সে সব ঠাকুমার নিজস্ব গয়না, তাঁর বাপের বাড়ির পাওয়া। বাবা নির্লজ্জের মতো সেই সবও নিয়ে গেলেন।

ঠাকুমা চুপ করে তাকিয়ে রইলেন, বোধ হয় বাধা দিতে তাঁর ঘৃণা বোধ হচ্ছিলো।

মনোরমা এবং মনোরমার মা অবিশ্রান্ত বাবাকে এই ধরনের পরামর্শ দিচ্ছিলেন, আব বাবা নির্বিচারে তা পালন করছিলেন।

বলাই বাহুল্য, বিবাহিত হয়ে এসে মনোরমা, তাকে এবং তার ঠাকুমা — কাউকেই সুনজরে

দেখলেন না। অঞ্জলিকে তো কোনো দিনই সহ্য করতে পারতেন না, তখন ঠাকুরমার প্রতিও নির্দয় হলেন। মনোরমা জানতেন ছেলের এই বিয়েতে তার মার সম্মতি ছিল না, প্রাক্তন পুত্রবধূই তখনও তাঁর হৃদয় জোড়া। এবং মনোরমার দৈনন্দিন প্ররোচনায় টিকতে না পেরে বাবা যখন ঠাকুমার কাছে গয়নাগুলো চেয়েছিলেন ঠাকুমা দিতে চাননি। এই অপরাধের প্রতিশোধ নিতে মনোরমা তাই বোধ হয় বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।'

অল্পদিনের মধ্যে বাবার সঙ্গেও তাঁর খিটিমিটি বাধতে লাগলো। আর সেই বচসা থেকেই এই সব তথ্য আস্তে আস্তে উদ্ঘাটিত হলো। বিয়ের জন্য বাবা সব কিছু পণ করেছিলেন, বিয়ের পর বাবা সত্যিই দেউলিয়া হলেন। নিজের মা এবং মেয়ে — তারাও পর হয়ে গেল, দূর হয়ে গেল, স্ত্রীও কাছের হলো না। তাই সব সময়েই তিনি তিক্ত বিরক্ত আর হতাশ্বাস। কিন্তু হাজার হা-হুতাশ করেও সেই স্বখাত সলিল থেকে আর তাঁর মুক্তি পাবার কোনো রাস্তা ছিলো না। মনোরমা তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিলেন।

ঠাকুমা দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকতেন নিজের ঘরে, নিজের নাতনিটিকে নিয়ে অর্ধাশনে অনশনে ক্লিষ্ট হয়ে। হয়তো সেই জন্য সহসা বুকের শিরা ছিঁড়ে মারা. গেলেন তিনি। ডাক্তার বললেন সন্ন্যাস।

তাঁর শূন্য ঘরে পড়ে পড়ে বাবা শিশুর মতো কেঁদেছিলেন, অনেক দিন বাদে আবার বোধ হয় তাঁর মৃত স্ত্রীর শোক ফিরে এসেছিলো, তিনি অঞ্জলিকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। রাত্রিবেলা মনোরমা গরম চোখে তাকিয়ে নিঃশব্দে তাঁকে হাত ধরে তুলে নিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। যেতে যেতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি শুয়ে পড়ো।'

কোথায় শোবে? ঠাকুমার ঘরে? একা? ভয়ে তার বুক হিম হয়ে গেলো। মনে হলো তার বুকের শিরাও এক্ষুনি ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু তার মতো দুঃখী মেয়ের কাছে মৃত্যু কি অত সহজে আসে? মন্দ ভাগ্য থাকলে সব সময়েই মানুষ নিরুপায়। তাই প্রতি রাত্রির ভয় প্রতি রাত্রিতেই তাকে মৃত্যুর শীতলতায় নিয়ে যেত, আবার প্রতিদিনের দুঃখ প্রতিদিন সকালেই ফিরিয়ে আনত মনোরমার সংসারে।

ঠাকুমা যে ক'মাস বেঁচেছিলেন, (ক'মাস ছিলেন? হ্যাঁ, ভাদ্র মাসেই তো মারা গেলেন তিনি, মনে আছে, পুজোর ঠিক পঁচিশ দিন আগে) মনোরমা তখনও তার প্রতি ততটা উদ্দাম হয়ে উঠতে পারেননি। ঠাকুমার মতো ঐরকম একজন নিশ্চুপ জেদি মানুষ তাঁর বুকে সম্ভবত একটা বোঝা হয়ে চেপে ছিল, এবং সেই বোঝা ঝেড়ে ফেলার মতো শক্তি তাঁর ছিল না। আর সেই জন্যই ঠাকুমা অঞ্জলিকে অনেক দুঃখ থেকে আগলে রাখতে পারছিলেন। বেড়াটা ভেঙে গেল। আট বছরের মেয়ে ততদিনে প্রায় দশে উত্তীর্ণ হয়ে একটা দুঃসহ দিশাহারা জীবন নিয়ে যে কী করবে, কোথায় যাবে, কোনখানে পালিয়ে গিয়ে মুক্তি পাবে ভেবে পেত না।

একটা মামাবাড়ি ছিল বটে কিন্তু দিদিমা দাদামশায় মারা গিয়ে সে বাড়ির আর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। দুই মামার এক মামা বহুকাল যাবৎ কীভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে বিদেশে গিয়ে আর ফিরতে পারেননি। আর এক মামা বম্বে প্রবাসী। খোঁজখবর প্রায় ছিল না বলতে গেলে।

মনোরমার সেই সব দিনের হৃদয়হীন ব্যবহারের কথা ভাবলে, সেই নিষ্কম্প্র কঠিন দৃষ্টির ছবি

মনে পড়লে এখনও হৃৎকম্প হয় অঞ্জলি দেবীর। অথচ মনোরমা কোনোদিনই প্রকাশ্যে তাকে বেশি গালমন্দ করেননি, লোকেরা বুঝতেও পারেনি তার পক্ষে তার বিমাতা কী ভয়ানক বিভীষিকা। হয়তো বা তার বাবাও বোঝেননি।

রাত্তিরে ঠাকুমার পরিত্যক্ত ঘরের ভীষণ একাকিত্বের মধ্যে ভয়ের সমুদ্রে ডুবে যেতে যেতে সে ভগবানের মতো করে মাকে ডাকতো। মায়ের চেহারা মনে করার চেষ্টায় হিমশিম খেতো। তারপর হয়তো তাঁর অবয়বহীন অস্তিত্বই সকল দুঃখের সব সান্ত্বনা হয়ে তার চোখের পাতায় ঘুমের শান্তি বুলিয়ে দিত। কিন্তু সে আর কতোটুকু ? আবার তো সকাল আছে, সারাদিনের পর রাত্রির অন্ধকারও আছে।

এরই মধ্যে এক ফোঁটা আলো এসে উছলে পড়লো জীবনে। তাকে মামাবাড়ি পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করতে বললেন মনোরমা। যদিও মামা-মামীকে সে কবে দেখেছে তাও মনে পড়ছিলো না, তবু সে আশায় উন্মুখ হলো। আসলে মনোরমা সে সময়ে সন্তানসম্ভবা হয়েছিলেন, আরো অনেক কিছু গোলমাল ধরা পড়েছিলো দেহের অভ্যন্তরে, মায়ের সেবাযত্নে এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকার জন্য তিনি কলকাতা যাওয়া স্থির করছিলেন। বয়েস বেশি, প্রথম সন্তান, ভয়ও পেয়েছিলেন খুব।

সমস্যা হলো অঞ্জলিকে নিয়ে। তিনি গেলে বাবাকেও ঘন ঘন যেতে হবে কলকাতা, হয়তো শেষের দিকে ছুটি নিতে হবে কিছুদিনের জন্য, তখন অঞ্জলি থাকবে কোথায়? তাছাড়া অনভিপ্রেত সতীনকন্যাটিকে বিতাড়িত করাব এমন সুযোগই বা মিলবে কবে? অতএব বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চিঠি লেখানো হলো বম্বেতে।

নিজেদের সমস্যার কথা লিখলেন না, লিখলেন, 'মা মরা মেয়ে, মামাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছে, আর দেখা না হলে সম্পর্কও থাকে না, তাই কিছুদিনের জন্য অঞ্জলিকে তিনি তাঁদের কাছে পাঠাতে চান। কিন্তু বম্বে কাছের পথ নয়, তাঁর নিজের অবস্থাও এমন নয় যে চট করে এতো টাকা টিকিট কেটে পাঠাতে পারেন, নিয়ে যাবার লোকও দরকার। তবে চেনাজানা লোক অনেক সময়েই যায়, খোঁজ করে সেটার একটা ব্যবস্থা করা অসম্ভব নয়, টাকাটা সংগ্রহ হলেই পাঠিয়ে দেবেন। এবং তাতে আশা করছেন, মামা বা মামীর কোনো অমত হবে না।'

বাবা জানতেন মামার আপত্তির কোনো প্রশ্নই উঠবে না এবং এভাবে লিখলে টাকাও পাঠাবেন যাবার জন্য। সুতরাং তাঁর অনুমান সত্য করে কয়েকদিন বাদেই জবাব এসে গেল, মামা লিখলেন, 'সঙ্গী যোগাড় হলেই অঞ্জুকে পাঠিয়ে দেবেন, আমরা ওর জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করবো। সঙ্গে টাকা পাঠালাম।'

এই ব্যবস্থায় অঞ্জলির মনে হলো, তার মৃত মায়ের কাছে প্রতি রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে যে প্রার্থনা করেছে এ তারই ফল। খবব জেনে আনন্দে-উত্তেজনায় সে প্রায় কেঁদেছিলো। তার ইচ্ছে করছিলো মার ছবিটা একবার দেখে। মায়ের মুখখানা সে কিছুতেই মনে করতে পারছিলো না বলেই ছবি দেখতে সাধ হয়েছিলো। কিন্তু কোনো ছবি আব তখন ছিলো না।

একজন মেয়ে, একজন ভাবী মা, একজন স্ত্রী কী করে যে অমন হিংস্র হতে পারে আজও

ভেবে পান না অঞ্জলি। তার মাকে তো মনোরমা কখনোই দেখেননি. আর যে মানুষটা মৃত, তাঁর সম্পর্কে কী করে এতো বিষ বহন করতেন? একদিন বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ভয়ংকর আক্রোশে পাগলের মতো ছিঁড়ে ফেললেন ছবি দু'খানা। একখানা ছিলো বাবার সঙ্গে, আর একখানা তাকে কোলে নিয়ে। ছবি দু'খানা বাবার ঘরে টাঙানো ছিলো, বিয়ের আগে বাবা ঢেকে দিয়েছিলেন, তাতে কুললো না, কাচ ভেঙে, ছবি ছিঁড়ে, থুতু ছিটিয়ে পায়ে থেঁৎলে থেঁৎলে সেটা নষ্ট করলেন। কুয়োতলায় বসে চায়ের বাসন ধুতে ধুতে ফুলে উঠছিলো অঞ্জলি, জোরে-জোরে হেঁচকি উঠছিলো বুক থেকে। মনে হচ্ছিলো এক্ষুনি সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে, দৌড়ে সে বাথরুমে চলে গেল।

দরমা-ঘেরা ঝাঁপ দেওয়া বাথরুমে ঢুকে তারপর সে মেঝেতে গড়িয়ে মা মা বলে কেঁদেছিলো।

জীবিত মায়ের সংসারটা মনে পড়ছিলো তার। মা আর ঠাকুরমার মধ্যমণি বাবা, আর সকলের মধ্যমণি ছিলো সে নিজে। চারজন মানুষ, সবাই সকলকে ভালোবেসে পূর্ণ ছিলো। কতো ভালো লাগতো বেঁচে থাকতে, জগৎটাকে কতো মধুময় মনে হতো। কী হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

বাবার দোষেই হলো। কেন বাবা জেনেশুনে এরকম একটি মানুষকে নিয়ে এলেন বিয়ে করে? কেন তিনি বছর না ঘুরতেই আর একজন মেয়ের সাহচর্যের জন্য পাগল হয়ে গেলেন। মানুষের কি মন নেই? সেই মনে কি দুঃখ নেই মৃত্যুর জন্য? দুঃখ না থাকুক, একটা সম্মানও তো আছে। মাকে তো এর চেয়ে বেশি সম্মান করা উচিত ছিলো বাবার। অবশ্য সেই অবমাননার ফল হাতে হাতেই পেলেন। কষ্ট তো শুধু অঞ্জলিরই ছিলো না, তার বাবারও ছিলো। মনোরমা চিরতরে তাঁর জীবনের সব সুখ-শান্তি নিঃশেষে মুছে দিয়েছিলেন। তবু তো একটা ভবিষ্যতের আশা ছিলো অঞ্জলির, কোনো একদিন এ সংসার ছেড়ে অন্য সংসারে যাবার সম্ভাবনা ছিলো, কিন্তু বাবার যন্ত্রণা আমৃত্যু। সে কথা তিনিও অহরহই বলতেন। তবু কী আশ্চর্য, বছরের এ-মাথা ও মাথা বাচ্চার জন্ম দিতেন মনোরমা। পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত, এই ন' বছরে বাবা চারবার গর্ভবতী করলেন স্ত্রীকে। তারপরে বন্ধ হলো। বোধহয় বাধ্য হয়েই বন্ধ হলো। প্রকৃতির নিয়মেই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের পরে আর হতে পারলো না।

কিন্তু প্রথমবারের সময় কিছুদিনের জন্য তাকে মামাবাড়ি পাঠিয়ে আবার একটুখানি সুখের স্বাদে ডুবিয়ে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে ফিরিয়ে আনলেন কেন?

॥ ৪ ॥

মামা বড়োলোক ছিলেন না, কিন্তু সজ্জন ছিলেন। মামীমা সহৃদয় ছিলেন। দূর প্রবাসী বলে দেখাশুনো না হলেও তাঁরা তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। মামার এক ছেলে এক মেয়ের মধ্যে মেয়েই বড়ো, সুন্দরী বলে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো তাড়াতাড়ি। মামাতো দিদিকে সে দেখতে

পোলো না বটে, কিন্তু মামাতো ভাই সীতেশদার সঙ্গে অল্প সময়েব মধ্যেই ভাব জমে গেল। পনেরো বছরের সীতেশদা যে শুধু লেখাপড়াতেই টেক্কা দিয়েছিলো তাই নয়, খেলাধুলো, আমোদ-আহ্লাদ কর্তব্যবুদ্ধি সব বিষয়েই একজন তুখোড় ছেলে। সেই বছরেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল সে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আই-এ পড়তে এলো। আর তারই মধ্যে বোনের সঙ্গে বন্ধুতা পাতিয়ে ভালোবেসে আদর করে প্রায় সব দুঃখ মুছিয়ে দিল এক মাসের মধ্যে।

মামা-মামী বললেন, 'তোমার আর ফিরে গিয়ে দরকার নেই, এখানেই স্কুলে ভর্তি করে দেব। আট দশ মাসের মধ্যে বাবার দিক থেকেও কোনো সাড়াশব্দ ছিলো না। তার হারিয়ে যাওয়া সুখের দিনগুলো আবার যেন ফিরে এসেছিলো জীবনে। মামাবাড়িতে বসেই একদিন তার দশ বছর পূর্ণ হলো, মামী-মামা নতুন ফ্রক কিনে দিলেন, জুতো কিনে দিলেন, আব সীতেশ সমুদ্রের ধারে পিকনিকের আয়োজন করলো।

আর এই সুখস্বপ্ন ভাঙতে না ভাঙতেই হঠাৎ বাবার চিঠি এসে হাজির, 'অঞ্জলিকে পাঠিয়ে দিন।'

সীতেশ তৎক্ষণাৎ মাথা ঝাঁকিয়েছিলো, 'না, না, আর তুমি যাবে না! কিছুতেই না। মা, তুমি লিখে দাও সে-কথা।'

মামী বললেন, 'লিখবোই তো, আমি আগাগোড়াই ভেবে রেখেছি সে কথা। তবে দ্বিজেনবাবু যদি জোর করেন তা হলে তো আমাদের কথা আর খাটবে না?'

ভুরু কুঁচকে মামা বললেন, 'খাটবে না মানে? আলবৎ খাটবে। আমি ওর মামা না? আমার জোর নেই? বলেই তিনি কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন, 'দ্বিজেনবাবু, আপনার পত্র পাইয়া সবিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনি আর একটি কন্যার পিতা হইয়াছেন জানিয়া আরও বেশী সুখী হইয়াছি। নবজাত কন্যা এবং কন্যার মাতাকে আমাব আশীর্বাদ জানাইবেন। তারপরে এই যে শ্রীমতী অঞ্জলিকে তার মামী এখন ছাড়িতে চাহিতেছেন না। আমিও মনে কবিতেছি যে আমার একমাত্র ভগ্নির একমাত্র চিহ্ন একমাত্র সন্তানটিব ভার আমারই গ্রহণ করা উচিত। অতএব জানাইতেছি উহাব জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না। সে এখানে ভালোই আছে, শীঘ্রই ইস্কুলে ভর্তি কবিযা দিব।'

যথাসম্ভব শিগগির বাবার প্রত্যুত্তরও এসে গেল, 'আপনারা যদি পাঠাইতে না পারেন, আমি নিজে গিয়াই লইয়া আসিব।'

ঠিক মনে নেই, সম্ভবত এর পরেও দু'চারখানা চিঠি আসা-যাওযা করেছিলো, দু'চাব মাস টালবাহানা চলেছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামার দাবিটা টিকলো না।

অঞ্জলি প্রায় নিশ্চিন্তই ছিলো যে তাব বিমাতা আব কোনোদিন তাকে ফিরিয়ে নেবেন না এবং বাবারও এমন সাধ্য হবে না যে তার বিরুদ্ধে কিছু করেন। সীতেশদার কাছে সে নিযমিত পড়াশুনো করে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলো, অনেক জল্পনাকল্পনা করেছিলো দু'জনে বসে, সব শেষ হয়ে গেল। আবার সেই নরকের প্রেত হয়ে জীবনযাপনেব কথা ভেবে তাব চোখ থেকে ঘুম চলে গেল, আহারে রুচি রইলো না, মুখের হাসি শুকিয়ে গিয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকলো।

সীতেশের ম্যাট্রিক পরীক্ষাব ফল খুব ভালো হয়েছিলো, বাড়িতে খুব হই-হুল্লোড় চললো কয়েকদিন, তারপর পরিচিত এক ভদ্রলোকেব সঙ্গে কলকাতা রওনা হলো কলেজে ভর্তি হবার জন্য। সঙ্গে অঞ্জলি। মামা-মামীব বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে তাকেও ট্রেনে উঠতে হলো।

বাবা নির্দেশমতো হাওড়া স্টেশনে এসে অপেক্ষা করছিলেন। বম্বে মেল পৌঁছনোর চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই সুধাগঞ্জের লোকাল ট্রেন এসে গেল, তাকে নিয়ে সেই ট্রেনে উঠে গেলেন তিনি। সীতেশ দাঁড়িয়ে রইলো প্ল্যাটফর্মে, যতোক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে থাকলো, দৌড়ে দৌড়ে এলো খানিকটা, তারপর সব ঝাপসা।

বাবা মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'কাঁদছিস কেন? আমি তো আছি।' এ কথায় অঞ্জলির বুক আরও ভারি হয়ে উঠলো।

বাবা সেই মুহূর্তে সত্যিই ছিলেন। ট্রেন যখন দু'ঘণ্টার মধ্যেই সুধাগঞ্জে পৌঁছে দিল, তখনো ছিলেন, সাইকেল রিকশা করে বাড়ি আসতে আসতেও তাঁর স্পর্শে এবং চোখের দৃষ্টিতে সন্তানস্নেহ ঝরে পড়ছিলো, কিন্তু বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বদলে গেল সব। আর বাড়ির চেহারা দেখে এক নজরেই অঞ্জলি বুঝতে পারলো তার জন্য জোর তলবের আসল কারণটা কী।

পঁয়ত্রিশ বছরের অবিবাহিত জীবনে অভ্যস্ত মনোরমা এমনিতেই সংসার করতে বিরক্ত বোধ করছিলেন, তার উপরে একটি পাঁচ মাসের কাঁদুনে বাচ্চা তাঁকে প্রায় পাগল করে তুলেছিলো। বাচ্চা রাখার জন্য আপ্রাণ খুঁজে খুঁজে যতো লোক বাবা সংগ্রহ করে আনছিলেন, সব তাঁর অপছন্দ হচ্ছিলো। বাচ্চা নিয়ে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন, একটা পরিষ্কার-পরিষ্কার বাতিক হয়েছিলো। যদিও তিনি নিজে খুব পরিষ্কার ছিলেন না, তাঁর বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় কোনোদিন অঞ্জলি তার মার আমলের মতো ধবধবে দেখেনি এবং ওপর ওপর সাজসজ্জায় চটক থাকলেও নিচেকার জামা-কাপড়, যেমন সেমিজ পেটিকোট বা বডিস সব সময়েই ময়লা। এবং এটা যে অপরিচ্ছন্নতার চরম সেটাও তিনি বুঝতেন না।

বাচ্চা নিয়ে পরিষ্কার বাতিকের মধ্যে যেটা তাঁর প্রবল হলো, সেটা কেবল হাত ধোওয়া পা ধোওয়া আর পঞ্চাশ বার কাপড় ছাড়া। যারা কাজ করতে আসতো, এই ধোওয়া ধোওয়া বাতিকের যন্ত্রণায় তাদের অস্থির করে দিচ্ছিলেন। তাছাড়া অত্যন্ত মেজাজ, বকাবকিও তাদের কম করতেন না, ফলত যদি বা কাউকে পছন্দ হলো সেও আব টিকতো না।

এর পরেই মনোরমার সতীন-কন্যার প্রতি দরদ উথলে উঠলো। তিনি ভেবেচিন্তে দেখেছিলেন, দশ এগারো বছরের একটা সুস্থ-সবল বাড়ন্ত গড়নের ঘরের মেয়ে থাকতে, যার রোগ নেই, রাগ নেই, তাড়ালেও যাবার জায়গা নেই, মারলেও কাজ ছাড়ার ভয় নেই তাকে ফেলে কোথাকার কোন সব নোংরা ভূত ছোটোলোকের বাচ্চা ধরে আনার দরকার কী?

অবশ্য বাবাকে তিনি এসব বলেননি, বলেছিলেন, 'এবার তোমার মেয়েকে আনিয়ে নাও।'

বাবা বলেছিলেন, 'কেন, মামাবড়িতে বেশ তো আছে, থাক না।' মনোরমা বললেন, 'তুমি তো বলেই খালাস, আর লোকেরা তো দুষবে আমাকেই।'

'কেন?'

'বলবে সৎমা তাড়িয়ে দিয়েছে। না, তুমি মেয়েকে ফিরিয়ে আনো!' বাবারও ইচ্ছে হলো। মেয়ের জন্য হয়তো তাঁর কষ্টই হচ্ছিলো, কে জানে। এবং সেই ইচ্ছেকেই তাগাদা দিয়ে দিয়ে মনোরমা তাতিয়ে তুলে আনিয়ে ছাড়লেন।

এসব কথা ঠাকুমার আমলের পুবোনো ঝি বামার মার কাছে শোনা। বাসন মাজতে মাজতে

সে হাতের সঙ্গে মুখ চালাতো, 'এবার আর কী, বিনি পয়সার দাসী তো এসেই গেছে।'

বাচ্চা রাখতে রাখতে শ্রান্ত-ক্লান্ত অঞ্জলি আশান্বিত চোখে তাকিয়ে বলতো, 'কে? কে এসেছে বামার মা?'

'কে আবার? তুমি!' ফেটে পড়তো সে, 'কেমন সব আলাঢোলা ভালো ভালো কথা বলে ভিজিয়ে দিল দাদাবাবুকে, বলে, না, এটা উচিত নয়, নিজের মেয়ে পরের কাছে রাখবো, আমার মন কেমন করছে। শোনো কথা, তার নাকি মন কেমন করছে। যাবো কোথায়! তাই ভাবি, কতো আদরেই না মা-ঠাকুমা মানুষ করেছে, আজ তার কী দশা।' মনোরমার কান বাঁচিয়ে সে যা তা বলতে থাকে, 'একে কি মানুষ বলে? এ হলো ডাইনি। ছিলে মামাবাড়ি শান্তিতে, তখন তাড়িয়ে দিয়ে ঠিক ডেকে নিয়ে এলো কাজের বেলায়। না ডাকলে চলবে কেন? এমন বাক্যিবাণ সহ্য করে কে থাকবে? কার দায় পড়েছে? তার উপরে বাচ্চাটা কী হাগাই না হাগতে পারে। হাগবে না? ঐটুকু একটা বাচ্চা কোলে তার মধ্যে মা আবার পোয়াতি? ছি ছি ছি। আজকাল ভদ্দরলোক ছেড়ে দাও, আমাদের ঘরেও তো ব্যাটাছেলেরা এর চেয়ে সবুর করে। তাই বলি, অমন বউ মরতে না মরতে কি আর সাধে বিয়ে করেছে? ঐ কারণেই করেছে। এক এক পুরুষ বাপু এ রকমই থাকে। যেন কুত্তা বিড়াল। এমনি তো রাতদিন মল্লযুদ্ধ, আর রাত্তির হলেই ঠাণ্ডা। ঘেন্না, ঘেন্না। আমিও থাকবো না। কেন থাকবো? ঐ খাণ্ডার মেয়েমানুষের পাঁচ কথা শোনার দরকার কী আমার? নেহাত এতোদিন ধরে কাজ করছি তাই। ছেড়ে দেবার কথা বললে দাদাবাবু অস্থির হয়ে যান তাই। এতোদিন ছিলো না, বেশ ছিলাম, বাচ্চা কোলে নিয়ে এসে যেন মহাকম্মো করেছে, যেন বড়ো তেল লবণ লেগেছে বাচ্চা বানাতে।'

রেলগাড়ির মতো মুখ ছুটোতে থাকে বামার মা। অঞ্জলি আদ্ধেক কথা শোনে আদ্ধেক কথা শোনে না। বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়লে, সন্তর্পণে তাকে শুইয়ে দিয়ে ছাদে চলে আসে শুকনো কাপড় তুলতে। বেলা চারটের রোদ তখন খরতাপে জ্বলে, সেই রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তার আগের জীবনটা ভাবে, মাঝখানে মামাবাড়ির জীবনটা ভাবে, সবচেয়ে বেশি ভাবে সীতেশদার কথা। ঐ ভাবনাটুকু দিয়েই সে তার কষ্ট লাঘব করতে চায়।

মনোরমার দুপুরের ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সাড়ে-চার আর ঘুম ভেঙেই তাঁর ফরমাস আর বাবার জন্য বিকেলের জলখাবার তৈরি করবার তাগিদ।

সে নেমে আসে তাড়াতাড়ি, আলনা গুছিয়ে অন্য কাজের জন্য প্রস্তুত হয়।

॥৫॥

মাঝখানে ভাঙা বছরে এসে সে বছর আর তার ইস্কুলে ভর্তি হওয়া হলো না। পরেব বছর এক ক্লাস নিচুতে ভর্তি হয়ে খুব মন খারাপ হয়ে গেল। পথে আসতে আসতে বাবা বললেন, 'তাতে কী হয়েছে, এবার খুব ভাল করে পড়বি, ফার্স্ট-সেকেন্ড হবি, তখন কতো ভাল লাগবে।'

আর বাড়ি আসতে মনোরমা বললেন, 'পড়ায় তো কতো মন, মিছিমিছি কতোগুলো টাকা খরচ করে ইস্কুলে ভর্তি করানো। এতো বড়ো মেয়ে এইটুকু ক্লাসে পড়াও তো লজ্জার।'

কথাটা বাবার পছন্দ হলো না, মিনমিন করে বললেন, 'বড়ো আবার কোথায়? ওর ক্লাসের মেয়েরা সবাই তো ওর সমান।'

মনোরমার মুখ প্রধানশিক্ষয়িত্রীসুলভ গাম্ভীর্যে ভরে গেল, তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, 'মেয়ে চরিয়ে খাওয়াই আমার পেশা, কোন ছাত্রী কী দরের, কোন ক্লাসে কী বয়সে পড়ে এ সব এখন আমায় তোমার কাছে শিখতে হবে না। মেয়ে তোমার, হয়তো রাগ করবে শুনে, লেখাপড়া এর হবে না। মাথা নেই। কী করে হবে? একটা কার্যকারণ থাকা তো চাই। তোমার আগের বউ তো একটা গণ্ডমূর্খ মেয়েমানুষ মাত্র ছিল। তারই তো মেয়ে? কতোদূর আর যাবে?

বাবাও গম্ভীব হলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। বিষয়টা বড়ো ব্যক্তিগত, বড়ো কোমল জায়গা, এ নিয়ে একটা ঝগড়া বাধুক, মনে হয়, এটা তিনি চাইতেন না।

তবু তারও পরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অস্থির করে তুলতেন মনোরমা।

তখন বাবাকে ঠিক বুঝতে পারতো না অঞ্জলি। মাঝে মাঝে তিনি তার প্রতি অদ্ভুতরকম সদয় হয়ে উঠতেন, আড়ালে-আব্ডালে মিষ্টি করে কথা বলতেন, ছোটখাটো উপহার এনে দিতেন, আবাব মাঝে মাঝে এমন খড়্গহস্ত হয়ে যেতেন যে মনে হতো মেরে খুন করে ফেলবেন।

আসলে মনোবমাব পরামর্শ আর মিথ্যাভাষণই বোধ হয় তাঁকে বিভ্রান্ত করে তুলতো। ছেলেরা স্বভাবতই কান-পাতলা, তার উপর বাবার স্বভাবে একটা ভীরুতা ছিল, তিনি যে স্ত্রৈণ ছিলেন তার মূল কারণও বোধহয সেটাই। হয়তো বা অতিবিক্ত কামুকতাও তাঁকে তাঁর স্ত্রীব প্রতি মনোরঞ্জনে প্রয়াসী করতো। সেই ছোট অঞ্জলি না বুঝুক, এখন এই অঞ্জলিব মনে হয মনোরমাকে অত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার প্রকৃত উদ্দেশ্যটাই তাই ছিল। হয়তো বাবা সেই মোহেই আচ্ছন্ন ছিলেন। তবু তারই মধ্যে যখনই সদয়ের সময় চলতো তখনই তিনি তার জন্য জেদ করেও মনোরমাব বিরুদ্ধে অনেক কিছু করে ফেলেছেন। স্কুলে ভর্তি হওয়াটাও সেই গণ্ডিতে পড়ে গিয়েছিল, নইলে ঐ শরীর খারাপ নিয়ে, বাচ্চা নিয়ে কখনোই মনোরমা অতক্ষণের জন্য স্কুল করতে তাকে ছেড়ে দিতেন না।

রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে সেদিন বাবার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করেছিল অঞ্জলি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করেছিল, যেকরে হোক আমি ফার্স্ট-সেকেন্ড হবোই, বাবার মান রাখবোই। তাবপব বিড়বিড় করে নিজের বয়সের হিসেব করেছিল। তার আট বছর পূর্ণ হবার তিন মাস বাদে মা মারা গিয়েছিলেন। কেননা তার জন্মদিন ছিলো বৈশাখ মাসে, আর মা মারা গেলেন শ্রাবণ মাসের পাঁচ তারিখে। জন্মদিনে মা অনেক রান্না করেছিলেন, চিংড়ি মাছ, মাংস, চাটনি, পায়েস। খুব খাওয়াদাওয়া হলো, রাত্রে হ্যাজাক জ্বালিয়ে গানবাজনা হলো, সে দামী কাপড়ের নতুন ফ্রক পরে ঘুরে বেড়ালো। সকলের মনেই সুখ, সুখ আর সুখ। মার মুখে সুখ, বাবার মুখে সুখ, ঠাকুমার মুখে সুখ, আরো সুখ তার মার পেটে তার ভাই আসছে। ঠাকুমা তাই বলতেন। বলতেন, 'ভগবান আবার দয়া করেছেন, এবার আমার ঘরে কিন্তু নারায়ণের আবির্ভাব হচ্ছে, আমি আর কিছু চাই না, শুধু চাই নিরু আমার ভালো থাক।'

সেই সুখ, তুমি কোথায়? বয়সের হিসেব কষতে গিয়ে সেই সব কথা মনে পড়ে যায়, একা ঘরের অন্ধকারে বালিশ ভিজে যায় চোখের জলে।

যদি তাই হয়, যদি মা মারা যাবার সময়ে তার বয়স আট বছর তিন মাস থাকে তা হলে বাবার বিয়ের সময়ে হবে আট বছর এগারো মাস, আর ঠাকুমা মারা গেলেন তার পাঁচ মাস বাদে, তখন বয়স হলো আট বছর ষোলো মাস। অর্থাৎ ন' বছর চাব মাস। আর মামাবাড়ি গিয়েছিলো তারও তিন মাস বাদে। সেখানে গিয়ে তার দশ বছর পূর্ণ হলো। আসবার আগে এগারো বছরের জন্মদিনও খুব কাছেই ছিলো, মামী বলেছিলেন, এবার শাড়ি কিনে দেবেন, সীতেশদা বলেছিলো ছবি তুলে দেবে, আর মামা বলেছিলেন এলিফ্যান্টা গুহা দেখাতে নিয়ে যাবেন।

তা হলে এখন? এখন তার বয়েস কতো যে মনোরমা বললেন, এই বয়সে এই ক্লাসে পড়া তার পক্ষে লজ্জার? এখন সে প্রায় বারো, ভর্তি হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণীতে, তার মানে ম্যাট্রিক পাস করতে করতে সে সতেরো বছরের মেয়ে হয়ে যাবে। সতেরো? তা হলে এমন কী বেশি। একটা বছব তো তিনি নিজেই নষ্ট করে দিলেন। তবে। এই ধিক্কার কিসের?

তাকে কষ্ট দেবার, অপমানিত করবার এই সবই মনোবমার উপায়। মা-ঠাকুমার মৃত্যুর পবে এই চার বছরের সুদীর্ঘ দুঃখ-বেদনার ইতিহাস আবাব নতুন করে তার বুকে শেল বিদ্ধ করতে থাকে। ঘুম আসে না সারারাত।

।।৬।।

এমনিতে মনোরমার আচার-আচরণ খুব অমার্জিত ছিল না। কিন্তু মানুষ তিনি সত্যিই ভালো ছিলেন না। তাঁর মনে যেমন হিংসাও প্রবল ছিল, মেয়েসুলভ স্বাভাবিক কোমলতাও খুব কম ছিল। মন সরল ছিল না বলে প্রত্যেককেই তিনি সন্দেহের চোখে দেখতেন, কিন্তু বাইরের লোককে মিষ্টি কথায় তুষ্ট করতে পটু ছিলেন। প্রতিবেশীরা কোনোদিনই বুঝতে পারেনি, অঞ্জলির প্রতি তাঁর স্নেহহীনতা তাঁকে কতদূর নিষ্ঠুর মানুষে পরিণত করে তুলেছিল। লোক এলে তিনি অকারণে ভালোবসা দেখাতেন, গলায় মধুর ঢেলে বলতেন, 'আসল মেয়ে তো আমার অঞ্জলিই, বিয়ে হয়ে তাকেই তো আমি প্রথম সন্তান হিসেবে পেয়েছি, আর এটা তো এই সেদিনের। এখনো মা বলে ডাকতে শেখেনি।' তারপর চোখ সজল করে মস্ত লম্বা নিশ্বাস নিতেন, 'হয়তো সত্য কথাই যে এক গাছের বাকল অন্য গাছে লাগে না, নইলে এত ভালোবেসেও মেয়ের মন পেলাম না কেন? তবে, সেই সঙ্গে এও বলি, আমার না হয় সন্তান ছিল না তাই সন্তান পেয়ে সব ভুলে বুকে তুলে নিয়েছিলাম, কিন্তু ওর তো আর একজন মা ছিল? আমার উপর এই আক্রোশ, অত্যাচার– এ তো স্বাভাবিক। কী বলেন? দেখুন না, সংসারের কাজ তো কম নয়, সাহায্যকারী বলতে ঐ তো এক বামার মা। রান্না করা, ঘর ধোয়ামোছা, বাচ্চার কাজ সব তো এক হাতে। তার মধ্যে সবচেয়ে আগে আমার বড় মেয়ের খাবার, তার জামাকাপড়, তাকে পড়ানো, স্কুলে পাঠানো–মেয়ের স্বাস্থ্য দেখেছেন তো? সে তো আর অমনি অমনি হয় না? বাড়বার সময়, দেখতেই হয়, করতেই হয়—'

মনোরমার কথা অঞ্জলি কান পেতে শোনে না, চলতে-ফিরতে কানে আসে, সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মনোরমা বলেন, 'অনেক সময় অবশ্য বাচ্চাটাকে ধরতে বলি, তা ছাড়া বড় হয়েছে, ঘর-সংসারের কাজও একটু-আধটু শেখাতে ইচ্ছে করে। গরিবের ঘরের মেয়েই তো? বিয়ে তো আর রাজার ঘরে হবে না যে বসে শুয়ে দাসদাসী দিয়ে করাতে পারবে সব? কিন্তু সে রাস্তায় আমি পা দিই না। কী দরকার, মেয়ে ভাববে সৎমা বলে খাটাচ্ছে, আর তার বাপও হয়তো মেয়ের কথাই বিশ্বাস করবে। তবে কী জানেন, সবচেয়ে কষ্ট হয় ঐটুকু বাচ্চাটাকে আমার যখন হিংসে করে, চড়চাপড় দেয়।'

'সে কী?' দরদী প্রতিবেশীরা আঁৎকে ওঠে।

'অবশ্য হিংসে হতেই পারে, ভাগিদার তো, তবু ভয করে, রেগেমেগে কোনদিন না ফেলে দেয় কোল থেকে। ঐ জন্য আজকাল সাবধানে থাকি। খেলাধুলো স্কুলে পড়া, এই নিয়েই আছে। থাক। কিন্তু স্কুলে যেতেও তো মন নেই, বই তো যম, বয়েস তো কম নয়? পড়েও নিচু ক্লাসে, আমি বলি, তুমি আর কিছু কর না কর, পড়াটা কর। দেখুন, পনেরো বছর মাস্টারি করেছি, পরের মেয়েদের কত গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানিয়েছি, শেষে কি ঘরের মেয়ে ফেল করতে করতে চুল

পাকাবে ?'

এত সব শুনে বেড়াতে আসা মহিলারা চোখ বড় করে মাথা নেড়ে বলে, 'তাই তো,তাই তো।'

সতীনের মেয়েকে ভালোবাসার কল্পনার সুতো তখন মনোরমা আরো উদারভাবে ছাড়েন, ঘুড়ি আকাশে আরো উঁচুতে উড্ডীন হতে থাকে।

'আমি টুকুকে হিংসে করি?' আর সব ভুলে গিয়ে অঞ্জলির সেই কথাটাই বুকে বাজে বেশি। বোনের নরম নরম গালে চুমু খেতে খেতে তার চোখে জল এসে যায়।

হয়তো বলতে বলতে মনোরমা নিজেই বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন যে তাঁর কোনো দোষ নেই, নিজের মাকে মনে আছে বলেই অঞ্জলি তাঁকে মান্য করছে না, ভালোবাসছে না, ভালো ব্যবহার করছে না এবং সত্যিই তাঁর মেয়েকে হিংসে করছে। এবং মনোরমার বিরক্তি তখনি চরমে উঠল যখন সংসারের সমস্ত কাজের চাকায় পিষ্ট করা সত্ত্বেও সে পরীক্ষায় তৃতীয় হল। তিনি ভেবে পেলেন না এটা কী করে সম্ভব।

বাবার খুশি মুখের দিকে একমুঠো আগুন ছিটিয়ে দিলেন তিনি, গর্জে উঠে বললেন, 'থামো, আর হাসতে হবে না এনিয়ে। এর মধ্যে তোমারও কারসাজি আছে।'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'আমার আবার কী কারসাজি?'

'তোমাকে আমি বেশ ভালোভাবেই চিনি। মেয়েকে স্ট্যান্ড করাবার জন্য তুমি যাওনি হেডমিস্ট্রেসের কাছে?'

'কী?'

'শাক দিয়ে মাছ লুকিয়ো না, কার এক ডিভোর্স করা বউ এসেছে চাকরি করতে, নিতান্ত অসভ্য একটা স্ত্রীলোক—'

'কী যা তা সব বলছ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, রস যে বেশ জমিয়ে এনেছ তাও আমি জানি। তোমার ভাব জমাবার কায়দাটা তো আমিও দেখেছি?'

'বাজে কথা বোলো না।'

'কাজের কথাটাই এবার আমি শোনাতে চাই।'

'কী কাজের কথা?'

'রমেনবাবুর স্ত্রী এসেছিলেন, তাঁর মেয়েই তোমাকে স্কুলে হেডমিস্ট্রেসের ঘরে ঘুরঘুর করতে দেখেছে।'

'ঘুরঘুর করতে দেখেছে?' চটে উঠলেন বাবা।

'হ্যাঁ দেখেছে।'

'ঘুরঘুর করতে দেখেছে?'

'তবে তুমি গিয়েছিলে কেন?'

'মাইনে দিতে গিয়েছিলাম।'

'মাইনে দিতে ? সে জন্য তোমাকে যেতে হল কেন?'

'ছ' মাসের মাইনে বাকি পড়েছিল, অত টাকা একসঙ্গে অতটুকু মেয়ের হাতে দেওয়া যায় না তাই।'

'সেই টাকা তুমি কোথায় পেলে?'

'ধার করেছি।'

'কেন?'

'তা নইলে পরীক্ষা দিতে দেবে না। তুমি জানো না যে মাইনে বাকি থাকলে পরীক্ষা দেওয়া যায় না? মাসের পয়লা তারিখেই আমি আমার বেতনের সমস্ত টাকা তোমার হাতে তুলে দিই। তোমার সব খরচ চলতে পারে, শুধু ওর মাইনেটাই তুমি দিয়ে উঠতে পারো না এবং সেজন্যই আমাকে লোকের কাছে ধার করে হেডমিস্ট্রেসের ঘরে ছুটতে হয়, ফাইন মাপ করার জন্য আলগা হাসি হাসতে হয়।'

মনোরমা খেপে ওঠেন, 'পরীক্ষা যদি নাই দেওয়া হয় তো না-ই হতো। তুমি তা বলে ধার করবে? একটা স্বামী ত্যাগ করা অসৎ মাস্টারনীর ঘরে গিয়ে ফষ্টিনষ্টি করবে?'

'পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত নিজেও এরকম মাস্টারনীগিরি করে চুল পাকিয়েছ, তুমি যদি সৎ থাকতে পারো তবে ইনিও অসৎ নন। এঁকে না হয় স্বামী ত্যাগ করেছে, তোমার তো তাও জোটেনি তখন। অন্যকে বলবার আগে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো।'

হঠাৎ হঠাৎ বাবা এরকম পাঁচ কথা শুনিয়ে দিতেন রেগে উঠে। তারপরেই গম্ভীর হয়ে যেতেন মনোরমা। খেতেন না, কথা বলতেন না, এক বিছানায় শুতেন না। হাতে-পায়ে ধরে আর তখন কূল পেতেন না বাবা। রাত্রিবেলা পাশের ঘরে শুয়ে বাবার হাতেপায়ে ধরে স্ত্রীকে বিছানায় উঠোবার জন্য সাধ্যসাধনার অনেকখানি অংশই টের পেতো অঞ্জলি, সে মুখ ডুবিয়ে রাখতো বালিশে, হাত দিয়ে কান চেপে রাখতো। তবু বন্ধ ঘরে মনোরমার ফোঁসফোঁস কান্নার শব্দ শুনতে শুনতে আর বাবার আদরের ভাষা শুনতে শুনতে মরে যেতে ইচ্ছে করতো তার।

মানভঞ্জনের পালা সাঙ্গ হলে কয়েকদিন পর্যন্ত বাবা একেবারে দাসানুদাস হয়ে থাকতেন। আর মনোরমা ঠিক তখনই তার নিজস্ব বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে বাবার কানে তাঁর পূর্বপক্ষের কন্যা বিষয়ে বিষ ঢালতেন। তিনি তাঁকে বুঝিয়ে ছাড়তেন একটি মেয়ের পক্ষে যতোগুলো দোষ থাকা সম্ভব অঞ্জলি তার সবখানি নিয়েই বড়ো হয়ে উঠেছে। অঞ্জলি যে মনোরমার ঐটুকু মেয়েকে হিংসে করে, এ কথাটাও তিনি বলে বলে বাবাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়লেন। অন্তত উত্তেজিত করে তুললেন। বাবাকে উত্তেজিত করে তোলা এতো সহজ ছিল যে মনোরমা অনেক সময় যেন একটা মজার খেলা খেলতেন তাঁকে নিয়ে। চোখ বড়ো করে বলতেন, 'ভাবতে পারবে না, কী অসম্ভব মিথ্যে কথা বলে। পনেরো বচ্ছর এতো মেয়ে চরিয়ে বেড়িয়েছি, রাগ কোরো না, তোমার মেয়ের মতো এ রকম নির্জলা মিথ্যে কথা বলতে শুনিনি কখনো। সেদিন দুটো ডিশ ভেঙে ফেললো আমার চোখের সামনে, বলে কিনা টুকু হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে টান মেরে ফেলে দিয়েছে।'

ব্যস, জ্বলে উঠলেন বাবা, 'অঞ্জু—'

অঞ্জলি মুহূর্তে সব কিছুর জন্য প্রস্তুত করে নিল নিজেকে, সোজা হয়ে গিয়ে দাঁড়ালো বাবার সামনে।

'তুমি মিথ্যে কথা বলেছ?'

অঞ্জলি চুপ।

'তার মানে বলেছ?'

চুপ।

'বল, বল কেন মিথ্যে কথা বলেছ। কার কাছে মিথ্যে কথা শিখেছ তুমি?'

চুপ।

'যদি জবাব না দাও অমি তোমাকে মেরে ফেলব।'

মেরে ফ্যাল, কেটে ফ্যাল, অঞ্জলি একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। বাবার শাসনের গলা হঠাৎ নেমে গেছে নিচে, আর সেই সঙ্গে দেখা গেছে মনোরমার নালিশের গলাও অস্বাভাবিক নীরব।

খুব ছোট নয় তখন, ছেলেবেলার মতো তখন সে কান্নায় গুমরে উঠত না, এই অস্বাভাবিক জেদ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত চুপ করে। আর সেই নিঃশব্দ ভঙ্গিই তার বর্ম হয়ে রক্ষা করত তাকে।

চুপ করে না থেকে তার উপায়ও ছিল না, কেমন তার মনে হত 'আমি মিথ্যে কথা বলিনি, এ কথা বলা মানেই মেনে নেওয়া যে এখন বলিনি, কিন্তু কখনো কখনো বলি। কিন্তু সত্যিই তো সে কখনো মিথ্যে কথা বলত না। কখনো না। আর বাবা যদি সেটা না বুঝে থাকেন, না জেনে থাকেন, তা হলে ভাষা দিয়ে আর কতটুকু তাঁকে বোঝানো যাবে, জানানো যাবে। সুতরাং যে কথার জবাব কৈফিয়তের অযোগ্য তার জন্য সে একটি অক্ষরও উচ্চারণ করবে কেন? তাছাড়া চুপ করে থেকে ক্রোধ চড়িয়ে শাস্তি নিতে নিতে মনোরমার উপর এক ধরনের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করত সে। সে উপলব্ধি করত হাজার সুযোগ-সুবিধার মধ্যে থেকেও মনোরমা কোথায় যেন হেরে যাচ্ছেন তার কাছে।

শুকনো শূন্য একটা গণ্ডিবদ্ধ কারাগার-জীবনে ঐটুকুই বৈচিত্র্য। নইলে সারাদিন তো শুধু গাধার মতো নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরা আর জাবর কেটে ঘুমিয়ে থাকা। দুপুরের ইস্কুলটুকু অবশ্য একটুখানি জানালার মুক্তি, কিন্তু ফিরতে তো হতই? তারপর আবার সেই একঘেয়ে সময়ের আবর্ত। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে বাবার সদয় ব্যবহার একটু ঠাণ্ডা প্রলেপ।

এখন মনে হয়, স্ত্রী আর মেয়ের বৈরী অবস্থাটা তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল। অনেক সময় যে মনোরমার নালিশ শোনামাত্রই ফেটে পড়ে শাসনে উদ্যত হতেন, সেটা অনেকটা মনোরমার উপরই রাগের প্রকাশ। যেমন অনেক মায়েরা অন্যের ছেলের উপর রাগ করে নিজের ছেলেকে পিটোয়, অনেকটা তাই। আর এই ফেটে পড়া রাগের পরেই তিনি সদয় হয়ে উঠতেন। চুপে চুপে গায়ে মাথায় হাত বুলোতেন, বোঝাতেন, বলতেন— 'মা যা বলেন একটু শুনলেই পারিস, কেন জেদ করে চটিয়ে দিস? তুই নিজে ভালোবেসে দেখ, ঠিক ভালবাসা পাবি।

সত্যি কথাই বলতেন। তখন কানে যায়নি এসব, এখন মনে হয়, বিদ্বেষ বিতৃষ্ণাটা তাদের পারস্পরিক রোগ ছিল। মনোরমাও যেমন কোনদিন কাছে টেনে নিতে পারেননি, সেও তার ছোট্ট হৃদয়ে যতটা সম্ভব বিদ্বেষ পোষণ করে রেখেছে। কখনো ভুলেও তার মুখে মা শব্দটা বেরিয়ে আসেনি। মনে মনে ভাবলেও মনোরমা বলেই ভেবেছে। লোকের কাছে উল্লেখ করতে হলে, কিছুতেই এড়িয়ে যেতে না পারলে বলেছে, আমার বিমাতা।

॥৭॥

শিশুর জন্ম দিতে প্রত্যেকবারই কলকাতা গেছেন মনোরমা। প্রত্যেকবারই তাঁর শরীর যথেষ্ট খারাপ হয়েছে এবং ভেবেছেন এবার আর বাঁচবেন না। যাবার সময় একটু সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়তেন। বাবাকে বলতেন, 'এই আমার শেষ যাওয়া, তোমরা তো ভাবো আমার জন্যই তোমাদের যত কষ্ট, এইবার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। তারপর তার দিকে ফিরতেন, 'কিন্তু ভাইবোনেদের কী করবে? তাদের তো ফেলতে পারবে না?'

এটুকুতেই বিচলিত বোধ করেছে সে, মনে মনে মনোরমার সব দোষ ক্ষমা করে বলেছে, 'ভগবান তুমি টুকুর মাকে বাঁচিয়ে রেখ।' তারপর চলে গেলে একটু একটু মনও খারাপ হয়েছে।

প্রথমবারের পর আর কোনোবারই তাকে কোথাও পাঠাবার প্রশ্ন ওঠেনি, কেননা সংসারের পক্ষে তখন সে অপরিহার্য। বাবাকে দেখাশুনো করার ভারও তার ঘাড়েই পড়েছে। যত অল্প সময়ের জন্যই যান মনোরমা, ফিরতে ফিরতে তো সেই চার মাস হবেই। বাবাকে দেখবে কে ততদিন?

তাকে দিয়ে কাজ করাবার একটা বিশেষ কৌশল ছিল মনোরমার। বলতেন, 'বড় হচ্ছ, কেমন করে রাঁধতে হয় শিখে নাও,' এই বলে রাঁধিয়ে নিতেন। বলতেন, 'মেয়ে হয়ে জন্মেছো একটু সেলাই ফোঁড়াই না জানলে চলবে কেন?' এই বলে ছেঁড়া-ফাটা যা কিছু সংস্কার দরকার করিয়ে নিতেন, বাচ্চাদের নিমা ফ্রক জাঙিয়া কাঁথা কিছুই বাদ রাখতেন না। ঠিক একই কৌশলে তিনি ঘর ঝাঁট দিইয়েছেন, কাপড় কাচিয়েছেন, জলখাবার তৈরি করিয়েছেন ঘুম পাড়িয়েছেন আর কাজ শেখাবার ঠেলায় প্রাণান্ত হয়েছে অঞ্জলি। পড়াশুনো করতে পারেনি, দেরি হয়ে গেছে স্কুলের, কামাইও হয়েছে কতদিন।

মনোরমা চলে গেলে ঝপ করে যেন একটা বিশ্রাম লাফিয়ে পড়ত সংসারে, আর বাবা সেই সময়েই বলতেন, 'সব চাপ তোর উপর পড়ে গেল, দাঁড়া, কালই লোক খুঁজে আনবো একটা।' হাসি পেত অঞ্জলির। একটা প্রহসন বটে। হাজার বারণ করলেও কাজের লোক জুটিয়ে আনতেন তিনি, ফাঁকা ফাঁকা দিন রাত নিয়ে অঞ্জলি সারা বছরের পড়া ঐ সময়ের মধ্যে সেরে রাখতো। বাবা সেই সময়ে পড়াশুনোতেও সাহায্য করতেন, অশনবসনের খোঁজও নিতেন। বাবার উপর সব রাগ-অভিমান তখন জল হয়ে যেত, আস্তে আস্তে কখন যেন স্বাভাবিক সম্পর্কটা একটা সুস্থ চেহারা নিয়ে ফিরে আসত। এমন কি কখনো কখনো মৃত স্ত্রীকেও স্মরণ করতেন বাবা। বলতেন, 'তুই বড় হচ্ছিস, আর দেখতে ঠিক তোর মার মতো হয়ে যাচ্ছিস।'

একদিন একটা পেঁয়াজি রংয়ের শাড়ি কিনে এনে দিলেন, বললেন, 'ময়নামতীর কাপড়, বুঝলি? এসব কাপড় তোর মা খুব ভালবাসতেন, এই রংটা পরলে খুব সুন্দর দেখাত।'

অঞ্জলি ফ্রক ছেড়ে তাড়াতাড়িই শাড়ি ধরে ফেলেছিল। আর বাড়ন্ত গড়নে ফ্রক মানাত না। একা ঘরে বাবার দেওয়া সেই শাড়ি পরে নিজেকে সে আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখত, মার চেহারা মনে করার চেষ্টায় গলদঘর্ম হত। আর তারপরেই একদিন আরো একটি শিশু নিয়ে ফিরে আসতেন মনোরমা, আবার উল্টে যেত চাকা। আবার সেই অন্ধকারের রাজত্বে কেবল কানামাছির মতো ঘুরপাক খাওয়া।

বিয়ের আগে পর্যন্ত মনোরমাই তাঁর মাকে ভরণপোষণ করতেন। বিয়ের সময় তাঁর দাদার সঙ্গে পুনর্মিলন হওয়াতে সে ভারটা তাপস খাস্তগীরই নিয়ে নিয়েছিলেন। খুব ভালোমানুষ ছিলেন তিনি, বিয়ের চিঠি পেয়েই ছুটে এসেছিলেন খুশি হয়ে, মা এবং বোনের সব অপরাধ ভুলে সর্বরকমে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের, বেশ ভালোভাবেই টাকা পয়সা-খরচ করেছিলেন বিয়েতে। বাবাকে বলেছিলেন, 'এক সময়ে রাগের মাথায় তোমার কাছে আমি ওদের সম্পর্কে অনেক অন্যায় কথা বলেছি, তুমি সে সব ভুলে যেয়ো।'

বাবা বলেছিলেন, 'কী বলেছিলে মনে নেই, তাই ভোলার কথাও ওঠে না।'

তাপসের স্ত্রী অবশ্য আসেননি এবং এই প্রস্তাবেও রাজি হননি যে শাশুড়ির সঙ্গে একসঙ্গে থাকবেন। তিনি বলেছিলেন, 'তোমার মা, নিশ্চয়ই তাঁর জন্য তুমি সব কিছু করতে বাধ্য কিন্তু এক সঙ্গে থাকলে আবার যে সেই অশান্তির পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, তা কি কেউ বলতে পারে? সুতরাং যা কর আলাদা ভাবে কর। কলকাতায়ই থাকুন তিনি, তুমি খরচ দাও। তাছাড়া দিদির ছেলে দুজনও তো আছে, তারাও তো ওঁর কাছেই থাকবে? তাদের বাবাও তো বলেছে টাকা পাঠাবে। কাজেই ছেলে এবং জামাই দু'জনের টাকাতে ভালোই থাকবেন উনি, আর তোমারও কলকাতা যাবার একটা জায়গা হবে।'

এই পরামর্শ সকলেরই মনঃপুত হয়েছিল এবং ছেলে এবং জামাইয়ের খরচে মনোরমার মার সংসার মসৃণভাবেই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মনোরমা যখনই গেছেন, তাঁর খরচও বাবা সর্বতোভাবে দিয়ে গেছেন, শাশুড়িকে। ফলত ওষুধ ডাক্তার প্রসব এসব ছাড়াও দৈনন্দিন প্রয়োজনের তালিকা মেটাতে ঘাম ছুটে গেছে তাঁর। মাইনের প্রায় সমস্ত টাকাটা তুলে দিয়েও কুলিয়ে উঠতে পারেননি। বলতে গেলে অঞ্জলিকে নিয়ে তিনি নিজে যে টাকাটা এখানে খরচ করতেন তার বেশিরভাগই ধারে চলত। মনোরমা আসামাত্রই একটা ভয়ানক আর্থিক অনটনে বাবা এমন জর্জরিত হয়ে পড়তেন যে কিছুদিন পর্যন্ত এক ধার শোধ করে আর এক ধারের চেষ্টা ছাড়া অন্য কোনদিকে তাকাবার অবসর থাকত না। এবং বলাই বাহুল্য সেই সময়ে কারও মেজাজই ভদ্র থাকত না। কথার পৃষ্ঠে একটা কথাও সহ্য করতে পারতেন না কেউ, অশান্তি আরো দানা বেঁধে উঠত। এবং যেহেতু অঞ্জলি বলতে গেলে মনোরমার সংসারে একজন আপদ বালাই ছাড়া আর কিছুই নয় কাজেই আগুনের তাপটা তার উপর দিয়েই বয়ে যেত জোরে। আর সবচেয়ে যা আশ্চর্য, ঐ অবস্থার মধ্যেই কয়েক মাস পরে মনোরমাকে আবার বমি করতে দেখত অঞ্জলি। তার বুক কেঁপে উঠত। তার ধারণা ছিল, এই বমি হওয়া, খেতে না পারা আর শুয়ে শুয়ে থাকাই সন্তানসম্ভবা হয়েছে কি হয়নি জানার একমাত্র উপায়। অন্য উপায়টা সে জানত না। এবং ক্লাস নাইনে ওঠার আগে এও

জানত না যে কী উপায়ে শিশুর জন্ম হয়। ক্লাসের একটি বিবাহিতা মেয়ে যেদিন এই রহস্য উদঘাটন করল বন্ধুদের কাছে, অঞ্জলির সেদিন গা গুলিয়ে উঠেছিল, ঘুম হয়নি সারারাত, শুধু তাই নয়, বাবার উপর একটা অদ্ভুত বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গিয়েছিল মন, বরং মনোরমার জন্যই সহানুভূতি বোধ করছিল একটু একটু। মনোরমার অনেক আক্ষেপ-বিক্ষেপের মানেটা যেন পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। সে অনুভব করেছিল বছরের এ-মাথা ও-মাথা সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য তার বাবাই সর্বতোভাবে দায়ী, মনোরমা নয়।

তা হলে তার মার কেন, মাত্রই একমাত্র সন্তান সে নিজে, তার কারণ কী? মার সঙ্গে কি পেরে ওঠেননি? না কি এক একজন মেয়ের এক এক রকমের ধাত থাকে? এত কাল পরে, এই বুড়ো বয়সে এ কী উর্বর মাটি মনোরমার? বেচারা!

ক্যানভাসের চুনকাম-করা পাতলা পার্টিশনের এপাশে-ওপাশে সব ঘর। রাত্রিবেলা নিতান্ত ফিসফাস কথাও প্রায় ঝাপসা হয়ে কানে আসে। অঞ্জলি পাশের ঘরের বাবা এবং বিমাতার খাটের সামান্যতম শব্দেও চমকে উঠত কয়েকদিন, ভিতরে যেন একটা দুরন্ত ইঞ্জিন চলতে থাকত পুরোদমে, রক্ত গরম হয়ে উঠত।

সে অন্য কথা ভাবার চেষ্টা করত। পড়াশোনার কথা, পরীক্ষার কথা। শোনা যাচ্ছে শিগ্‌গিরই বাবা কলকাতা বদলি হচ্ছেন, সেই কলকাতার কথা— আর কলকাতার কথা ভাবলেই সীতেশদাকে মনে পড়ে যেত। ভেবে পেত না সীতেশদা এখন কী করছে, কী করতে পারে। মামা-মামীই বা কেমন আছেন, কে জানে। সেই যে একদিন চলে এল তারপর থেকে যেন মুছে গেল সব। তখন দরকার হয়েছিল চিঠি লিখেছিলেন বাবা, আর এখন দরকার নেই, একটা খোঁজও নেন না। একটা পৌঁছনোর খবর পর্যন্ত দেননি তিনি। বরং মামা পর পর দু'খানা চিঠি লিখেছিলেন, কে জানে তারও জবাব হয়ত দেওয়া হয়নি।

কিন্তু সে দিয়েছিল। খাতার পাতা ভরে অনেক কথা লিখেছিল, তারপর বাবাকে বলেছিল, 'বাবা, পোস্টপিস থেকে একটা খাম এনে দেবে?'

বাবা ব্যস্তসমস্ত হয়ে আপিস যেতে যেতে বলেছিলেন, 'খাম? খাম দিয়ে কী করবি?'

'মামা-মামীকে চিঠি লিখব।'

'তোকে আর লিখতে হবে না, আমিই লিখে দেব।' ব্যস, চুকে গেল সব। ঐ মফস্বল শহরে, অত দূরের পোস্টাপিস থেকে অতটুকু মেয়ে আর কী করে নিজে খাম-পোস্টকার্ড এনে চিঠি লিখবে? আর পয়সাই বা কোথায় তার কাছে। মনের দুঃখে ছিঁড়ে ফেলল চিঠি।

সীতেশদাও লিখেছিল কলকাতা থেকে, অনেক কথা লিখেছিল, তার কলেজের কথা, নতুন বন্ধুদের কথা আর এ কথাও লিখেছিল, 'তোমার চিঠির জবাব পেলে, যদি তুমি বল, তা হলে একদিন সপ্তাহের শেষে তোমাকে দেখে আসব গিয়ে।'

সেই চিঠি পড়ে মনোরমা তুমুল কাণ্ড করলেন। তাঁর মতে সেই চিঠির ভাষা ভাইবোনের পত্রালাপের ভাষা নয়, প্রেমিক-প্রেমিকার রসালাপ মাত্র।

॥৮॥

এই করে করেই দিন এগিয়ে যাচ্ছিল, তার মধ্যে বাবার কলকাতা বদলির হুকুমও এসে গেল। নাইন থেকে টেনে ওঠার পরীক্ষা তখন আসন্ন, কিন্তু দেওয়া হল না। শরীরে ষোলো বছরের বসন্ত নিয়ে নাম কাটা সেপাই হয়ে চলে আসতে হল কলকাতা। আর এসেই নতুন সংসারের লটবহর গোছাতে গোছাতে কেটে গেল সময়। তারপর যখন একটু স্থির হয়ে বসে পড়ার কথা উঠল, স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে দেখা গেল মাঝামাঝি সেশনে কোনো স্কুলই নেবে না তাকে। মনোরমা বললেন, 'ঢের হয়েছে, আর পড়াশুনোর দরকার নেই, এখন ঘরের কাজকর্ম শিখুক, (শিখুক ? কী কাজ না সে করেছে মনোরমার সংসারে? জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সবই। কী মনোরমা করিয়ে নেননি তাকে দিয়ে?) বিয়ের চেষ্টা করা হোক।' এই বলে তিনি, শুধু চেষ্টা নয়, সঙ্গে সঙ্গে একটি পাত্র জুটিয়ে ফেললেন। ছেলেটি পাড়ার মস্তান, সে হাতে থাকা মানে পাড়ার মাথায় পা দিয়ে বসে থাকা। তা ছাড়া ছেলেটি বলেছে একটি পয়সা নেবে না।

যখন তারা নতুন বাসিন্দা হয়ে এল, 'মাসিমা মাসিমা' করে খুব মন জুগিয়ে চলেছিল ছেলেটি মনোরমার। যা তিনি চান, চোখের পলকে তা জুটিয়ে দিচ্ছিল, গয়লা ঠিক করে দেওয়া থেকে ধোপা মুদি ডাক্তারখানা ইত্যাদি সব কিছুই সঙ্গেই সে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিল এবং তা ধারে। অভাবের সংসারে যা অবশ্যম্ভাবী।

মনোরমা নিমেষেই বুঝে নিয়েছিলেন যে এই ছেলের আসল লক্ষ্য তিনি নন, তাঁর স্বামীর মেয়ে। তাই আভাসে-ইঙ্গিতে এটা তাকে বুঝতে দিয়েছিলেন 'অনুগত থাকো, পাবে।' সেই আশায় আশায় সে মনোরমার জন্য দিনকে রাত করে ফেলত, রাতকে দিন।

বাবা বললেন, 'এই তোমার পাত্র?'

মনোরমা ঝাঁঝিয়ে বললেন, 'কেন, মন্দটা কী?' স্বাস্থ্য ভালো, বংশ ভালো, বাপের বাড়ি আছে একখানা, কথাবার্তায় নম্র—'

'আর লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা।' বাবা পাদপূরণ করলেন।

'তোমার মেয়েই বা কী?' তর্ক করবার জন্য মনোরমা গুছিয়ে বসলেন। বাবা আমল না দিয়ে বললেন, 'আজকালকার দিনে কেউ ঐটুকু মেয়ের বিয়ে দেয় না।'

'মেয়ে তোমার ঐটুকু?'

'নিশ্চয়ই ঐটুকু। অন্তত ম্যাট্রিকটা পাস করবে তো?'

'সে আশা ছাড়ো।'

'কেন?'

'এখানে কোনো স্কুল ওকে নেবে না।'

'না নিলে প্রাইভেট দেবে।'

'প্রাইভেট দেওয়া অমনি অমনি হয় না। তোমার তো শুধু বাক্য সার। ক'টাকা উপার্জন কর যে সব সময় লম্বাচওড়া কথা বল? ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, একটা মেয়েকে পড়ানো, পরীক্ষা দেওয়ানো, তার ফি যোগাড় করা, এদিকে তো নাইন থেকে টেনেও উঠতে পারেনি।'

'পারেনি না, আমরা নিয়ে এসেছি, তাই।'

'থাকলেও পারত না, এ আমি লিখে দিতে পারি।'

'তুমি তো সবই লিখে দিতে পার, প্রত্যেক বছরই তো লিখে দিতে যে ফেল করবে, কখনো করেছে কি?'

এক কথায় দু কথায় এই তর্কই যে সাংঘাতিক ঝগড়ার আকৃতি নেবে তা জানত অঞ্জলি, এও জানত শেষ পর্যন্ত মনোরমা বাবাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়বেন যে ছোট ক্লাসে একটু-আধটু ভালোভাবে উঠতে পারলেও নাইন থেকে টেন-এ কখনোই সে উঠতে পারত না, এবং যদি বা উঠত ম্যাট্রিকে গিয়ে অবধারিতভাবে ফেল করত। এবং সে বিষয়ে তিলমাত্র সংশয়ের কারণ নেই কোনো। তা ছাড়া গরিবের ঘরের ষোলো-সতেরো বছরের মেয়েকে যত তাড়াতাড়ি হয় বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ভাল। খাওয়াতে-পরাতে পয়সা লাগে না? পড়াতে তো আরও পয়সা। শেষ পর্যন্ত কী? সেই তো বিয়ে। আবার তো সেই গুচ্ছের টাকা খরচ। দুভাবে খরচ করে লাভ কী। মেয়ে হল নিষ্ফলা গাছ, লালনপালনে ব্যয় আছে, অথচ ভবিষ্যতের আশা নেই কোনো। আর ছেলে? হ্যাঁ, ছেলে হলে নিশ্চয়ই সর্বাগ্রে পড়াবার কথাটাই উঠত, যত টাকাই হোক।

অঞ্জলির অনুমান সত্য করে শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর কথার এই সব প্রতিধ্বনিই সে শুনেছিল তার বাবার মুখ থেকে। এবং বাবা কিছুদিনের মধ্যেই খবরের কাগজ দেখে দেখে তাঁর সম্বন্ধের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ভগবানের অশেষ দয়ায় এই ছেলেটি নিজে থেকেই খসে গিয়েছিল একদিন। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সম্বন্ধ করে একটা অপাপবিদ্ধ অল্পবয়সী কন্যার সঙ্গে তার মা-বাবাই উদ্যোগী হয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন। বখামির দাওয়াই।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অঞ্জলির সুধাগঞ্জের কথা খুব মনে পড়তো তখন। নতুন করে মা ঠাকুমাকে ভেবে বুক ভারি হয়ে উঠতো। মনে হতো নতুন বিচ্ছেদ। শুধু নতুন বিচ্ছেদই নয়, চিরবিচ্ছেদ। মা ঠাকুমা সেখানে সেই বাড়িতেই মারা গিয়েছিলেন, সেই শহরেই তাঁদের চিতাভস্ম ছড়িয়ে আছে। ঠাকুমার পরিত্যক্ত ঘরেই একাত্ম হয়ে এতোগুলো বছর কেটে গেছে তার।

এতোগুলো বছর? কতোগুলো বছর? কতো বছর কেটেছে মায়ের মৃত্যুর পরে? ঠাকুমার মৃত্যুর পরে? আট বছরের বালিকা আজ ষোলো বছরের যুবতী। এতোদিন? এতোদিন হয়ে গেল তাঁরা নেই? তাঁদের আমি দেখি না? আর তারপরেও আমি নিজে বেঁচে আছি?

বেঁচে থাকা? এর নাম বেঁচে থাকা? দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অঞ্জলির। আবার মামাবাড়ির সুখটুকু ভেসে ওঠে মনে, মামা, মামী আর সীতেশদা। আবার মনে হয়, সীতেশদা এখনো কলকাতায় আছে। একটা চিঠি লিখে দিলে হয় না?

কিন্তু ঠিকানা? ঠিকানা কী? ঠিকানা তো কবে হারিয়ে গেছে। সেই যেদিন মনোরমা

বলেছিলেন, 'এই পত্রালাপের ভাষা ভাইবোনের নয়, প্রেমিক-প্রেমিকার— তখনি তো সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তার যেখানে যতোটুকু সুখ বা আশা বা আনন্দের তিলমাত্র সম্ভাবনা আছে, সেই সমস্ত রন্ধ্র সে নিজের হাতে বন্ধ করে দেবে। তার অপমান হয়েছিল। নিজের জন্য নয়। সীতেশদার জন্য। প্রেমিক-প্রেমিকা শব্দটা খুব পরিচিত ছিল না তার কাছে, শব্দটা এখনকার মতো খুব সহজেও উচ্চারণ করতো না কেউ, মনোরমার মুখে সেই উচ্চারণ তার কানে কুৎসিত লেগেছিল। অত্যন্ত, অত্যন্ত গর্হিত মনে হয়েছিল। সে বুঝেছিল মনোরমার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, তার মায়ের সম্পর্কিত লোকেদের অসম্মান করার জন্যই তাঁর এই সব উক্তি। বোকার মতো তৎক্ষণাৎ সে সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল, ভেবেছিল আমি জড়িত না থাকলে তো আর এসব কাদা তিনি ওঁদের ছুঁড়ে মারতে পারবেন না?

তা ছাড়া আবার বাবার কাছে সেই পোস্টকার্ডের আবেদন। আর বাবার কাছে আবেদন মানেই মনোরমার কাছে ভিক্ষে চাওয়া। আর মনোরমার কাছে চাওয়া মানেই আবার সেই বিশ্রী ভাষার পুনরুক্তি। কী দরকার অকারণ তিক্ততা বাড়িয়ে? সংসারের প্রতিটি পয়সা বাবা মনোরমার হাতে তুলে দেন, অথবা মনোরমা হিসেব করে নিয়ে নেন, মামাবাড়ির লোকেদের চিঠি লিখে সেই পয়সা তিনি নষ্ট করতে দেবেন কেন? উপরন্তু এগারো বছরের একটি বালিকাকেও যখন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না তার চরিত্র বিষয়ে।

স্কুলে যাওয়া নেই, আশা নেই, আনন্দ নেই, যে কোনদিন যে কোনো মানুষের সঙ্গে বিবাহের ত্রাস আর অভাবগ্রস্ত সংসারে চারটি সমবয়সী শিশুর আবদারে ক্রন্দনে নাজেহাল হয়ে অবিরাম চর্কির মতো ঘুরপাক খাওয়া-- এই করে করেই কাটতে লাগলো দিন। তবু সুধাগঞ্জের বাড়িটার আকাশ ছিল, মাটি ছিলো, মায়ের বোনা টগর অতসীর ডালে সাদা আর হলুদ ফুল ছিলো, ঠাকুমার তুলসীমঞ্চ ছিল, বামার মা ছিল, সুখের দিনের শত স্মৃতিবিজড়িত খাট, চেয়ার, টেবিল, আয়না, আলনা, কতো কিছু ছিলো, আর ছিলো স্কুলের মুক্তি। এখানে এই কলকাতা শহরে সব শূন্য, সব বিবর্ণ, সব শুধু হতাশার সাগরে নিমজ্জমান।

।। ৯ ।।

মাস পাঁচেক বাদে হঠাৎ একদিন অভাবনীয় ভাবে বাবা আপিস থেকে ফিরে এসে চা খেতে খেতে খবর দিলেন, 'সীতেশের সঙ্গে দেখা হলো আজ।'

'সীতেশদার সঙ্গে?' ভাইবোনেদের বিকেলের খাবার পরিবেশন করতে করতে হাত কেঁপে গেল অঞ্জলির। ভুরু কুঁচকে মনোরমা বললেন, 'সীতেশ আবার কে?'

'আরে, অতুলবাবুর ছেলে; অঞ্জুর মামাতো ভাই।'

'ও।' অমনি হাঁড়ি হয়ে গেল মুখ।

'খুব ভালো লাগলো! আমি তো চিনতেই পারিনি। সেই কবে দেখেছিলাম — এম-এ পড়তে পড়তে চাকরি পেয়ে গেছে একটা, ভালো চাকরি, বিলিতি ফার্ম, চমৎকার স্মার্ট চেহারা'— বাবা বেশ পরিতোষের সঙ্গে বলছিলেন।

অঞ্জলির বিশ্বাস হচ্ছিলো না। শুনতে শুনতে সে আশায় আকাঙ্ক্ষায় দুলছিলো। আস্তে বললো, 'একদিন আসতে বললে না, বাবা?'

'নিশ্চয়ই। কালকেই আসবে সন্ধ্যাবেলা।'

'কালকেই আসবে?'

'ঘরদোর একটু পরিষ্কার করে রাখিস।'

'কেন, লাটসাহেব নাকি? মনোরমা কনিষ্ঠা কন্যাটিকে শান্ত করার জন্য পিঠ চাপড়াতে লাগলেন জোরে।

বাবা বললেন, 'লাটের জন্য দরবার আছে, আমার বাড়িতে আসতে যাবে কেন? একজন অতিথি এলে তার জন্য অভ্যর্থনা আমি ভালোবাসি।'

'আর কী কী ভালোবাসো দয়া করে জানিয়ে দিলে বাধিত হবো।'

রাগ করে উঠে গেলেন তিনি। কিন্তু বাবা তবু খানিকক্ষণ লেগে রইলেন সেই প্রসঙ্গে! অঞ্জলিও মোহের মতো বসে বসে শুনলো। তারপর দীর্ঘ বিকেল সন্ধ্যায় রূপান্তরিত হলো, সন্ধ্যা রাত্রির সংগমে বিলীন হলো। সব কাজকর্মের শেষে অন্য দিনের মতো ক্লান্তিতে চট করে সেদিন ঘুমিয়ে না পড়ে অনবরত সে তার প্রিয় দাদাটিকেই স্মরণ করতে লাগলো। পরের দিন সকালে উঠেও সর্বপ্রথম তার যে কথা মনে পড়লো, তা হচ্ছে 'আজ সীতেশদা আসবে।'

এলো। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যা সাতটার সময় এসে হাজির হলো সে। অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরে! তুমি! এতো বড়ো হয়ে গেছ? কী আশ্চর্য! আরো সুন্দর হয়েছ! কিন্তু না, তোমার সঙ্গে কথা বলবো না, তুমি আমাকে চিঠি লেখোনি কেন? এতোদিন কলকাতা এসেছ, একটা খোঁজ করনি কেন?' ঠিক সেই রকম ফুর্তিবাজ, সেই রকম আনন্দময় সুঠাম সুন্দর পরিপূর্ণ এক টগবগে যুবক। মনোরমা ঘরে এলেন, বাবা আলাপ করিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও পিসিমাটিসি-' ডেকে ভাব করে নিল, ভাইবোনদের জড়ো করে বাইরে নিয়ে গিয়ে চকোলেট কিনে দিল, বাবার জন্য সিগার।

ঘণ্টা দুই জমিয়ে গল্প করে চা খেয়ে চলে যাবার সময়ে মনোরমা বললেন, 'আবার এসো।' তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল অতীতে যতো বিরাগই থেকে থাক, বর্তমানে তার কোনো ছাপ নেই।

এবং সেই সূত্র ধরে সীতেশের যাওয়া-আসা কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ সহজ হয়ে উঠলো। কয়েকদিনের মধ্যেই অঞ্জলির অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করে জনান্তিকে জিজ্ঞেস করলো, 'লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে কদ্দিন যাবত ঘাস কাটছো?'

বলার ধরনে মৃদু হেসে অঞ্জলি বললো, 'বেশি দিন নয়, তবে বিপদটা হচ্ছে এই যে সারাজীবনই কাটতে হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'ওখানে ইস্কুলে পড়তে না?

'পড়তাম।'

'কোন ক্লাসে?'

'নাইন থেকে টেন-এ ওঠার তিন মাস আগে এসেছি।'

'ফেল, করা ছাত্র নাকি?'

'না।'

'তবে?'

'এর মধ্যে তবে নেই কিছু, সবিস্তারে শুনতে চেয়ো না। আপাতত খবরের কাগজ দেখে বাবা যে পাত্র খুঁজছেন সেটা যদি বন্ধ করতে পারো তো বেঁচে যাই।'

'কেন, বিয়ে তো ভালো।'

'তা হলে সেই ভালোটা তোমার জন্য তোলা থাক। বাবাকে বোলো, আমি প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবো।'

'না, আমি বলবো যতো তাড়াতাড়ি পারেন বিয়ে দিয়ে দিন।' এই বলে সে বাবার কাছে গিয়ে বসলো, ভুরুটুরু কুঁচকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললো, 'একটা ভালো চাকরি আছে মাইনে খুব ভালো, আপনার একার উপর সমস্ত ভার, ছেলে হলে তো অঞ্জু এতোদিন দাঁড়িয়ে যেতো পিছনে, ও করুক না চাকরিটা।'

'অঞ্জু!' বাবা আকাশ থেকে পড়লেন, 'ও আবার কী চাকরি করবে? ঐটুকু মেয়ে? লেখাপড়াও তো জানা চাই?'

'ম্যাট্রিক পাস হলেই ওরা নেবে। আমাদের ফার্মে একটা মেয়েদের ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে কিনা। ব্যবসা বাড়াচ্ছে ওরা। আর বলতে গেলে চাকরিটা আমার হাতেই।'

'ও তো ম্যাট্রিক পাসও নয়।'

'ওঃ হো, তাই তো। সেটা বোধ হয় অসুবিধে হবে একটু।' চিন্তা করে বললো, 'তা পাসটা করে নিক না। কী আছে? প্রাইভেটে দিয়ে দিক। আট-দশ মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

'কিন্তু ওর মা ওর বিয়ের কথা ভাবছেন।'

অ্যাবসার্ড। একগাদা টাকা খরচ করে এই অভাবের মধ্যে বিয়ে দেবেন কী? এ কি গ্রাম নাকি যে বিয়ে না দিলে সমাজে পতিত হবেন? পাস করুক, চাকরি করুক, সংসারে সহায় হোক, না, না, এ হতে পারে না। পিসিমা কই? দাঁড়ান ওঁকে বলছি আমি?'

পিসিমা পাশের ঘর থেকে উঠে এসে দাঁড়ালেন, 'সময়মতো বিয়ে হওয়াই মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি, সীতেশ।'

'একশোবার। কিন্তু আমি এটাও মানব না মেয়ে বলেই তার সাত খুন মাপ, আর ছেলে হলেই তাকে চাকরির জোয়ালে ঢুকিয়ে দিতে হবে। নিশ্চয়ই অঞ্জু আপনাদের সাহায্য করবে, ভাইবোনেদের দেখবে। আপনি নিজে কত যোগ্য ভেবে দেখুন তো। আমি তো বলি, সব সময়ে তুমি যদি তোমার মায়ের আদর্শটা মনে রাখো, তা হলেই হবে।'

খুশি হলেন মনোরমা। সামলে নিয়ে বললেন, 'সেই তো দিতেই হবে বিয়ে, মিছিমিছি খরচ করে লাভ কী পড়াশুনোর খাতে।'

'না, না, খরচের জন্য ভাববেন না। খরচ আবার কী? স্কুলের তো আর মাইনে নেই? শুধু

পরীক্ষার ফি। সে বন্দোবস্ত আমি করে দেব। আমার কথা হচ্ছে, পাস করে চাকরিটা ও নিক। কিছু দিন চালাক না সংসারটা। পিসেমশায় আর কত টানবেন? অবসর নেবারও তো সময় হল।'

পরামর্শটা মনে ধরলো বাবার, মাথা নেড়ে বললেন, 'যুক্তির দিক থেকে তুমি ঠিকই বলেছ। তা ছাড়া বিয়ে দেব বললেই কি বিয়ে দেওয়া যায়? একটা অতি হতচ্ছাড়া পাত্রেরও আজকাল যা ডিমান্ড! মেয়ে দেখার আগেই বলে "নগদ দেবেন কত?" আরে বাবা নগদই যদি দেব, তবে আর তোমার মত ফেলমারা পাত্র পছন্দ করব কেন?'

'একজন ফেলমারা পাত্র পছন্দ করেছিলেন নাকি?'

'করিনি— তবে—' বাবা ঘুরিয়ে নিলেন কথা, চুপ করে থেকে দুঃখিত স্বরে বললেন, 'তেমন উপযুক্ত পাত্র আনব সেই সম্বল আমার কোথায় বল?'

মনোরমা বললেন, 'তুমি যে চাকরির কথা বলছ, সেটা কি তোমাদেরই আপিসে?'

'একেবারে আমার হাতে। যাকগে, আপনারা ভেবে দেখুন কী করবেন, তারপর আমি এ নিয়ে কথা বলব।' সীতেশদা উঠল।

কিন্তু ঐটুকুতেই মন্দ কাজ হল না। দেখা গেল বিষয়টা বাবা এবং মনোরমা দুজনেই ভাবছেন। না ভেবেও উপায় ছিল না, বিয়ের চেষ্টা করতে করতে বাবা হয়রান হয়ে এইটুকু বুঝে নিয়েছিলেন যে, টুটাফুটা যে কোনো পাত্রই তাঁর কন্যাটিকে বিনা পণে গ্রহণ করতে রাজি নয়। এবং মনোরমা বুঝেছিলেন, এমন একটা কাজের মানুষ দ্বিতীয়বার জোটানো সম্ভব নয়। সেটা যে তিনি এই নতুন বুঝলেন তা নয়, তবু কী ভেবে বিয়ের তালটা তুলেছিলেন বুঝতে পারছিলো না অঞ্জলি। মনোরমার মনস্তত্ত্ব যে কোন জটিল পথে আবর্তিত হচ্ছিল ঠিক ধরা যাচ্ছিল না। গোড়া থেকেই অঞ্জলির লেখাপড়া বিষয়ে তিনি বিরোধী ছিলেন। ক্লাসে ভালো করলে তক্ষুনি মন খারাপ হয়ে গেছে তাঁর। হয়তো ভেবেছিলেন, কিছু না করিয়ে বসিয়ে রাখাটা ভালো দেখায় না, অন্তত একটা ভান করা যাক বিয়ে দেবার। বাবা হঠাৎ অবশ্য সেটা সত্য ভেবেই খোঁজাখুঁজি শুরু করেছিলেন এবং বলাই বাহুল্য টাকার প্রশ্ন উঠলেই মনোরমা নাকচ করে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ এই চাকরির খবরটা শুনে দুজনেই প্রলুব্ধ হলেন। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সীতেশের সব পরামর্শই তাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করলেন।

অতএব ঠিক হয়ে গেল পড়া, বাবা বললেন, 'তা হলে তুমিই একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়ো, পাসটা করলে সত্যিই যদি চাকরিটা হয়—'

'নিশ্চয়ই। কেন হবে না।'

উৎসাহে টগবগ করতে লাগলো সীতেশ। মনোরমা চুপ করে রইলেন।

সস্তার জন্য টালিগঞ্জ পাড়ায় বাড়ি নিয়েছিলেন অঞ্জলির বাবা। পুলের এদিকে, বাজারের কাছাকাছি। এত বসতি ছিল না তখন, ভাড়ার তুলনায় বাড়িটা তাই একটু বড়সড়ই ছিল। আর সীতেশ থাকত ভবানীপুরে, হরিশ মুখার্জি রোডের এক মেসে। প্রায়ই সে চলে আসত পড়াতে, কিন্তু অঞ্জলি যে পড়তে বসবে এমন সময় তার কোথায়? মনোরমা নানা ধরনের শারীরিক অসুস্থতায়

কষ্ট পাচ্ছিলেন, কাজের লোক পাওয়া যাচ্ছিল না, এবং সংসারের চাকায় অবিশ্রান্ত তেল দিতে দিতে বিদ্যাবুদ্ধি সব মাথায় উঠছিল অঞ্জলির। সীতেশই একদিন ধরে নিয়ে এল একটা লোক। বলল, 'এইবার ভালো করে পড়াশুনো কর।' কিন্তু তাও হল না। সমস্ত দায়দায়িত্ব যে কখন তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন মনোরমা, তা বোধ হয় মনোরমা নিজেও জানতেন না।

শেষে সীতেশই বুদ্ধি দিল একটা। বলল, 'টিউশনির নাম করে বেরিয়ে আসতে পারবে বাড়ি থেকে?'

'টিউশনির নাম করে?' অবাক হয়ে গেল অঞ্জলি।

সীতেশ বলল, 'যা বলছি তা শোন। তোমার বাবা বর্তমানে বেশ আর্থিক কষ্ট পাচ্ছেন, এই সময়ে তুমি যদি কিছু সাহায্য করতে পারো সংসারে, নিশ্চয়ই ওঁরা আপত্তি করবেন না। টুকুকে তো দেখছি আবার সাহেবি স্কুলে ভর্তি করেছেন, অন্তত তার পড়া খরচটা চালাতে পারলে তোমার বিমাতাটি এ কাজে সানন্দে সম্মতি দেবেন।

'আমি কী করে আর্থিক সাহায্য করব? আমাকে কে টিউশনি দেবে? আমি তো ম্যাট্রিকও পাস করিনি।'

'বোকা মেয়ে, টিউশনি তোমাকে করতে হবে না, তুমি শুধু টিউশনির নাম করে বেরিয়ে আসবে বিকেলবেলা, তারপর সব আমার উপর ছেড়ে দাও।

অঞ্জলি তবু তার দাদার কথা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে তাকিয়ে ছিল। দাদা মাথার খোঁপা ধরে নাড়িয়ে দিল, 'তুমি একটি আস্ত গাধা!'

পরের দিনই সীতেশ এসে মনোরমার কাছে গিয়ে বসল, সহানুভূতির সুরে বলল, 'ইশ, পিসীমার শরীরটা দেখছি একটুও ভালো নেই।'

মনোরমা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আর ভালো, এখন মরলেই তোমার পিসেমশাই রক্ষে পান।'

'কী যে বলেন। এই অঞ্জু, সারাদিন করো কী? মাকে একটু যত্ন করতে পারো না? পরীক্ষাটরীক্ষা ভুলে যাও, আগে সংসার দেখ। মেয়েদের যা কর্তব্য, সেই সেবাধর্মটা একটু কাজে লাগাও।'

দাদার তিরস্কার শুনে অঞ্জলি ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, কালকের পরামর্শের সঙ্গে এব কোনো সম্পর্ক আছে কি না।

সীতেশ পকেট থেকে লজেন্স টফি বার করল, 'এই টুকু, এখানে এস, নুটু কই? নন্টু কই?

এই পর্যন্ত দেখেই অঞ্জলি চলে যাচ্ছিল, মনোরমা সীতেশের জন্য চায়ের হুকুম দিলেন। বোঝা গেল তিনি প্রীত হয়েছেন। যখন চা নিয়ে ফিরে এল, তখন প্রায় গলায়-গলায়।

সীতেশ বলছিল, 'আমার তো মনে হয়, এটা না নেওয়া বোকামি হবে। ভেবে দেখুন, বিকেলে মাত্র আড়াই ঘণ্টার কাজ, একটা ছোট মেয়েকে পড়ানো, আসলে একটু দেখে রাখা, মা নেই কিনা। আমারই পরিচিত বাড়ি, মাইনে চল্লিশ টাকা। সংসারের পক্ষে এই দুর্দিনে কি এটা কম সাহায্য।'

মনোরমা বললেন, 'তা আমি কী বলব বাছা, জানেন তোমার পিসে আর তার আদরিণী কন্যা।'

'পিসেমশায় তো বলবেন, পরীক্ষার সময় এসব দরকাব নেই, আপনি তা শুনবেন কেন? পরীক্ষা তো কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না? আর এইটুকুতেই যদি তার পরীক্ষা দেওয়া না হয় তা হলে

সে পরীক্ষায় আর কাজ নেই।

অঞ্জলি চা দিয়ে ফিরে গেল রান্নাঘরে। খানিক-বাদেই সীতেশকে দেখা গেল চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে, চোখ টিপে বলল, 'কেল্লা ফতে। পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত টিউশনি, বুঝলে? আমার মেসে যেয়ো।'

মেসেই গিয়েছিল, সেখান থেকে সীতেশ তাকে একটা টিউটরিয়েলে নিয়ে এল, ভর্তি করে দিয়ে বলল, 'কাল থেকে সময়মত নিয়মিত পড়তে আসবে এখানে, বুঝেছ?'

'আর টিউশনি?'

'চারশো টাকা মাইনে পাই, চল্লিশটা টাকা বোনের জন্য আমিই মাসে মাসে জোগান দিয়ে যেতে পারব।'

'না, না, ছি—'

'বোকামি করো না। ভালো করে পড়াশুনো করো, ভালোভাবে পাস করা চাই। ভেব না, দুঃখের দিন তোমার শেষ হয়ে এল।'

'শেষ!'

'নিশ্চয়ই। এর পরে কলেজে ভর্তি হবে, আই, এ পাস করবে, বি-এ পাস করবে, স্বাধীনভাবে উপার্জন করবে, কিসের আর তোয়াক্কা।'

'কিন্তু সেই চাকরি?'

'কোন চাকরি?'

'যে চাকরির কথা বলে পড়াবার অনুমতি নিলে।'

'শোনো, আমি যে খুব একটা ধোঁকা দিয়েছি ওঁদের তা নয। আমাদের ফার্মে সত্যি মেয়ে নিচ্ছে, কিন্তু আমি তোমাকে সে চাকরি করতে দেব না, ওটা খুব সম্মানজনক নয়। তুমি পড়বে, অন্তত বি-এটা পাস কববে—তারপর যা হয় হোক।'

'কিন্তু বাড়িতে—'

'ও সব ভুলে যাও। তুমি বড় দুর্বল, বড় বেশি ভালোমানুষ, এবার একটু মেরুদণ্ড সিধে করে দাঁড়াতে হবে তোমাকে। যা অন্যায় তাকে অন্যায় বলেই প্রতিবাদ করতে হবে। তোমার সম্মান যদি তুমি নিজে না অর্জন কর কে তোমাকে হাতে তুলে দেবে?'

অঞ্জলি চুপ করে ছিল। সীতেশ পিঠে হাত রাখল, 'আর একটা অনুরোধ—'

'কী?'

'মনোরমা দেবীকে মা বলে না ডাকলেই তো আর তোমার নিজের মা কখনো ফিরে আসবেন না? তা হলে এই বিরোধ কিসের?'

'বিরোধ!'

'উনি যে মানুষ হিসেবে খুব উৎকৃষ্ট তা আমি বলছি না। কিন্তু তুমি তাঁকে যতটা নৃশংস ভাবো তা হয়তো নন তিনি।'

সীতেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অঞ্জলি। ভক্তিতে ভালোবাসায় তার মন ভরে যাচ্ছিল।

এ কথা তার বাবাও বলেছিলেন একদিন। আজকের অঞ্জলি দেবী পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন, সে সময়ে বিমাতার প্রতি তাঁর আচরণ আরো অনেক সশ্রদ্ধ হতে পারত যদি প্রথম দিন থেকেই মৃত মায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে অদ্ভুত একটা বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে না থাকতেন।

নিজের সম্মান নিজে উপার্জন করা বিষয়ে যে মন্ত্র সীতেশ তাঁর কানে ঢেলে দিয়েছিল, তার মর্মার্থও সেদিন তিনি গেঁথে নিয়েছিলেন মনের মধ্যে। কিন্তু সীতেশদাকে বোঝাতে পারেননি যে, কথার বদলে কথা দিয়ে প্রতিরোধ তাঁর স্বভাবের বাইরে। আশৈশব যে রাগ দুঃখ বেদনা আর অপমান তাঁকে প্রতি মুহূর্তে কুরে কুরে খেয়েছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পদ্ধতি আত্মহনন ছাড়া আর কিছুই তিনি ভেবে পাননি। তা ছাড়া প্রতিপক্ষ তো শুধু তাঁর বিমাতাই ছিলেন না, তাঁর ভাগ্যই তো তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল। সেখানে তিনি কোন লড়াইতে জিততে পারেন? মানুষ তো উপলক্ষ মাত্র, ঈশ্বরই তাঁকে ঠেলে দিয়েছিলেন অন্তহীন অন্ধকারের যূপকাষ্ঠে। যা থেকে আজকে পর্যন্তও তিনি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলেন না।

।। ১০ ।।

সীতেশদা তার প্রোফেসর ডক্টর সরকারের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো সেদিন। বলতে গেলে তিনিই ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান। সীতেশ বলেছিলো, 'এই মাস্টার মশায়ের কাছে পড়েই আমি শেষ পর্যন্ত অত ভালো করতে পেরেছিলুম বি-এ পরীক্ষায়। আর আমার এই চাকরিও অনেকখানি তাঁর প্রভাবেই পাওয়া। খুব ভালোবাসেন আমাকে।'

বাইরের জগতে অঞ্জলির সেই প্রথম পদক্ষেপ। ভিতু চোখে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো চারদিকে। ফিসফিস করে বলেছিলো, 'এখানে কি কলেজের মেয়েরাও পড়ে?'

'ছেলেরাও পড়ে। ম্যাট্রিক থেকে এম-এ পর্যন্ত পড়ানো হয় এই টিউটরিয়েলে।'

'ছেলেরাও পড়ে?' অঞ্জলি অবাক। চলতে তার পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিলো। সীতেশ তাকে নিয়ে মাস্টার মশায়ের ঘরে ঢুকলো। টেবিলের স্তূপাকৃতি কাগজের মধ্যে কী যেন খুঁজছিলেন তিনি। মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। সীতেশকে ছুঁয়েই তাঁর দৃষ্টি একাগ্র হলো অঞ্জলির দিকে।

ভদ্রলোক বয়স্ক, মাথার চুল হালকা, রং তামাটে, চোখে মোটা কাচের চশমা। স্বাস্থ্যের জৌলুস আছে, ভঙ্গি অত্যন্ত শান্ত, প্রশস্ত কপালে চিন্তাশীলের অভিব্যক্তি। তাঁর স্থির চোখের দৃষ্টির তলায় একটু অস্বস্তি বোধ করছিলো অঞ্জলি। তিনি তা ফিরিয়ে নিয়ে হাসিমুখে সীতেশের দিকে তাকালেন, 'কী খবর? কেমন আছো?

'আমার বোন অঞ্জলি, ওকে ভর্তি করলাম এখানে, ম্যাট্রিক দেবে প্রাইভেটে।'

'খুব ভালো। বোসো। বম্বে থেকে এসেছে বুঝি?'

'না। আমার পিসতুতো বোন। পিসিমা নেই, অনেক অসুবিধের মধ্যে ওকে পড়াশুনো করতে

হয়। প্রায় দুটো বছর নষ্ট হয়েছে। কিন্তু ছাত্রী ভালো। আপনি যদি পীযূষ সেনকে বলে দেন, ইংরিজিতে বড্ড কাঁচা।'

'পীযুষ? পীযূষই তো ওদের ইংরিজি পড়াচ্ছে, না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলবো।' তারপর তাঁর স্থির দৃষ্টি অঞ্জলির দিকে ফিরলো, 'তুমি আমার কাছেও আসতে পারো মাঝে মাঝে।'

'তা হলে তো কথাই নেই।' খুশি হ'য়ে উঠলো সীতেশ, 'আমি আপনার ওখানে নিয়ে যাবো একদিন। আজ উঠি, আপনি ব্যস্ত।'

'হ্যাঁ, তাই যেয়ো। আমি তো মোটামুটি রোজই বাড়ি থাকি।' দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন তিনি।

রাস্তায় এসে সীতেশ বললো, 'তুমি যেন আবার বাড়ি গিয়ে বলে ফেলো না এই কোচিং ক্লাসের কথাটা।'

'কী বলবো?'

'কী আবার বলবে, কিছু না। জিজ্ঞেস করলে তবেই তো জবাব দেবার কথা ওঠে? তখন বলবে, একটা ছোটো মেয়েকে পড়ানো এবং দেখাশুনো করে ফিরলে।'

'মিথ্যে কথা?'

'প্রাণের দায়ে।'

'তা বটে।'

'এখন কী করবে? হাতে কিন্তু বেশ সময় আছে।'

'কী করবো?'

'আমার এক বন্ধুর বাড়ি যাবে?'

'কোথায়?'

'এই তো এলগিন রোডে। এলগিন রোড কোথায় জানো তো? না কি এখনো সুধাগঞ্জেই আছ?'

'সুধাগঞ্জেই আছি।' অঞ্জলি হাসলো।

'কলকাতা শহর দেখেছো ঘুরে?'

'আজকের আগে একদিনও বেরুইনি।'

'সে কী?'

'অবাক হবার কী আছে? কোথায় যাবো? কার সঙ্গে যাবো? আমার সময়ই বা কোথায়?'

'কেন, তোমার বাবা নিয়ে যাবেন। কলকাতায় তো এই প্রথম এলে?'

'তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে মনেও থাকতো না যে আমি কলকাতায় এসেছি। শুধু টালিগঞ্জের দম-বন্ধ বাড়িটার চেহারা সুধাগঞ্জের চেয়ে অন্যরকম, এই যা।'

'ছি ছি, চলো আজ তোমাকে ঘুরিয়ে আনি।' সীতেশ ঘড়ি দেখলো, 'এখন গেলে ঠিক সুদর্শনকে পাবে, ওর গাড়ি আছে, অনেক বেড়ানো যাবে।' হাত দেখিয়ে একটা ট্যাক্সি থামালো সে।

'এই বন্ধু তোমার সঙ্গে কাজ করেন নাকি? গাড়িতে বসে চকচকে চোখে জানালা দিয়ে অঞ্জলি জনারণ্য দেখছিলো।

সীতেশ মাথা নাড়লো, 'না, না, আমরা এক কলেজে পডতাম, এক বছরের সিনিয়র ছিলো। দারুণ ছাত্র। বি এ তে ফার্স্ট, এম এ তে ফার্স্ট। এইটুকু বয়সে অর্থনীতির জগতে একজন দিকপাল।'

শোনো, আমি কিন্তু ওদের বাড়ির মধ্যে যাবো না।'

'কেন?'

'চিনি না জানি না, আমার লজ্জা করে।'

'লজ্জার কেউ নেই, বাড়িতে সুদর্শন একাই থাকে। ওর বাবা মস্ত ডাক্তার, সারাদিন নিজের পেশাতেই ব্যস্ত, তাঁর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। ভদ্রমহিলা, মানে সুদর্শনের মা, বছর দুই আগে মারা গেছেন, তাছাড়া বাড়িটা এতো বড়ো যে কারো সঙ্গে কারো দেখা হওয়াও সহজ নয়।'

'তা হোক, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবো, তুমি ডেকে এনো।'

'ঠিক আছে।'

টিউটোরিয়েল হোম থেকে সামান্যই রাস্তা, ট্যাক্‌সিতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগলো না। বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে সীতেশ বললো, 'তুমি বোসো তাহলে, আমি দেখে আসি। এক মিনিট।'

অঞ্জলি বললো, 'আমি নেমে দাঁড়াই,' খুব আস্তে বললো, 'ট্যাক্‌সিও এই আমি দ্বিতীয় দিন চড়ছি। প্রথম দিন হাওড়া স্টেশন থেকে টালিগঞ্জ গিয়েছিলাম, আর আজ। বুঝতেই পারছো একদিনের পক্ষে একটু বেশি ভোজ হয়ে যাচ্ছে আমার। ভয়-ভয় করছে।'

সীতেশ হেসে দরজা খুললো, দু'জনেই নামলো, অঞ্জলি দাঁড়িয়ে থাকলো গাড়িতে ঠেসান দিয়ে, সীতেশ ঢুকে গেল ভিতরে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বেরিয়েছিলো পাঁচটার সময়, এখন নিশ্চয় ছ'টা বেজে গেছে। তবু তখনো আকাশ তেমন ঝাপসা হয়ে ওঠেনি। অঞ্জলি আজকের দিনটার কথা ভাবছিলো, এরকম একটা সুখের দিন তার সারা জীবনেই এই প্রথম। খুব ভালো লাগছিলো তার। কলকাতা শহরের গল্প সে অনেক শুনেছে, কখনো দেখেনি। আবার কেমন ভয়-ভয়ও করছিলো। থেকে থেকে সীতেশদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভালোবাসায় সে অভিভূত হয়ে পড়ছিলো। সীতেশদাব সঙ্গে দেখা না হলে কি তার পড়াশুনো হতো? এমন করে বাইরে আকাশের তলায় এসে দাঁড়াতে পারতো কি?

শুধু একটাই খটকা। রোজ টিউশনির নাম করে বেরিয়ে ঢুকতে হবে কোচিং ক্লাসে। আর মাসের শেষে চল্লিশ টাকা ঘুষ দেবে সীতেশদা। খোলাখুলিভাবেও দিতে পারতো, কিন্তু তাতে রোজ এই টিউটোরিয়েলে আসা সম্ভব হতো না। কামাই হোতোই। শেষে টাকাটাও যেতো, পরীক্ষাটাও দেওয়া হতো না। অনেক ভেবে-চিন্তে এই মিথ্যার আশ্রয়। তাছাড়া অভাবগ্রস্ত বাবা ইতিমধ্যেই দু'বার ধার করেছেন সীতেশের কাছ থেকে। আরো নিশ্চয়ই করবেন। নিয়মিতভাবে এই চল্লিশ টাকা হাতে পেলে কখনোই তা মেয়ের লেখাপড়ার খাতে খরচ করতেন না। এটা থেকে অন্তত তার পথ-খরচা সে রেখে দিতে পারবে, কেননা পথ-খরচা না পেলে টিউশনিতে আসা যায় না। টিউটোরিয়েলেও মাইনে আছে দশ টাকা করে। সেটাও সীতেশদার পকেট থেকেই যাবে। তার মানে প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ টাকা করে—

'এই যে এসো আলাপ করিয়ে দি—'

চকিত হয়ে ফিরে তাকালো অঞ্জলি, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো সে।

সীতেশ বললো, 'আমার বোন অঞ্জলি, অনেক শুনেছ তুমি আমার মুখে, আব সুদর্শন, আমার বন্ধু—এর কথাও তুমি জানো।'

সুদর্শন হাত তুলে নমস্কার করলো, প্রতিনমস্কারের নিয়মটা ভুলে গিয়ে অঞ্জলি থতমত খেয়ে তাকালো একবার।

মৃদু হেসে সুদর্শন বললো, 'বাইরে দাঁড়িয়ে কেন চলুন।'

সীতেশ হেসে বললো, 'চলবে কী? বাঙালকে যে হাইকোর্ট দেখাতে হবে, গাড়ি বার করো।'

'গাড়ি ?'

আমার সুধাগঞ্জের ভগ্নিটি এখনো কলকাতার সুধা পান করেনি। ভাবতো পারো কলকাতার টালিগঞ্জ ছাড়া বেচারা এতো মাসের মধ্যে আর কিছু দেখেনি?'

'তা হলে প্রদর্শনকারীর সম্মানটা আজ আমাকেই গ্রহণ করতে হচ্ছে?'

'ঠিক তাই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল, গঙ্গার ধার, ইডেন গার্ডেন, কিছু বাদ দিয়ো না।'

'কক্ষনো না। দাঁড়াও।'

হুস করে এসে গেল গাড়ি, ট্যাক্‌সিকে বিদায় দিল সীতেশ। অঞ্জলি পিছনে বসতে যাচ্ছিলো। সুদর্শন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সামনের দরজা মেলে ধরলো, 'আমরা সবাই সামনে এঁটে যাবো। আপনি উঠুন এখানে।'

উঠলো অঞ্জলি। তারপর সীতেশ। ওপাশে চালকের আসনে সুদর্শন। দুজনের মাঝখানে বসে অঞ্জলির বুকটা ধুকধুক করছিলো। তার এতোদিনের জীবনের সঙ্গে এই মুহূর্তে এরকম একটি অনাত্মীয় যুবকের পাশে বসে গাড়ি চড়ে বেড়ানো অস্তিত্বটাকে সে ঠিক মেলাতে পারছিলো না।

।। ১১ ।।

ঘড়ি ধরে অনেক ঘোরা হলো। অঞ্জলি গড়ের মাঠ দেখে অবাক হলো, চৌরঙ্গি পাড়ার ঝলমলে চেহারা দেখে বিস্ফারিত চোখে তাকালো, ইডেন উদ্যান দেখে ইন্দ্রপুরীর কল্পনা, আর গঙ্গার দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে বললো, 'কী আশ্চর্য।'

ফেরার পথে বাড়ির দরজায় না নামিয়ে সীতেশের নির্দেশ মতো গলির মুখে নামিয়ে দিল সুদর্শন, গ্যাসপোস্টের ঝাপসা আলোয় অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে থেকে সহাস্যে বললো, 'আজকের সন্ধ্যা অতুলনীয়। সারথিটিকে যদি নিতান্তই অপছন্দ না হয়, এমন সন্ধ্যা আমি প্রতিদিন ফিরিয়ে আনতে রাজি আছি।'

একটু এগিয়ে গিয়েছিলো সীতেশ, ডেকে বললো, 'এসো অঞ্জু সাবধানে, কে যেন এখানটায় ডাস্টবিন গড়িয়ে রেখে গেছে।'

বাড়ি ঢুকে দেখা গেল, মনোরমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে শ্যামবাজার গিয়েছেন তাঁর মায়ের কাছে আর বাবা একা একা বসে পেশেন্স খেলছেন। তাকে আর সীতেশকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'তাহলে পড়িয়ে এলো? অ্যাঁ? তাস গুটোলেন তিনি।

অঞ্জলি একটু হেসে ঢুকে গেল ভিতরে, সীতেশ তক্তপোশে বসে পড়ে বললো, হ্যাঁ পিসেমশাই, খুব ভালো হলো আজ। পড়া আর পড়ানো আশা করি দুটোই পারবে।

'দ্যাখো। তবে কষ্ট হবে খুব। বাড়িতে কাজও তো কম নয়। তুমি সাহায্য করবে এটাই ভরসা।'

'আপনি কিছু ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে দেব।'

ঠিক সত্যিই করে দিল। পরের দিন থেকে টিউশনির নাম করে পাঁচটা থেকে সাড়ে-সাতটা পর্যন্ত নিয়মিত পড়া চলতে লাগলো অঞ্জলির। তারই ফাঁকে কোনো কোনোদিন একটু আগে বেরিয়ে সীতেশদার সঙ্গে দেখাশুনো, সামান্য ঘুরে বেড়ানো। এবং মাঝে মাঝে সুদর্শনকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া। জীবনের গতি লঘু হয়ে এলো, বিমাতার সংসারের তাপিত বায়ু আর তেমন জ্বলন্ত বোধ হলো না। তাছাড়া মাসের শেষে চল্লিশ টাকা উপার্জন, সেটা তাকে অনেকখানি সম্মান দিল, ব্যক্তিত্ব দিল, কোথায় যেন স্তিমিত করে দিল মনোরমার বিক্রম। সেই সময়ের পক্ষে চল্লিশ টাকা যথেষ্ট টাকা, সেই আয়টা বেশ ভারি ওজনেই দেখা যাচ্ছিলো চোখে।

হাওয়া বোধ হয় সব দিক থেকেই অনুকূল ছিলো, বেশ ভালোভাবেই এগুচ্ছিলো পড়াশুনো। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তার মধ্যেই মিশিয়ে দিয়েছিলো অঞ্জলি। সীতেশদাকে সে তার সাফল্য দিয়েই সম্মান জানাতে চেয়েছিলো। সেই সময় প্রাইভেট ছাত্রীদের টেস্ট দিতে হতো না, সোজাসুজি বসে যেতে পারতো পরীক্ষায়। ন'মাসের মাথায় সে-ও তাই বসে গেল।

এ পর্যন্ত বেশ নির্বিঘ্নেই কেটেছিলো, কিন্তু গোলযোগ ঘটলো ফল বেরোবার পরে। লাফাতে লাফাতে সীতেশই খবর নিয়ে এসেছিলো, 'ফার্স্ট ডিভিশন, ফার্স্ট ডিভিসন।' চেঁচিয়ে সে বাড়ি মাথায় করেছিলো। সেই যে মনোরমার মুখ আবার কঠিন হয়ে উঠলো, ভদ্রতার দায়েও একবার এক ফোঁটা হাসি ফুটলো না সেখানে।

চুপে চুপে সীতেশ বললো, 'ব্যাপার কী? আবার কী হলো? রাগারাগি হয়েছে?'

অঞ্জলি বললো, 'না।'

'তবে?'

'আমি জানি না।' এটা অঞ্জলি মুখে বললো, কিন্তু মনের মধ্যে সে আরো অনেকবারের মতো অনুভব করলো, এর নাম ঈর্ষা। যে রিপুর প্রেরণায় মনোরমা নিজেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান। তিনি তার ক্লাস থেকে ক্লাসে ওঠার খবরেও প্রত্যেক বছর বিচলিত হয়েছেন। তিনি চেয়েছেন অঞ্জলি ক্রমাগত ফেল করুক, সবাই দেখুক অশিক্ষিত মা হলে তার সন্তান কী রকম মূর্খ হয়। অঞ্জলি ক্রমাগত এ বিষয়ে তাঁকে হতাশ করে গেছে। কলকাতা এসে ঐ জন্যই তিনি তাকে আর পড়তে দিতে চাননি। বুঝেছিলেন, নিরুপমা না হলেও নিরুপমার মেয়ে হয়তো একদিন তাঁর প্রতিযোগী হয়ে উঠবে। তিনি নিজে যে কখনো বি ও পাস করেছিলেন, বি টি পাস কবেছিলেন, বাবার কাছে, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের কাছে এ নিয়ে তাঁর একটা অপ্রতিহত গর্ব ছিলো। শেষে নিরুপমার

মেয়ে তার সেই অনন্য গৌরবের অংশীদার হবে এ চিন্তা তাঁর পক্ষে অসহ্য।

তিনি ভেবেছিলেন, ইস্কুলে যাই করে থাক, এ অবস্থায় অন্তত ম্যাট্রিক সে কোনোরকমেই পাস করতে পারবে না। তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তার মধ্যে পড়াশুনোর অবস্থায় দেখেননি অঞ্জলিকে। এতগুলো সমানবয়সী শিশুর কলরোলের মধ্যে তাদের ঝক্কি সামলে প্রতিটি কাজ নিজের হাতে করে, ফুটফরমাশ খাটতে খাটতে ওর পরীক্ষা তো দূরের কথা, একটা বই হাতে নেবার সময়ও তো তিনি দেখেননি। আর সারা বিকেল তো টিউশনি। ফিরে এসেই আবার খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা। বসতো যা একটু রাত্তিরে। কিন্তু রাত্তিরেও তো তিনি স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে দশটা বাজতেই আলো নিবিয়ে দিয়েছেন। তবে?

দেখতে তাই বটে, কিন্তু পড়াশুনো অঞ্জলি ভালোই করেছিলো। ভোর পাঁচটায় উঠে হেঁটে হেঁটে পড়া মুখস্ত করা তার আবাল্যের অভ্যেস। পরীক্ষার আগে সেটাকে চারটে করে ফেলেছিলো। চারটে থেকে সাতটা, তিন ঘণ্টা নিশ্ছিদ্র মনোযোগের সঙ্গে সে পড়তে পেরেছে। এবং ন'মাসের মধ্যে একদিনও তা বাদ যায়নি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্যান্য অবসরেও বই হাতে নিতে পারেনি তা নয়। আর তারপর টিউশনির নামে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা পাক্কা আড়াই ঘণ্টা কোচিং ক্লাস। এ সবই সে সম্পন্ন করেছে মনোরমার অগোচরে। সুতরাং মনোরমা যেটাকে অসাধ্য সাধন ভাবছেন, আদতে সেটা যে সাধনারই ফল তা তিনি কেমন করে জানবেন? তাই তাঁর ক্রোধ এবং ঈর্ষা একই সঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠলো।

বাবা সেদিন অনাবিলভাবে খুশি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মুখে আর হাসি ধরছিলো না। তিনি কাপড়ের খুঁট গায়ে দিয়ে নিজেই গিয়ে পাশের দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে এলেন, সনিশ্বাসে বললেন, 'এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি সীতেশ, শুধু তোমার জন্যই আজ ওর এই কৃতকার্যতা। যদি নিরু বেঁচে থাকতো—'

অঞ্জলি লক্ষ্য করতো যে তার বাবা বেশ কিছুদিন যাবৎই তার প্রতি বেশির ভাগ সময়টাই সদয় থাকতেন। অনেক সময় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন তাকে। অঞ্জলির মনে হতো তিনি তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সাদৃশ্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন তার মধ্যে। বাবার সব দোষ ভুলে তখন তার ভীষণ মমতা হতো। বাবা যে তার মাকে ভুলে যাননি, একথা ভেবে বুক ভরে যেতো তৃপ্তিতে।

সীতেশের সঙ্গে তিনি মেয়েকে কলেজে পড়ানো নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন, ভুলে গেলেন ম্যাট্রিক পাস করেই তার চাকরি নেবার কথা ছিলো।

কিন্তু গম্ভীর মুখে মনোরমা মনে করিয়ে দিলেন সে কথা। বাঁকাভাবে বললেন, 'কতো তো শুনেছিলাম, এখন সেসব কি ভোজবাজির মতো উড়ে গেল নাকি?'

সীতেশের রাগ নেই, সে সদা হাস্যময় পুরুষ, তার সরলতা তুলনাহীন। মুখেও কথা জোগায় তৎক্ষণাৎ। বললো, 'আপনি আমার ওখানে কাজের কথা বলছেন তো? হ্যাঁ, সে তো সব সময়ই আছে।'

'তবে আবার কলেজে ভর্তি হবার কথা উঠছে কিসে? আমরা গরিব মানুষ, ওসব ঘোড়ারোগ

ামাদের পোষায় না। কলেজে ভর্তি হওয়া ওর হবে না এ আমি সাফ বলে দিচ্ছি। যদি তোমার থার কোনো মূল্য থেকে থাকে তা হলে দয়া করে সেই চাকরিটাতে ঢুকিয়ে দিলেই কৃতার্থ হবো।'

'শুনুন পিসিমা, আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।' সীতেশদার চিরাচরিত সহিষ্ণু গলা, 'ঐ াকরির মাইনে পঞ্চান্ন টাকা, কিন্তু বেলা ন'টা থেকে ছ'টা অব্দি আটকে রাখবে। যদি এই চল্লিশ াকার টিউশনিটা না পেতো আমি নিশ্চয়ই সেখানে ঢুকিয়ে দিতাম। আপনিই ভেবে দেখুন, এই তা আপনার শরীর, আপনি কি একা সামলে উঠতে পারবেন সব? টুকু বড়ো হয়ে উঠেছে, ওকে নিয়মিত পড়ানো দরকার, সংসারেও কাজ আছে অনেক, অঞ্জু বাড়ির বড়ো মেয়ে, মাত্র পনেরোটা াকা বেশি পাবার জন্য সারাদিন যদি আপিসে গিয়ে পড়ে থাকে, তা অসুবিধে হয় না? তার চেয়ে রং আমি আর একটা টিউশনি জোগাড় করে দেব, অনেক বেশি টাকাও পাবে, বাড়ি থাকারও ময় পাবে। এবার আপনি নিজে ভেবে দেখুন কী করবেন।'

ভারি মুখে চুপ করে রইলেন মনোরমা। তারপরে বললেন, 'কিন্তু কলেজে গেলে কী করে ময় পাবে বাড়ি থাকার?'

'না পেলে যাবে না কলেজে।'

'বাপ তো ভাবছে মেয়ে যেন কী বিদ্যাধরী হয়েছে, কলেজ গেলেই একেবারে দিক্‌বিজয় করে ফেলবে। কিন্তু আমি বলছি আর একটি পয়সাও আমি দিতে পারবো না, সে তোমার কলেজেই ড়ুক আর যাই করুক।'

পয়সা অবিশ্যি তিনি দিচ্ছিলেন না একটাও। সীতেশ যা দিচ্ছিলো তাতে তার পড়াশুনো কেন, াল ডাল ভাত তেল নুনের খরচ উঠেও বেঁচে যাচ্ছিলো কিছু। দিনকাল অন্যরকম ছিলো, চালের ণ চার টাকা ছিলো, আর ডাল তেল নুন নগণ্য।

আসলে কী ভাবে যে তিনি কলেজে পড়া থেকে বিরত করবেন সেটা ভেবে পাচ্ছিলেন না। ার এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তাঁর প্রতিদিন ঝগড়া চলছিলো। শুধু এই নিয়েই নয়, এটাকে প্রচ্ছন্ন রেখেও তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে খেপে যেতেন তিনি। সীতেশদা ভয়ে ভয়ে প্রায় আসাই ছেড়ে দিল। কিন্তু সেই পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটার টিউশনিটা ছিলো মুক্তির মস্ত বড়ো সহায়। ঠিক সময়ে বেরিয়ে আসতে পারতো সে, দেখা হতো সীতেশদার সঙ্গে। মাঝে মাঝে বইয়ের দোকানে যেতো, কফি হাউসে যেতো, আর সুদর্শন সঙ্গী হলে জোর করে নিয়ে যেতো রেস্তোরাঁয়, বিদায় নেবার ময় চোখের গভীরে ডুবিয়ে দিত চোখ, বুকের ভিতরটা দুরদুর করে উঠতো।

।। ১২ ।।

সীতেশের কাছ থেকে ওভাবে টাকাটা নিতে কিন্তু খুব খারাপ লাগছিলো অঞ্জলির। সে জানত তার মামাবাড়ির অবস্থা ভালো নয়, মামা হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মরণাপন্ন হয়েছিলেন, তারপর থেকে তিনি আর কাজের যোগ্য নেই। অকালে অবসর নিতে হয়েছে। অসুখ করবার ঠিক আগেই জ কিনে ছোটো একটি বাড়ি তৈরি শুরু করেছিলেন, সেটা সমাপ্ত করবার ভার এখন সীতেশদা উপরেই। বলতে গেলে সব ভারই বলা যায়, ওটা শুধু বোঝার উপর শাকের আঁটি।

নইলে অমন ঝকঝকে সীতেশদা, অত ভালো ছাত্র, মামা কত আশা করেছিলেন যেমন ক হোক বিলেত পাঠাবেন ছেলেকে, সে যতদূর পড়তে চায় পড়বে, কখনও তাকে সংসারে দায়দায়িত্ব চাপিয়ে ভারাক্রান্ত করবেন না। মানুষ ভাবে একরকম, হয় অন্যরকম। সব স্বপ্ন ধূলিস করে চাকরি নিতে হলো তাড়াতাড়ি।

অবশ্য চাকরিটা খুব ভালো, রীতিমতো উঁচু মাইনের চাকরি। কিন্তু বেশির ভাগটাই পাঠি দিতে হতো মা-বাবার কাছে। মামী গুছিয়ে সংসার করে বাঁচিয়ে বাড়িটা কোনোরকমে শেষ করব চেষ্টা করতেন।

অঞ্জলি বলেছিলো, 'ওঁদের আসতে বলো না সীতেশদা। বাঙালি হয়ে বাংলার বাইরে থাকবে সেখানেই বাড়ি বানাবেন, এ কেমন কথা?'

সীতেশ বলেছিলো, 'ওঁদের আসতে বলবো কী, আমি নিজেই তো সব সময়ে পালাই পালা কলকাতার জীবন আমারও রক্তে প্রবেশ করেনি। বাড়ি বলতে আমিও বম্বেই বুঝি। আর মা-বাব জীবন তো এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে।'

'তা হলে তুমি একটা মারাঠী মেয়ে বিয়ে করে নিয়ো। অন্তত একজনের তো সর্বতোভা সেটাই দেশ হবে?'

'তাই ভাবছি।' হেসেছে সীতেশ, 'আগে তোমার একটা বিয়ে দিয়ে নি, তারপর নিজেরটা ভ যাবে।'

'জগতের সব ভার একা তুমি বহন করবে, এই বুঝি তোমার জীবনের মটো?'

'ছেলেবেলা থেকে আমার দিদি সব সময়েই আমার উপর সর্দারি করেছে, কিন্তু এমন দুর্ভাগ আমার মা-বাবা আর কোনো সন্তানের জন্ম দিয়ে আমাকে দাদা হয়ে সর্দারি করার সুযোগ দিলে না, দিলেন ভগবান। তোমাকে পেয়ে গেলাম। আর কি আমি সে সুযোগ ছাড়ি? আমি তোমা লেখাপড়া করাবো, বকবো, ভালোবাসবো, বিয়ে দেব — সব, সব করবো আমি।'

'সীতেশদা—'

'জানো অঞ্জু, তুমি আর সুদর্শন আমার যতো বন্ধু, এমন আর কেউ না। কলকাতায় আমি বম্বে

চেয়ে অনেক কম আন্তরিকতা পেয়েছি। লোকেরা বলে বেশি, করে কম। আমরা প্রবাসী বাঙালিরা আসল বাঙালির স্বরূপ যেন ঠিক চিনতে পারি না।'

চুপ করে থেকে অঞ্জলি তার বলবার কথাটা উচ্চারণ করেছে এবার, 'সীতেশদা, তুমি আমাকে এই টাকাটা আর দিয়ো না।'

'কোন টাকাটা।'

'প্রত্যেক মাসে এরকম করে এতগুলো টাকা জলে ফেলার মতো অবস্থা তোমার নয়।'

'ও! সৎপরামর্শ দিচ্ছ?'

'ঠাট্টার কিছু নয়।'

'তোমার উপর আমার কর্তব্য আছে।'

'আমার উপর তোমার আসল কর্তব্য এখন, সত্যি সত্যি একটা টিউশনি জোগাড় করে দেওয়া।'

'সময় কিছু পেরিয়ে যাচ্ছে না, আগে ভরতি হও, তারপর অন্য কথা।'

'তুমি তো জানো, আর আমাকে পড়তে দেওয়া হবে না।'

'পাগল।'

'মানে?'

'না পড়লে চলবে কেন? নিজের পাঁয়ে দাঁড়াতে হবে না?'

'কিন্তু আমার বিমাতা এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ —'

'তোমার বাবা আছেন।'

'বাবার সাধ্যি কোথায়? আর্থিক পরমার্থিক কোনো বিষয়েই জোর নেই তাঁর।'

'তা হলে তো সত্যিই একটা টিউশনি যোগাড় করে দিতে হয়।'

'সেই তো।'

'ঠিক আছে তাই দেব। ধর, এই চল্লিশ, তার সঙ্গে আর কুড়ি মিশোলেই হয়ে যাবে।'

'মানে?'

'মানে, ভরতি তোমাকে হতেই হবে, চল এখুনি তোমাকে মাস্টারমশায়ের কাছে নিয়ে যাই।'

'না, আমি যাবো না। আমি আর তোমার হাত থেকে টাকা নিয়ে বাবার সংসার পুষ্ট করবো না। না। কেন করবো?'

'কেন নয়? এই টাকাটা হাতে পেলেই দেখো তোমার বাবার স্ত্রী আর টুঁ শব্দ করবেন না।'

'আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দাও সীতেশদা। যে কোনো রকম চাকরি। একটা টিউশনি ঠিক করে দাও।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, কী বলছো বুঝে নিতে দাও। একবার বলেছো চাকবি দাও, আবার বলছো টিউশনি দাও। কোনটা আগে দেব বলো তো? আমার থলিতে তো সবই মজুত আছে।'

অঞ্জলি হেসে বললো 'খালি ইয়ার্কি।'

'এখন বলো দেখি, মাস্টারমশায়ের ওখানে কবে যাবো?'

'তোমাকে তো বললাম।'

'কী বললে?'

'ওভাবে টাকা নিয়ে—'

'পিসিগিরি কোরো না।' সীতেশ ধমক দিল, 'চলো, বাস আসছে, এখুনি নিয়ে যাই তোমাকে।'

'মাস্টারমশায়ের বাড়ি?'

'হ্যাঁ। আজ মঙ্গলবার, আজ উনি টিউটোরিয়েলে যান না।'

ডক্টর সরকার ঠিকই বাড়িতে ছিলেন। কাজ করছিলেন বসে। দরজা খুলে দিয়ে খুশি হয়ে উঠলেন।

প্রথম পরিচয়ের পরে আরো দু'চার দিন অঞ্জলির সঙ্গে দেখা হয়েছে বটে, কিন্তু ভয়ে সম্ভ্রমে সব সয়েই অঞ্জলি সংকুচিত হয়ে থেকেছে।

'এসো, এসো—' অভ্যর্থনায় তিনি মুখর হলেন। ঘরে এনে বসিয়ে আবার তাঁর দৃষ্টি ঠিক প্রথম দিনের মতো একাগ্র হলো অঞ্জলির মুখে।

সীতেশ বললো, 'আমার বোনের অবস্থা আপনি জানেন, পড়াশুনোয় এতো ভালো মেয়ে, ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করলো, কিন্তু ওঁরা ওকে কিছুতেই পড়তে দেবেন না।'

'কেন?'

'বলছেন, কলেজে পড়াবার মতো ক্ষমতা নেই।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'নির্দিষ্টভাবে কিছুই ভেবে আসি নি। শুধু পরামর্শ নিতে এসেছি, কিছু করা যায় কি না।'

'পরামর্শ?'

'পরামর্শ, সাহায্য, সব কিছুর জন্যই তো আপনি আমার গুরু।'

'কী ধরনের সাহায্য বলো তো?'

'টাকা-পয়সার কথাটাই ভাবছি বেশি করে। কোনো স্টাইপেন্ড জোগাড় করা যায় কি?'

'যেতে পারে।'

'তা হলে খুব ভালো হয়।'

'তুমি কী বলো?' ডক্টর সরকার অঞ্জলির দিকে তাকালেন।

অঞ্জলি চোখ নিচু করে বললো, 'তা হলে আমি বোধ হয় আমার বাবাকে বলে-কয়ে রাজি করাতে পারবো।'

'ঠিক আছে, তাই হবে। এসো এবার তোমাদের আমি একটু চা খাওয়াই।' ঘরের এক কোণে গিয়ে তিনি ইলেকট্রিক কেটলির প্লাগ লাগিয়ে দিলেন। অঞ্জলি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, এরকমভাবে জল ফুটতে আগে কখনো সে দেখেনি।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে গুছোনো একখানা ঘর, চারদিকে বইয়ের র‍্যাক। মাঝখানে বেতের হালকা হালকা চেয়ারে টেবিলে বসবার ও লেখাপড়া করবার ব্যবস্থা। পাশে আরও একখানা ছোট ঘর আছে, সেটা তাঁর শোবার ঘর। এ ছাড়া একফালি রান্নার জায়গাও আছে। ফ্ল্যাট এইটুকুই, কিন্তু

ফ্ল্যাটটির আসল আকর্ষণ তার ছাদ। প্রকাণ্ড ছাদ। সারা বাড়ি জুড়ে ছাদের উপরে তিন তলায় এই ছোট ফ্ল্যাটটিতে তিনি প্রায় সতেরো বছব বাস করছেন। বললেন, 'বালিগঞ্জ তখন কী ছিলো? আর ফার্ন রোডের এই ফ্ল্যাট? এ তো পুরো জলাজঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নয়। ওই যে দেখছো পাঁচতলা বাড়ি উঠেছে, ওটা প্রকাণ্ড একটা পুকুর ছিলো। আসলে এটা যাঁর বাড়ি, এই ছাদের ঘরটা ছিলো তাঁর চিলকোঠা। শেষে আর একটা ঘর তুলে, ভাড়া দিয়ে দিলো।'

ট্রের উপর সাজিয়ে চা করে আনলেন তিনি। অঞ্জলি উঠে সাহায্য করতে গিয়েছিলো, 'সাহায্য যদি করতেই চাও, তা হলে সোজা চলে যাও শোবার ঘরে, আলমারি খোলা আছে, বিস্কুটেব টিন আছে নিয়ে এসো, রান্নাঘর থেকে প্লেটও নিয়ে এসো একটা।'

চা-বিস্কুটের পার্টিটা বেশ জমলো তারপর। অঞ্জলি ভয় কাটিয়ে অনেকটা স্বচ্ছন্দ হলো।

মাস্টারমশায় বললেন, 'শোনো, তোমার বাবাকে বোলো, তোমার পড়াশুনোর সম্পূর্ণ খবচ তুমি কলেজ ফান্ড থেকে পাবে। মায় যাতায়াত খরচ সুদ্ধু।'

'সত্যি?' আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো অঞ্জলি।

শান্তভাবে হেসে, মাস্টারমশায় বললেন, 'সত্যি।'

পথে বেরিয়ে সীতেশ বললো, 'তা হলে হয়ে গেল সব?'

অঞ্জলি আবেগভরা গলায় বললো, 'সত্যি, তোমার মাস্টারমশায়ের কোনো তুলনা নেই।'

'এখন তোমারও মাস্টারমশাই।'

'আশা করি আমার অভিভাবকেরা আর আপত্তি করবার কোনো কারণ পাবেন না।'

'আশা করি।'

'কিন্তু আমার টিউশনির কথা তা বলে ভুলো না।'

হাঁটতে হাঁটতে ট্রামলাইনে এসে দাঁড়িয়েছিলো, হঠাৎ সীতেশ বললো, 'সুদর্শনকে তোমাব কেমন লাগে?'

অঞ্জলি চমকে গেল। থতমতো খেয়ে গিয়ে বললো, 'কেমন আবার।'

'বেশ তো কিছুদিন যাবৎ দেখছো।'

'কতোটুকু আর।'

'যা বোঝাবার ওইটুকুতেই বোঝা যায়।'

'আমি কাল মামাকে একটা চিঠি লিখেছি।' প্রসঙ্গটা বদলাতে চাইলো অঞ্জলি।

সীতেশ বললো, 'শুনলাম, সুদর্শন একটা ভালো চাকরি পেয়েছে।'

'কোথায়?'

'লন্ডনে।'

'লন্ডনে!'

'হ্যাঁ।'

'সে তো অনেক দূর।'

'খুব দূর। এক বছরের জন্য। তারপর ফিরে আসবে।'

'ও।'

'কিন্তু আমি অন্যরকম ভাবছিলাম।'

'কী?'

'চলো না, আজ একবার সুদর্শনের ওখানে যাই।'

'ওঁর বাড়িতে ?'

'দোষ কী?'

'কখনো যাই নি—'

'অনেক দিন দেখা হয় না, চলো না।'

'গেলেই কি পাবে?'

'পেতেও পারি।'

'না-ও পেতে পারো।'

'চেষ্টা করা যাক।'

'চাকরির খবর কে দিল?'

'আর একটি ছেলে, আমাদের দু'জনেরই বন্ধু সে। শুনে থেকে খুশিও হয়েছি, আবার খারাপও লাগছে চলে যাবে ভেবে।'

'খবরটা যদি সত্যি হতো উনি কি নিজেই দিতেন না?'

'কী করে দেবে। আমি মেসে থাকি কতোটুকু সময়? আমাকে ধরবে কোথায়? ভেবে দ্যাখো, আপিসে যাই ন'টার সময়ে। ফিরি একেবারে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। সত্যি বলতে আমি যদি ওকে খোঁজ না করি, আমাকে ধরার ওর কোনো উপায় নেই। ও আমার চেয়ে অনেক বেশি বাড়িতে থাকে, এমনও বলেছে, অনেক সময় আশা করে বসে থাকে যাবো ভেবে। ট্রাম আসছে, চলো না যাই। অনেক সময় আছে হাতে।' বলেই একটা ট্যাকসি দেখতে পেয়ে থামিয়ে দিল।

'আবার ট্যাকসি কেন?' আপত্তি করলো অঞ্জলি। উঠে বসতে বসতে সীতেশ হাসলো, 'কেন ট্রামের চেয়ে ট্যাকসি ভালো না?'

ভালো নিশ্চয়ই, কেননা চোখের পলকে নিয়ে এলো এলগিন রোডে। অনেক সময় বাঁচলো এবং ঠিক বেরুবার মুখে ধরা গেল সুদর্শনকে।

'আরে, তোমরা?' গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে নেমে এলো সে। সীতেশও নামলো অঞ্জলিকে নিয়ে। 'তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে এলুম।'

'কিসের বোঝাপড়া?'

'সম্পর্কটা রাখতে চাও কি চাও না।'

'বাঃ, বেশ উলটো চাপ দিচ্ছ তো। তোমরা ভাইবোনে রোজ বিকেলে কোথায় হাওয়া খেতে বেরোও, আমাকে কি বলেছ কখনো? জোরজার করে ছুটে যাই, তাই কখনো-সখনো বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে।' অঞ্জলির দিকে তাকালো, 'বলুন, সত্যি নয়?'

সে কথার জবাব না দিয়ে অঞ্জলি বললো, 'সমুদ্রযাত্রার তারিখটা কবে?'

'সমুদ্রযাত্রা?'

'শুনেছি সব। কিন্তু সীতেশদা এতো বেশি বন্ধুবৎসল যে অভিমানও করতে পাবে না। অন্যের খে বার্তা পেয়েই ছুটে এসেছে কাঁদতে কাঁদতে।'

'তা হলে বার্তাটা পৌঁছেছে কানে?' সহাস্যে সীতেশের পিঠে হাত রাখলো সুদর্শন, 'আমি কিন্তু খন তোমাদের সন্ধানেই বেরুচ্ছিলাম।'

'কৃতার্থ হলুম।'

'চলো ভিতরে যাই।'

'তার চেয়ে চলো, এক জায়গায় পৌঁছে দেবে?'

'কোথায়?' অঞ্জলি ভুরু কুঁচকালো। সীতেশ বললো, 'তোমাকে নয়, আমাকে। আমার যেতে বে এক জায়গায়। খুব জরুরী দরকার।'

'বলোনি তো।'

'বললে কী হতো? আসতে না?'

'আমি বাড়ি চলে যেতাম।'

'সন্ধের অন্ধকারে বাড়ি ফিরে কী করতে বসে বসে?

'আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার চেয়ে তা-ও ভালো, কী বলেন? সুদর্শন দরজা খুলে ধরলো; 'তবু খন দয়া করে অথবা দায়ে পড়ে এসেই পড়েছেন, চলুন পারাপারের কাজটা সেরেই আসি।'

।। ১৩ ।।

সীতেশ পার্ক সার্কাসে এলো, বললো, 'তুমি অঞ্জলিকে পৌঁছে দিয়ে এসো সুদর্শন, আমার দেরি হবে এখানে।' আর সঙ্গে সঙ্গেই অঞ্জলির মনে হলো এটা সীতেশদার পরিকল্পিত ব্যবস্থা। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলো সে। আর সুদর্শন, উৎসাহে টগবগ করতে করতে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

'গঙ্গার ধারে যাবেন?'

অঞ্জলি বললো, 'না।'

'কেন?'

'আমার একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে বাইরে থাকবার।'

'জানি, সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। এখন সাতটা বাজতে পাঁচ। আরো তিরিশ মিনিট আপনার বাস- যাবার জন্য গুনতিতে থাকা উচিত, তার মানে এই মুহূর্তে আপনি পুরো পঞ্চাশ মিনিটের অধিকারী। পঞ্চাশ মিনিটে কী না হতে পারে, একটা যুদ্ধ জয় করা যায়। আর আপনি সেই সময়টা টালিগঞ্জের কোটরে বৃথা বয়ে যেতে দেবেন?' গাড়ির গতি বাড়িয়ে সোজা সে ময়দানের দিকে চলে এলো।

অঞ্জলি বললো, 'সার্থক করার উপায় যখন জানা নেই তখন আর করা কী?'

'বুদ্ধিমান মানুষের পরামর্শ নিন।'

'কে সে?'

'এই তো, আপনার পাশেই বশংবদের মতো বসে গাড়ি চালাচ্ছে, হুকুম করুন না, দেখুন না কেমন আকাশ-পাতাল এক করে দি।'

'ভালো খবর। কিন্তু সেটা আজ জমা থাক।'

'আমি জমার অঙ্কে বিশ্বাস করি না, সুযোগ কি আর মানুষকে প্রত্যেক দিন ধরা দেয়?'

'সুযোগের কী আছে?'

'আপনার সঙ্গে আমার কদ্দিন বাদে দেখা হলো, বলুন তো?'

'কদ্দিন?'

'আঠারো দিন।'

'হবে।'

'খুব নির্লিপ্ত মনে হচ্ছে?'

'কবে যাচ্ছেন?'

'কোথায়?'

'আরও অনেক বেশি নির্লিপ্ত হয়ে, অনেক দূরে?'

'বলুন তো যাবো নাকি?'

'বলার উপর কি নির্ভর করছে কিছু?'

'করছে না? বলেন কী?'

'শুনে সুখী হলুম।'

'কলেজে ভরতি হয়ে গেছেন?'

'হবো।'

'বাড়ির গোলমাল মিটে গেছে?'

'মোটামুটি।'

'আমার কী মুশকিল।'

'কেন?'

'যদি সীতেশ না দয়া করে, আমি কিছুতেই আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি না। এর মধ্যে দু'দিন আমি ওর মেসে গিয়ে ফিরে এসেছি।'

'আপনি তো ক'দিন ছিলেন না কলকাতায়।'

'চাকরির চেষ্টা করতে গিয়েছিলাম।'

'চাকরির চেষ্টা?'

'এবং সে চেষ্টা কেন, তা সীতেশ জানে।'

'ও।'

'সীতেশের সঙ্গে আমার অন্য একটা জরুরি দরকার ছিলো।'

'সে কথা ওকে বললেন না কেন?'

'আপনাকে কি সীতেশ কিছু বলেছে?'

'কী বিষয়ে?'

'আমার বাবার সঙ্গে যে আমার বিয়ে নিয়ে একটা মতান্তর চলেছে?'

চকিত হয়ে ফিরে তাকালো অঞ্জলি, তারপরই আবার শান্ত গলায় বললো, 'তাই নাকি?'

'তাঁর ইচ্ছে, আমি তাঁর বন্ধুকন্যাকে বিয়ে করি।'

দু'বার ময়দান চক্কর দিল সুদর্শন, 'নামবেন একটু?'

'না।'

'কোনো রেস্তোঁরায় যাবেন?'

'না।'

'আপনার সঙ্গে আমার প্রথম কবে দেখা হয়েছিলো, সে তারিখটা মনে আছে?

'না।'

'না না বলতে আপনার বোধ হয় কখনও ক্লান্তি বোধ হয় না, না?'

হেসে ফেলে অঞ্জলি বললো, 'না।'

মুখ ঘুরিয়ে পাশে তাকালো সুদর্শন, 'আপনার সঙ্গে আমার প্রায় একবছর হতে চললো আলাপ হয়েছে, আপনি কিন্তু সেটাকে গণ্য করছেন না, যতদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে আপনি সযত্নে নিজেকে দূরের মানুষ করে রেখেছে । কেন?'

'সারথ্য বিদ্যায় আপনার যতো দখলই থাক, সামনে না তাকিয়ে চালানো কিন্তু বেআইনি।'

'একটা কথা রাখবেন?'

'কী?'

'কয়েক মিনিটের জন্য আমাদের বাড়িতে আসবেন?'

'আজকে?'

'আজই, এক্ষুনি।'

'মনে হচ্ছে আপনি একটু উত্তেজিত আছেন—'

'খুব, খুব। ক'দিন যাবৎই আমি অত্যন্ত উত্তেজিত, বিরক্ত, বললাম তো বাড়িতে বাবার সঙ্গে আমার ভীষণ অশান্তি চলেছে!'

'এ অবস্থায় আমার তো না যাওয়াই ভালো।'

'যদি না যান, সারা জীবনেও আর আমি আপনার সঙ্গে কথা বলবো না।'

'এটা কিন্তু অবুঝের মতো ব্যবহার হলো।'

'আপনার মতো বিজ্ঞ আমি নই, স্বীকার করছি, কিন্তু একবার চলুন।'

'চলুন।' অগত্যা রাজি হলো অঞ্জলি, কিন্তু তার সংকোচ হচ্ছিলো, ভয় হচ্ছিলো, লজ্জা করছিলো। বুঝতে পারছিলো না সুদর্শন আজ এমন ছেলেমানুষি করছে কেন।

॥ ১৪ ॥

সুদর্শনের সঙ্গে একা হওয়া এই প্রথম অঞ্জলির। এর আগে যতোবার দেখা হয়েছে, সব সময়ে তারা তিনজন একসঙ্গে থেকেছে। এবং আলাপ প্রায় এক বছরের পুরনো হলেও খুব যে ঘন ঘন দেখা হয়েছে তা নয়। প্রথম দিকে তো নয়ই, মাঝখানে অবশ্য একটু বেশি, আবার ইদানীং পরীক্ষা, পড়া ইত্যাদির তাড়নায় কম।

কিন্তু খুব কি কম? তবু কি কিছু বোঝা যায়নি? কিছু বোঝার জন্য সত্যি কি খুব বেশি কিছু দরকার? সুদর্শনের চোখে কি কোনো আলো দ্যাখেনি অঞ্জলি?

দেখেছে কিন্তু বিশ্বাস করেনি। কেননা, শিক্ষা-দীক্ষা অবস্থা-পরিবেশ, কোনো দিক দিয়েই অঞ্জলি সুদর্শনের সমকক্ষ নয়। নয় বলেই অঞ্জলি নিজেকে সব সময়েই সতর্ক রেখেছে, কখনো করুণা দেখাবার অবকাশ দেয়নি, দয়া করবার সুযোগ ঘটায়নি। চোখের গভীরে যতো আলোই জ্বলুক, সেই আলোর জীবন যে নেহাতই ক্ষণস্থায়ী এটা বুঝে নিতে বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয়নি তার।

কিন্তু আজ একটু বাড়াবাড়ি করছে না কি সুদর্শন?

গাড়ি বাঁয়ে বেঁকলো, কিছু দূর এসেই ডক্টর রায়চৌধুরীর মস্ত বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকে গেল। গাড়ি-বারান্দায় নেমে অঞ্জলি কম্পিত পায়ে অনুসরণ করলো সুদর্শনকে, সুদর্শন বারান্দা পার হয়ে ড্রয়িংরুমে এলো। ড্রয়িংরুম পেরিয়ে পাশের দিকে কার্পেট-মোড়া প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলা, দোতলার লম্বা করিডর পেরিয়ে দক্ষিণ কোণে সুদর্শনের ঘর, পর্দা সরিয়ে অঞ্জলিকে নিয়ে সে ঘরে ঢুকলো।

ঘরটা যে কী অসহ্য এলোমেলো, টেবিলটা যে কী স্তূপাকৃতি ভাবা যায় না। মাস্টার মশায়ের ঘরটা মনে পড়লো অঞ্জলির. কী পরিপাটি। প্রত্যেকটি বই গুছোনো, প্রত্যেকটি জিনিস সন্নিবিষ্ট। বেড-কভার দিয়ে ঢাকা কোণের স্টুডিয়ো-বেডটির চাদর কী নিভাঁজ, বইয়ের র‍্যাকগুলো কী ঝকঝকে, লেখাপড়া করার টেবিলটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কলম পেনসিল ছুরি কাগজ চাপা পেপার কাটার প্রতিটি জিনিস যেন হুকুমের অপেক্ষায় টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দিলেই পেয়ে যাবেন সব। অথচ মাত্র একটি ছোকরা ছেলের সাহায্যে তিনি তাঁর সংসার চালান, অর্ধেক কাজ নিজে করেন। আর এখানে তো দেখছে পায়ে পায়ে লোক।

নোংরা ঘর বলে একটুও লজ্জিত হলো না সুদর্শন, বোধহয় বুঝতে পারলো না যে নোংরা। একস্তূপ বই এখান থেকে সেখানে সরিয়ে বসতে জায়গা দিল, বেল বাজিয়ে চা আনতে হুকুম দিল, তারপর ঘাম মুছতে মুছতে বললো, 'বৃষ্টি হচ্ছে না কেন বলুন তো—'

'হচ্ছে তো।'

'হচ্ছে? একে আপনি বৃষ্টি হওয়া বলেন নাকি?'

'আমি কিন্তু চা খাবো না।'

'কেন?'

'ঘড়ি দেখুন না।'

'দেখেছি, তার সঙ্গে চা খাওয়ার কোনো বিরোধ নেই।'

'আমি চা বেশি খাই না।'

'আমি খাই। যখন দেবেন তখুনি রাজি। সিগারেটও খাই তবে ধরাই বেশি, টানি কম।' পকেট থেকে সিগারেট বার করলো সে।

ঘরটা সুন্দর। খুব বড়ো নয়, ছোটোও নয়, শাদা ধবধবে মেঝে, চারদিকে খোলা জানালা, জানালার তলায় বাগান। লম্বা লম্বা পাম গাছের সারি দেখা যাচ্ছে ধারে। অঞ্জলি অন্যমনস্কভাবে সেদিকেই তাকিয়েছিল।

'শুনুন।'

'বলুন।'

'মুখভার করে আছেন কেন?'

'না তো।'

'আমি তা-ই দেখছি।'

'কী মুশকিল।'

'একটা কথা বলতে চাই।'

'বেশ তো।'

'চটে যাবেন কি না তাই তো বুঝতে পারছি না।'

অঞ্জলি মৃদু হেসে বললো, 'আমাকে দেখে কি খুব রাগি বলে মনে হয়?'

'ওরে বাবা, আপনাকে আমার ভীষণ ভয় করে।'

'কেন?'

'সব সময় কেমন শিক্ষয়িত্রী ভাব।'

'এটা নিন্দা, না প্রশংসা?'

'নিন্দা।'

'নিন্দে করবার জন্যই নিয়ে এলেন?'

'না।'

'তবে।'

'একটা কথা বলবো?'

'সেটা বুঝি বাইরে বলা যেতো না?'

'অসম্ভব।'

'খুব জরুরি?'

'খুব।'

'এবং আজকেই বলতে হবে?'

'সুযোগ তো রোজই খুঁজি, পাই কোথায়?'

হঠাৎ থমকালো অঞ্জলি।

সুদর্শনকে খুব অস্থির দেখাচ্ছিলো, সে স্থির হয়ে বসতে পারছিলো না। সিগারেটটা না ধরিয়েই ঠোঁটের ফাঁকে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছিলো। তারপর হঠাৎ বললো, 'আমি আপনাকে খুব পছন্দ করি।'

'তাই নাকি?' চকিত হয়েও অঞ্জলি ঠাট্টার ভাব দেখিয়েছিলো। সুদর্শন গম্ভীরভাবে বললো, 'পছন্দ করি কথাটা পোশাকি, যা বলা উচিত তা হচ্ছে, আপনাকে আমি ভালোবাসি।'

'ক্‌কী?' অঞ্জলির রক্তচলাচল মুহূর্তে অত্যন্ত দ্রুত হয়ে গেল।

'এবং আমি বিলেত থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি যদি অপেক্ষা করেন, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই।'

'বিয়ে!'

'যদি বাবার সঙ্গে এই ধরনের একটা গোলমাল না হতো, যদি হঠাৎ এই কাজ নিয়ে অতদূরে না যেতাম, হয়তো আরো অনেক দিন অপেক্ষা করা যেতো আপনার মন বোঝবার জন্য, অথবা ন'মাসে ছ'মাসে যখনি দেখা হোক, তাতেই খুশি থাকবার জন্য। কিন্তু এখন আর আমার সময় নেই।' শান্ত হয়ে বসলো সুদর্শন, শান্ত গলায় বললো, 'এখন আমি প্রত্যেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই এবং অধিকারগতভাবে চাই। আপনি বলুন আপনার কী মত।'

অঞ্জলি বললো, 'আমি একটু জল খাবো।'

'আপনি সংকোচ করবেন না, দ্বিধা করবেন না, যা আপনার নিজস্ব মত, আপনি তাই বলুন।' কোণের কুঁজো থেকে একগ্লাস জল নিজেই ঢেলে নিয়ে এলো, 'অনেক সময় মনে হয়, আমার প্রতি আপনি বেশ সদয়, আপনার কোনো কোনো কথা, কোনো কোনো দৃষ্টি, আমাকে আশান্বিত করে, আমি সাহসী হয়ে উঠি, তারপরেই হঠাৎ কখনো এমন নিস্পৃহ ব্যবহার করেন যে ভীষণ গোলমালে পড়ে যাই। যদি পছন্দ না করেন, তাহলে তো চুকেই গেল, নয়তো আমি সীতেশকে বলবো এবং বাবাকেও স্পষ্ট করে জানাতে পারবো কী কারণে আমি তাঁর কথা রাখতে অক্ষম।'

জল খেয়ে অঞ্জলি উঠে দাঁড়ালো, 'এবার গেলে হয় না?'

'যাবেন? ও।' সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শনও প্রস্তুত হয়ে পা বাড়ালো, 'ঠিক আছে, চলুন।'

বেয়ারা চা নিয়ে এসেছিলো, নিঃশব্দে বিদায় দিল তাকে।

ইতস্তত করে অঞ্জলি বললো, 'চা টা খেয়ে নিন না।'

'না।' সুদর্শনের চোখ লাল হয়ে উঠেছে মনে হলো।

আবার সেই কার্পেট-মোড়া কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো দুজনে, ঘর বারান্দা পেরিয়ে গাড়িতে উঠলো। সমস্তটা পথ আর একটা কথা বললো না কেউ।

গাড়ি এসে টালিগঞ্জের গলির মুখে থামলো। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিরালা নির্জন গলি। সুদর্শন নেমে এসে এদিকের দরজা খুলে ধরে বললো, 'আসুন। অপরাধ নেবেন না, আমার সাংসারিক

বুদ্ধি বরাবরই কম, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—'

অঞ্জলি নামলো, 'কী বুঝতে পারেননি?' দরজাটা ঠেলে দিয়ে সে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালো।

'যদি ভেবে থাকেন বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে এসব বলে আমি আপনাকে অসম্মান করেছি, সহস্রবার ক্ষমা চাইছি। আপনাকে অসম্মান করার কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিলো না কিন্তু।'

'আমি কি তা বলেছি?'

'সব কথাই কি মানুষ মুখে বলে?'

'আমিও তো সে কথাই বলতে চাই।'

'কী বলতে চান?

'কবে যাচ্ছেন?'

'জেনে কী হবে?'

'আমি ততোদিন কী করবো, সেটা তো বলবেন।' অঞ্জলির গলা ভেঙে এলো, চোখে জল উপচোলো।

তাকিয়ে রইলো সুদর্শন, তারপরই হাসিতে ভরে গেল মুখ, গাঢ় গলায় বললো, 'লম্বা লম্বা চিঠি ভরে কান্না পাঠাবেন, তখন আমি চাকরি বাকরি মাথায় রেখে দৌড়ে ফিরে আসবো।'

'আমি কি তার যোগ্য?'

'তুমি ছাড়া আর কে?' পিঠের উপর হাত রেখে সুদর্শন ঈষৎ আকর্ষণ করলো কাছে, গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে আবার উচ্চারণ করলো, 'তুমি ছাড়া আর কে! তুমি! তুমি! শুধু তুমি!'

।।১৫।।

এই সেই ব্যক্তি। পাশে রাখা পুরোনো হলদে পোকায় কাটা ছবিটা অঞ্জলি দেবী আবার হাতে তুলে নিলেন, যুবকটিকে দেখতে লাগলেন একাগ্রদৃষ্টিতে। কাঁদলেন মনে মনে, নিঃশব্দে বললেন, 'সেই তুমি এখন কোথায়? তুমি কেমন আছ? আমি নিরন্তর প্রার্থনা করি তুমি ভাল থাকো। আমার নিজের কোনো ভাল-মন্দ নেই, তোমার ভালোই আমার ভালো। কিন্তু তুমি কোথায়?'

নিশ্বাস নিয়ে চকিত হয়ে তিনি আবার স্যুটকেস গুছোনোতে মন দিলেন। হঠাৎ মনে হলো তাঁর ছেলের এখন আসা উচিত। বড্ড ঘোরাঘুরি যাচ্ছে। একটা স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে যাবে, অতি শাদামাঠা কথা, তবু কী হয়রানি। এটা হয় তো সেটা হয় না, সেটা হয় তো ওটা হয় না। কোথায় রে ভিসা, কোথায় রে পাসপোর্ট, আবার গ্যারেনটার চাই— জাহাজ ছাড়বে সাত তারিখ সকালে, দশটার সময়, দিন আর নেই। আর মাত্র তেরো দিন। তেরো দিন বাদে ও জলে ভাসবে। তেরো দিন বাদে আর আমি ওকে কাছে দেখতে পাব না তিন বছর। তিন বছর? কী দীর্ঘ সময়। যদি বিয়ে করে যেত, বউ থাকত কাছে! আমার নিঃসঙ্গ জীবনের তবু একটা অর্থ থাকত। এখন আর কী অর্থ? বেঁচে থাকার কী মূল্য? বরং ভার। পুরন্দরের মুক্ত জীবনের অন্তরায়।

স্যুটকেসের তালা বন্ধ করলেন তিনি। ছবিটা তুলে নিয়ে সযত্নে আলমারির শাড়ির তলায় রেখে দিলেন। মনটা বিধুর হয়ে উঠল।

মনে পড়ল যে-সন্ধ্যায় সুদর্শন বিয়ের প্রস্তাব করেছিল, সেই রাত্রে অঞ্জলি ঘুমোতে পারেনি। প্রথম দিকে সে সুখের আবগে কাঁপছিল। তারপর যতবার একটু তন্দ্রা আসছিল, ততবার একটা পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। আর মাস্টারমশায়, ডক্টর সরকার মস্ত বড় একটা পাখি হয়ে এগিয়ে আসছিলেন ডানা ঝাপটে-ঝাপটে, সে চিৎকার করছিল, 'সীতেশদা, আমাকে বাঁচাও', কিন্তু সীতেশ কোথায়? দূরদূরান্ত থেকে তার ক্ষীণ গলা ভেসে এসে কী বলছিল বোঝা যাচ্ছিল না। আর সুদর্শনের কোনো অস্তিত্ব ছিল না সেখানে।

কী বিশ্রী স্বপ্ন। সকাল থেকেই উঠে হাত ধুয়ে সে বসে রইল চুপচাপ, মনে হচ্ছিল, সীতেশদা ঠিক এসে যাবে। মনে হচ্ছিল এতক্ষণে সব খবর জেনে গেছে সীতেশদা।

তা ঠিক। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, বেশ ভোরেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে উপস্থিত, সবে বাড়িব ঘুম ভেঙেছে তখন। অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে চোখে-চোখে হাসল, তার মুখের উদ্ভাস দেখেই অঞ্জলি আন্দাজ করল, কিসের এই আনন্দ। সে লাল হয়ে উঠল।

এর পরে বাবা আর মনোরমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। একটি পয়সা লাগবে না পড়াশুনোর জন্য, এমন কি যাতায়াতের খরচ পর্যন্ত কলেজ ফান্ড বহন করবে শুনে মনোরমা শোকার্তের মতো থমথমে মুখে বসে রইলেন। বাবা বললেন, 'তা যদি হয় তো পড়ুক। কিন্তু ঐ চল্লিশ টাকাব টিউশনিটা ঠিক আছে তো?' আড়চোখে তিনি মনোরমাকে দেখলেন। সীতেশদা বলল, 'নিশ্চয়ই. সেটার তো কোনো গোলমাল হচ্ছে না।'

মনোরমার আপত্তি আর টিকল না। সব ঠিকঠাক করে তারপর অঞ্জলির সঙ্গে একা হয়ে বলল, 'দুয়ে দুয়ে চার। অঙ্ক আমার ঠিক মিলে গেছে।

অঞ্জলি বলল, 'আপিস নেই?'

'না।'

'ছুটি?'

'আজ আমার খুশির ছুটি।'

'বলো না কিসের ছুটি।'

'টুরে যেতে হবে।'

'কবে?'

'আজ রাত্রেই।'

'আগে তো কখনও টুরে যাওনি।'

'সামান্য পদোন্নতি হয়েছে যে।'

'তাই নাকি?'

'মানে টুর করবার পদোন্নতি, লাভ আছে খুব। এবার তোমার বিয়ের টাকা জমাব।'

'আজ কখন যাবে?'

'আসলে চেষ্টাচরিত্র করেই টুরটা ফেললাম। একবার বম্বে যাওয়া দরকার। বাবার শরীর একেবারেই ভাল নেই, বুঝতে পারছি না কী হবে।'

'আবার নতুন করে কিছু হয়েছে?'

'তা নয়, মানসিক দিক থেকেই অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। আমিও তো কাছে নেই। বম্বেতেও আমাদের আপিস আছে, দেখা যাক, সেখানেই বদলি হওয়া যায় কি না। কাল তার জন্যই আবেদন-নিবেদন করতে গিয়েছিলাম বড়ো সাহেবের কাছে--'

'তুমি তো তোমার এক সহকর্মিণীর বাড়ি গেলে।'

'তাকে নিয়েই গিয়েছিলুম। আমাকে বদলি হতে গেলে তাকেও তো বদলি করা দরকার?'

'কেন?'

'সে সব পরে শুনো, আগে তোমার ব্যাপারটা জেনে নিই।'

'আমার আর কী ব্যাপার?'

'কিছু না, না?'

'সীতেশদা—'

'বলে ফ্যালো।'

'আমার ভয় করছে।'

'আর তোমার ভয় কী অঞ্জু। কাল আমি অনেক রাতে মেসে ফিরেছি। ফিরেই দেখি শ্রীমান বসে আছে। শুনে আমার কী যে আনন্দ হল। অবশ্য জানতাম যে, দুয়ে দুয়ে চারই হয়। তবে সে যে এত বড় ওস্তাদ, একেবারে প্রথম দিন একা হয়েই বিয়ের প্রস্তাব করে বসবে, তা কিন্তু ভাবিনি।'

অঞ্জলি লাজুক মুখে চুপ করে রইল। সীতেশ বলল, 'ওর চাকরিটা কী তা জানো তো?'

'না।'

'যাকে ভবিষ্যৎ স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছ, তার বিষয়ে তা হলে কিছু জ্ঞান দেওয়া দরকার তোমাকে। ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। এখানে ও যে কাজটা করছে, সেই কাজের কিছুটা অংশ, মানে ওর থিসিসের খানিকটা, ও একবার কেম্ব্রিজের কোনো এক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল দেখবার জন্য। তার পরে কিছুদিন অপেক্ষা করে কোনো জবাব না পেয়ে ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ শুধু প্রাপ্তিসংবাদই নয়, সেই প্রোফেসর একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে এক লম্বা চিঠি লিখেছেন। লিখেছেন, যদি এই থিসিস সে ওখানে গিয়ে শেষ করতে চায় তিনি সানন্দে তার জন্য যা কিছু সাহায্য দরকার তা করবেন। সুদর্শন তখন একটা স্কলারশিপের কথা বলেছিল, যাতে তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে, নয়তো এমন একটা চাকরি, যে চাকরি থেকে অন্তত থিসিস করার মতো সময়টুকু সে বার করে নিতে পারে। এটি সেই চাকরি। পার্টটাইম পড়াবে, বাকি সময় ঐ বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের অধীনে গবেষণা। এরকম হয় না অঞ্জু, এরকম হয় না। এ ধরনের নজির খুব কম। ওর বিষয়ে ও অনন্যসাধারণ। কাজ শেষ করে যখন ফিরে আসবে, দেখো দেশে দেশে তখন ওর কী সম্মান!'

বন্ধুর গর্বে সীতেশদা গৌরবান্বিত হয়ে উঠলো।

শুনতে শুনতে ঘেমে উঠছিল অঞ্জলি। অনেক পরে বললো, 'তুমি তাহলে আজই যাচ্ছ?'

'আজই যেতে হচ্ছে। কী ফরমাস আছে, বলো।'

'আমাকে তবে কে ভর্তি করবে?'

'কেন, মাস্টার মশায় থাকতে ভাবনা কী তোমার।'

'কবে ফিরবে?'

'ধরো, মাসখানেক।'

'মাসখানেক !'

'বেশি না, বেশি না। বরং বলবে সীতেশদা না এলেই বাঁচি, এলেই তো দুজনের জায়গায় সময়কে তিন ভাগ করে নিতে হবে। অথচ টিউশনি মাত্র একটি।'

'কেবল বাজে কথা। এবার সহকর্মিণীর ব্যাপারটা বলো, শুনি।'

'ব্যাপার কিছু ঘোরালো নয়, ভাবছিলাম সহকর্মিণীটিকে সহধর্মিণী করে নিলে কেমন হয়।'

'ও মা, তাই বুঝি? কী সাংঘাতিক! এতোদিন বলোনি কেন?'

'বলবার সময় না হলে কি বলা যায়?'

'আমি কল্পনাও করতে পারছি না, কী করে এতোদিন আমি একটুও টের পেলাম না। কী ভয়ানক মানুষ তুমি। সারা সন্ধ্যা কী নিশ্চিন্ত মনে আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াও।'

'সারাদিন এক আপিসে চাকরি করি, আবার কি তুমি সন্ধ্যাবেলাটাও ল্যাজ করে ঝুলয়ে রাখতে চাও নাকি? মানুষকে তো হাত মুখ ধুয়ে চা খাবার সময়ও একটা দিতে হয়?'

'ও, তাহলে সন্ধের পরে যাও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মেসের অন্ধকারে গিয়ে খেয়ে শুয়ে ঘুমোনো ছাড়া বাকি সময়টা, সন্ধ্যার পর থেকে সেখানেই কাটাই। দোষ আছে কিছু?'

'আমার সঙ্গে কবে দেখা করিয়ে দেবে?'

'একটু বাংলাটা সড়োগড়ো হোক তো।'

'কেন? বাংলা জানে না বুঝি?'

'মেয়েটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান।'

'তা হলে তো খুব সুন্দর হবে দেখতে?'

'কী করে জানলে?'

'সবাই বলে। নাম কী সীতেশদা?'

'রীটা। আমি সেটাকে রীতা করে নিয়েছি।'

'বাঙালির বউ রীতা ছাড়া আর রীটা হবে কী করে?'

'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের উপর আমার মা-বাবার ভয়ানক ঘৃণা।'

'কেন?'

'আমি জানি এ বিয়ে নিয়ে খুব অশান্তি হবে।'

'কিচ্ছু হবে না, আমার মনে হয় না মামা-মামী আপত্তি করবেন।'

'করবেন। যদি নাও করেন, খুব দুঃখিত হবেন। অঞ্জু, মা-বাবাকে আমি দুঃখ দিতে চাই না। মা-বাবা আমার কোনো দুঃখের কারণ হননি কখনো। তুমি তো জানো, কী স্বাধীনভাবে আমি বড়ো

হয়েছি।'

'তুমি রীতাকে বলেছ সব কথা?'

'বলেছি। সে বলেছে, তুমি সময় নাও, ধীরে ধীরে ওদের মন প্রস্তুত করো, আমি তো আছিই।'

'কী ভাল মেয়ে।'

'আরও একটা খবর।'

'কী?'

'চমকে যেয়ো না, আমাদের কোম্পানি আমাকেও হয়তো তাদের ব্যবসার অলিগলি আরো ভাল করে চিনিয়ে আনবার জন্য বিদেশে পাঠাবে কিছু কালের মধ্যে।'

অঞ্জলির মুখ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। চুপ করে থেকে বললো, 'তুমিও যাবে?'

'তোমার জন্যই আমার চিন্তা ছিল অঞ্জু, এই প্রস্তাব আমার কাছে নতুন নয়, আমিই সময় নিচ্ছিলাম, কেবল ভাবছিলাম তোমাকে ফেলে গেলে তুমি কোন তিমিরে তলিয়ে যাবে কে জানে। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিন্ত। এখন আমি সানন্দে যেতে রাজি।'

'সাতেশদা—'

'বলো।'

'তা হলে এমন একটা সময় হবে আমার যখন তোমরা কেউ কলকাতায় থাকবে না।'

'মানে আমি সুদর্শন, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'কী হয়েছে? মন দিয়ে পড়াশুনো করবে, মাস্টার মশায় আছেন। তিনিও এখন কম নন তোমার জীবনে।'

'তা নন নিশ্চয়ই।'

'আর তুমিও এখন যথেষ্ট স্বাধীন, তোমার জন্য তো কারো আর একটা পয়সাও খরচ করতে হচ্ছে না, তুমিই সাহায্যকারী।'

'হ্যাঁ, তোমার টাকা সংসারে আমাকে আসন দিয়েছে।'

'অঞ্জু, আমি যে তোমার মায়ের পেটের ভাই নই তা আমি জানি, বারে বারে কেন মনে করিয়ে দাও? আমি দুঃখ পাই।'

'এসব কী বলছো?'

'তা নইলে কোনো অবিবাহিত বোনকে, যে বোন তখনো ছাত্রী, তার জন্য তার চাকুরে দাদা কিছু করলে সেটা কি কেউ উল্লেখযোগ্য মনে করে? সেটা তো তাব কর্তব্য। না করলেই নিন্দে।'

'থাক আর বলবো না।'

না। কক্ষনো বোলো না। টাকা আজ তোমার প্রয়োজনে আমি খরচ করছি, আমার প্রয়োজন হলে নিশ্চয় তুমিও করবে। যাকগে, এক কাপ চা খাওয়াও। আমি যাই, মনোরমা দেবীর তুষ্টি সাধন করি গে, ভদ্রমহিলা নানান মানসিক বিকৃতিতে কষ্ট পাচ্ছেন। এতোক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে কথা বলাটা নিশ্চয়ই ওঁর পছন্দ হচ্ছে না। শেষে আবার হিতে বিপরীত হবে।'

।। ১৬ ।।

কলেজে ভর্তি হলো অঞ্জলি। সীতেশ চলে গেছে, মাস্টার মশায় নিজেই গিয়ে ভর্তি করলেন, ফি দিলেন, জিজ্ঞেস করলে বললেন, সবই কলেজ ফান্ড দিয়ে দিচ্ছে, আর তোমার যাতায়াত বাবদও মাসে পনেরো টাকা করে পাবে। কলেজের এই অদ্ভুত দানে অঞ্জলির বাক্যস্ফূর্তি হলো না। সবই মাস্টারমশায়ের জন্য, মনে-মনে মানুষটিকে সে প্রণাম করলো।

যেদিন ভর্তি হলো সেদিন কলেজের পরে মাস্টারমশায় তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন, চা খাওয়ালেন, বললেন, 'আশা করি তুমি কলেজের উত্তম ছাত্রী হবে, তোমার জন্য সব অর্থব্যয় তুমি সার্থক করবে।'

মাথানিচু করে অঞ্জলি বললো, 'আপনি সহায় থাকলে আমি সব পারবো।'

'শুধু পারবোই নয়, বলা উচিত ছাড়বো।' ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসলেন তিনি। 'বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প, আড্ডা, ঘুরে বেড়ানো, এগুলোও এক পাশে সরিয়ে রাখতে হবে।'

সরল চোখে তাকালো অঞ্জলি, 'আমার তো কোনো বন্ধু নেই। আপনি তো জানেন এখানে আমি স্কুলে পড়িনি, প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েছি, মাঝে মাঝে যতোটুকু আপনার কাছে দু'একবার এসেছি, আর বাইরে শুধু সীতেশদাই আমার একমাত্র সঙ্গী।'

'না, না, সেটাও কিছু স্বাস্থ্যকর ব্যাপার নয়,' ভুরু কুঁচকে তিনি চুরুট ফুঁকলেন, 'আমিও লক্ষ করেছি, সর্বক্ষণই তুমি সীতেশের সঙ্গে থাকো, তার সঙ্গেই বেড়াও, এখানে আসো, মেয়েদের ছেলে বন্ধু থাকলে ক্ষতি নেই, কিন্তু সেটা যেন অবিশ্রান্ত না হয়।'

অঞ্জলি প্রতিবাদ করলো, 'সীতেশদা আমার বন্ধু নয়, আমার দাদা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাদাই তো। তা দাদা কি আর বন্ধু হতে পারে না?' যাকগে, এসো তোমার কী কী ব কিনতে হবে তার লিস্টটা করে ফেলি। ভালো করে বোসো, আড়ষ্টতা কিসের? আমাকে তো আট দশ মাস যাবৎ দেখে আসছো। কিছু সংকোচ নেই, মনে করো এ বাড়ি তোমারও বাড়ি।' সে একাগ্র দৃষ্টি আবার স্থির হলো মুখের উপর, কিন্তু সরিয়ে নিলেন তক্ষুনি, চায়ের কাপ হাতে তু দিতে দিতে বললেন, 'মাস্টার আর ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ব্যবধান আমি পছন্দ করি না, তাতে কো পক্ষেরই কোনো লাভ হয় না।' একটু থেমে, একটু ভেবে বললেন, 'সীতেশ চলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কবে ফিরবে?'

'বোধ হয় তিন-চার সপ্তাহ বাদে।'

'শুনলাম কোম্পানি বিলেত পাঠাচ্ছে?'

'বোধহয়।'

'তা হলে খাতাটাতা কী কিনতে হবে লিখে নাও, যা টাকা লাগে সব পাবে।'

'বই-খাতা কেনার টাকাও?'

'কেন নয়? ভালো এবং পছন্দমতো ছাত্রীর জন্য এটুকু তো করতেই হবে।'

'আমি ভাবতেও পারছি না, কী করে এতোখানি সম্ভব হলো।'

'দরকার কী ভাববার। জেনে রাখো ভাববার ভার তোমার আমিই নিয়েছি। খাও, মিষ্টিটা খেয়ে নাও—'

'আমি আর খাবো না।'

'না, না, তা কখনো হয়, তোমার জন্য আনলাম।'

'রেখে দিয়ে যাই?'

'কোথায় রাখবে? কে খাবে? দেখছো তো একা মানুষ, তুমি এসেছ তাই বাড়িটা বাড়ি বাড়ি হয়ে গেল, তুমি চলে গেলেই আবার নিঃসঙ্গ মরুভূমি। সুতরাং তুমিই খেয়ে নাও, নয়তো নিয়ে যাও। হ্যাঁ, শোনো, বলো তো কবে কবে আসবে এখানে?'

কবে কবে? প্রশ্নটা ঠিক অনুধাবন করতে পারছিলো না অঞ্জলি। মাস্টারমশায় বুঝিয়ে বললেন, 'মানে, আমি বলছিলাম, যেদিন ইচ্ছে সেদিন তো নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে নির্দিষ্ট দিনও ঠিক করে নাও যেদিন আসবেই। আমি বাড়ি থাকবো অপেক্ষা করবো।'

'ও। তাহলে সীতেশদা আসুক?'

'সীতেশকে জিজ্ঞেস না করে তুমি কি কোনো কাজ করো না?'

তা নয়, সীতেশদা থাকলে আমি তার সঙ্গে আসতে পারবো।'

'সঙ্গে আসার কী দরকার? একাই চলে আসবে। বাড়ি তো চেনই। আমি বলছিলাম, গোড়া থেকেই যদি বেশ ভালোভাবে পড়াগুলো শুরু করে দাও আমি যদি সাহায্য করতে পারি, তাহলে শুধু প্রথম বিভাগ কেন, প্রথম দশজনের একজন হতে পারবে।'

'পারবো?' চোখেমুখে আশার আলো জ্বলে উঠলো অঞ্জলির, 'আমাকে আপনি সাহায্য করবেন?'

'নিশ্চয়।'

অঞ্জলি উৎসাহে উদ্দীপনায় টগবগ করতে করতে বিদায় নিল, সপ্তাহে দু'দিন আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। মাস্টার মশায় হেসে বললেন, 'রোজ এলেও আমার আপত্তি নেই।'

বাড়ি ফিরলে থমথমে মুখে মনোরমা বলেছিলেন, 'তোমাদের কলেজ কি সন্ধে পর্যন্তও খোলা থাকে নাকি?'

'আমি কলেজ থেকে আমাদের এক প্রোফেসরের বাড়িতে গিয়েছিলাম।' অঞ্জলি নিজের ঘরে ঢুকলো। মনোরমা পিছনে কথা ছুঁড়ে মারলেন, 'প্রথম দিন থেকেই প্রোফেসরদের তেল মাখাচ্ছো, বাব্বা, আমরাও তো কলেজে পড়েছি, তেল কাকে বলে তা কিন্তু কোনোদিন জানিনি, পাস করতেও আটকায়নি।'

কাপড়চোপড় ছেড়ে অঞ্জলি হাতমুখ ধুলো, মনোরমার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে টেবিল ঘড়িটা

দেখলো, বাবা আপিস থেকে বাড়িতে ঢুকলেন। মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বললেন, 'ভর্তি হয়ে এলি?'

'হ্যাঁ বাবা।' অঞ্জলি এগিয়ে এসে হাত থেকে ছাতাটা নিল, 'আমার সব খরচ ওঁরা দেবেন, মানে কলেজ থেকে পাবো।'

'তা তো শুনেছি।'

'পনেরো টাকা করে যাওয়া-আসার খরচ পাবো মাসে।'

'বাঃ।'

'বই খাতা পেনসিল, যা কিনবো তার দামও দেবে।'

ছিটকে বেরিয়ে এলেন মনোরমা, 'আর তার জন্যে তোমার যুবতী কন্যাটিকেও কম দাম দিতে হবে না।'

'মানে?'

'মানেটা মেয়েকেই জিজ্ঞেস করো না। শুনছিলাম তো ভর্তি হয়েই ফিরে আসবে। এলো কখন?'

বাবা বিরক্ত মুখে ঘরে ঢুকলেন, গায়ের জামা খুলতে খুলতে বললেন, 'আজ শনিবার, রেসের ভিড়, প্রাণ বেরিয়ে গেছে আসতে। তোর আসতে কষ্ট হয়নি তো? একা একা চলাফেরা এবার অভ্যেস করে নে, সীতেশ তো নেই।'

শান্ত মুখে অঞ্জলি বলল, 'যিনি আমার স্টাইপেন্ডের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে ট্যাকসিতেই এসেছিলাম, কী কী বই লাগবে, কখন কোন ক্লাস, কীভাবে পড়বো, সব ঠিক করে দিলেন উনি। আসতে তাই একটু দেরি হলো, কিন্তু ট্রামে আমি বসতে পেয়েছিলাম।'

রান্নাঘরে বাবার খাবার তৈরি করতে গেল সে। টুকু এলো স্কুল থেকে, নন্টু এলো, এসেই হইচই আবদারে ভরে ফেললো বাড়ি, ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে দুটিও উঠে পড়ে সমান তালে কোলাহলে যোগ দিল। বিরক্ত হয়ে বাবা ধমক দিলেন, সেই রাগে মনোরমা কাকে থাপ্পড় কষালেন, ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল সে। অন্যেরা এর-ওর সঙ্গে খোঁচাখুঁচি শুরু করলো, একে অন্যের খাবার কেড়ে খেলো, মনে হলো একটা ভয়ংকর কিছু ঘটে যাচ্ছে ছোট্ট বাড়িটার মধ্যে, ঝড় আসছে, বান ডাকছে, গাছ ভাঙছে, মানুষ ভাসছে, আরো যেন কী।

অঞ্জলির পাগল পাগল লাগছিল। খাবার করতে, খেতে দিতে গলদঘর্ম হচ্ছিল। তবু একথা ভেবে ভালো লাগছিলো—বাবা মনোরমার কথায় কান দেননি, তার সঙ্গে সহানুভূতির সুরে কথা বলেছেন।

আর তারপরে তার চল্লিশ টাকা মাইনের টিউশনির মুক্তি। সীতেশদা। সবই সীতেশদা। মাস্টার মশায় ও সীতেশদা, সুদর্শন ও সীতেশদা।

॥ ১৭ ॥

দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে একটা মাস কেটে গেল, বোঝাও গেল না। বর্ষার পরে শরতের রোদে আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অঞ্জলি মনে মনে হিসেব করল, সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হতে আর মাত্র দু'মাস সময় হাতে আছে সুদর্শনের।

মাত্র দু'মাস? বুকটা কেঁপে উঠলো, চুলে বেণী পাকাতে পাকাতে থেমে গেল হাত।

এখন আর ভাবা যাচ্ছে না সে চলে যাবে।

এইমাত্র বিকেলের পাট সেরে গা ধুয়ে এসেছে, সিক্ত চেহারা আরো সজল দেখালো। নিশ্বাস ছেড়ে মুছে নিল মুখটা। ঘড়ি দেখে তাড়াতাড়ি প্রসাধন শেষ করে বদলে নিল শাড়ি। পায়ে জুতো গলাতে গলাতে না তাকিয়েই বিদায় নিল মনোরমার কাছে, 'আমি যাচ্ছি।'

মনোরমা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'পৃথিবী উল্টে গেলেও তো তোমার টিউশনিতে কামাই হবার জো নেই, দেখছো তো ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সবাই কেমন জ্বর জ্বালায় ভুগছি, দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি এসো।'

অঞ্জলি বলল, 'হ্যাঁ, আসবো।'

মনোরমা বললেন, 'সে তো বাছা রোজই বলো, আসতে আসতে তো সেই কানা রাত। কী ধরনের টিউশনি তাও জানি না বাবা, আমরাও তো কোনোদিন কাজকর্ম করেছি এরকম—'

অঞ্জলির কানে তার বেশি কথা ঢুকলো না, সে বাইরে রাস্তায় এসে হনহন করে গলি পার হলো।

নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুদর্শন, ঈষৎ অভিমানক্ষুব্ধ গলায় বললো, 'সময় হলো?'

'বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

'আমি তো ভাবলাম ভুলেই গেলে আসতে।'

'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো, না?'

'অপেক্ষা তো আমার অনুক্ষণের, তার মধ্যে আর কমবেশি কী?'

অঞ্জলি গাড়িতে উঠে বাঁ হাতে উড়ে আসা চুল কপাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে নরম গলায় বলল, 'ডক্টর সরকার আটকে দিয়েছিলেন, ফিরতে ফিরতে চারটে। কী তাড়াতাড়ি যে সব কাজ সেরেছি—'

'কী এতো কাজ করো তুমি বলো তো? কলেজ থেকে ফিরেও কাজ?'

'বাড়িতে সব অসুখ বিসুখ—'

'অঞ্জু—'

'কী ?'

'তুমি কতো ভালো—'

'হঠাৎ?'

'আর আমি কতো ভাগ্যবান।'

'হলো কী আজ?' সুদর্শনের প্রশংসায় অস্বস্তি বোধ করে সে ঠাট্টা করল, 'কী যে সব বই পাওয়া যায় না, প্রেম-পত্রটত্র, সেসব পড়া হয়েছে নাকি?'

পূর্ণবেগে গাড়ি চালাতে চালাতে সুদর্শন বললো, 'ঠিক ধরেছ, তোমারও একখানা চাই নাকি?'

'হলে মন্দ কী, প্রতিযোগিতায় আর কে হারতে চায়?'

'বইটা কিন্তু বর্ণমালার সাহায্যে ছাপা হয় না।

'তবে?'

'শিক্ষক রাখতে হয় সেজন্য।'

'দক্ষিণা?'

'দক্ষিণা?' খুব ভাবলো সুদর্শন, 'যৎকিঞ্চিৎ। এই ধরো সর্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকা, এক মুহূর্তও চোখের আড়াল না হওয়া এবং জগৎ সংসার ভেসে গেলেও এই শর্ত না ভাঙা।'

চোখের কোলে টোল পড়লো অঞ্জলির, 'কিন্তু জগৎ-সংসার ভাসিয়ে দিলেও কি কারো জাহাজ আটকে থাকবে দু'মাস বাদে? হাসতে হাসতেই বলেছিলো, বলতে বলতে গলা ভিজে উঠলো। তারপর দুজনেই চুপ।

অনেক পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুদর্শন বললো, 'আমার মা বেঁচে থাকলে কিন্তু ছবিটা অন্যরকম হয়ে যেতো।'

দীর্ঘশ্বাস অঞ্জলিও ফেললো। তার ভুলে-যাওয়া মাকে সে স্মরণ করলো।

সুদর্শন বললো, 'আসলে বাবার সঙ্গেও যদি আমার সম্পর্কটা এরকম একটা চ্যালেঞ্জে পরিণত না হতো, তাহলেও হয়তো এই বিচ্ছেদ আমাকে সহ্য করতে হতো না।'

সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে সুদর্শন, তার মাথা ভরা এলোমেলো চুল ইচ্ছেসুখ বাতাসে উড়ছে, দাড়ি-কামানো নীলচে গালের অর্ধেক দেখতে পাচ্ছে অঞ্জলি, চোখের কোণটা দেখছে। কী সুন্দর। ভাবছিলো সে। আস্তে বললো, 'বাবার সঙ্গে আর চ্যালেঞ্জ কিসের?

'ক্ষমতার। যোগ্যতার। উপার্জনের।' গলার স্বর কঠিন শোনালো, 'তিনি আমাকে তাঁর হাতের পুতুল তৈরি করতে চেয়েছিলেন, আমি তা হতে পারিনি। অবশ্য সেই বাধাই আমার পাথেয় হয়েছে, বাবা যতোবার আমাকে আঘাত করেছেন, আমি ততোবার অনেকখানি করে এগিয়ে গিয়েছি। আমি জয়ী হয়েছি এবং মজার কথা এই, সেই জয়ে বাবাই আবার গৌরবান্বিত হয়ে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়িয়েছেন, আমার ছেলে তো, সে তো আর চুনোপুঁটি হতে পারে না?

বাংলা দেশের এই বিখ্যাত ডাক্তারটি সম্বন্ধে শুধু সুদর্শনের বাবা হিসেবে সুদর্শনের মুখেই নয়, আরো অনেকের কাছেও অনেক রকমের গল্প শুনেছে অঞ্জলি, লোকটিকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছিলো তার।

সুদর্শন হোয়াইটওয়ে লেডলর দোকানের সামনে এসে গাড়ি থামালো। দোতলার চায়ের

কোণটি সুদর্শনের বড়ো পছন্দ ছিলো।

তখনকার কলকাতার এই হোয়াইটওয়ে লেডলর ডিপার্টমেন্টল স্টোরটি ছিলো উঁচু জাতেব দোকান, সাহেব-সুবোদের প্রিয় বিপণি। আর তার দোতলার মস্ত বড়ো জানালা ঘেঁসে গড়ের মাঠ দেখতে দেখতে চা খাওয়া, তার তুল্য আরামদায়ক বিলাসিতা আর কী হতে পারে?

চা এলো, স্যান্ডুইচ এলো, পড়ে রইলো টেবিলের উপর, সেটা খাদ্য নয়, বসে থাকার দাম। অবশ্য পটভর্তি চা ধীরে ধীরে অনেকখানিই শেষ করে ফেলতো সুদর্শন, স্যান্ডুইচের সদ্ব্যবহারও হতো শেষ পর্যন্ত, কেননা, বসে থাকার দাম হিসেবে নিলেও সেই সময়কার সেইসব ভোজ্যবস্তু উৎকৃষ্ট ছিলো।

বাবার কথা উঠলে সুদর্শন উত্তেজিত হয়ে পড়তো। অঞ্জলি সেই জন্যই এড়িয়ে যেতে চাইতো সেই প্রসঙ্গ কিন্তু পারতো না।

'বাবার সঙ্গে আমার প্রথম ঠোকাঠুকি হলো আমার পেশা নিয়ে।' একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলো সুদর্শন, 'অপরাধের মধ্যে আমি বলেছিলাম, ডাক্তারি আমার ভালো লাগে না। ব্যস, আর যাবে কোথায়? একেবারে বারুদের মতো জ্বলে উঠলেন। ভালো লাগে না মানে? ভালো তোমাকে লাগাতেই হবে। ভেবে দ্যাখো, এটা কি একটা কথা? আমারও জেদ চেপে গেল, নেহাত উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই একদিন এক বন্ধুর পরামর্শে ভর্তি হয়ে এলাম ইকনমিক্‌সে।'

'তারপর বোধহয় ভালো লেগে গেল?'

'খুব। আমি একেবারে নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম বিষয়টাতে।'

'তারপর?'

'তারপর ভালো হলো পরীক্ষা। রেজাল্ট বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যিনি হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন, তিনি ডেকে পাঠিয়ে নিজে এই ইনসটিটিউটে ঢুকিয়ে দিলেন আমাকে। বললেন, এদেরও কিছু কিছু কাজ দাও, নিজেও কিছু কিছু কাজ কর। মাইনে আছে, বলতে পার এক ধরনের স্কলারশিপ।'

'তখন নিশ্চয়ই বাবা খুশি হলেন।'

'না।'

'তবে।'

'আমার মাইনের অঙ্ক শুনে তিনি অপমানে মূর্ছা গেলেন। হাসতে হাসতে মবে গিয়ে বললেন, এবার তো বুঝেছ, নিজের দৌড় কতোখানি? ডাক্তার না হয়েছ বেশ করেছ, এবার যাও, বাপের পয়সায় বিলেত-ফেরত হয়ে এসে মানসম্মান বজায় রেখে কিছু করতে পার কি না দ্যাখো।'

'নিশ্চয় মাথা আবার গরম হয়ে উঠলো।'

'নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, বাবার পয়সায় বিলেত যাবো কেন? নিজের যোগ্যতাতেই যাবো। এর পরে বাবা আমাকে অনেক ব্যঙ্গবিদ্রূপ করলেন, আমি খেপে বেরিয়ে গেলাম, মা সেধে আনলেন, সে অনেক কথা। কিন্তু ঐ আঘাতটা না পেলে আমি কিন্তু মরিয়া হয়ে কেম্‌ব্রিজের ঐ অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম না। ভাবতামই না সে কথা। আসলে আমার এক কেম্‌ব্রিজে পড়া বন্ধুই আমাকে এই বুদ্ধিটা দিয়েছিলো। আমরা একসঙ্গে পড়তুম, সে বি এ পাশ করে চলে

গেল, আমি এখানে এম এ পড়লুম। বাবার সঙ্গে প্রায় বাজি রেখে আমি তাকে চিঠি লিখেছিলুম, যে করে হোক সেখানে গিয়ে অন্তত থাকা-খাওয়ার মতো কোনো সংস্থান সে আমাকে করে দিতে পারে কি না। তার বদলে সে আমাকে আমার কাজের অংশ পাঠিয়ে দিতে বললো এঁর নামে। ইনি খুব বিখ্যাত প্রোফেসার, এঁর বই আমি আগেই পড়েছিলাম। পাঠিয়েছিলাম এক বছর আগে, জবাব আসেনি কোনো, আমিও আশা ছেড়ে দিয়ে প্রায় ভুলে গিয়েছিলুম, হঠাৎ বাবা আমার বিয়ে দেবার জন্য যে কেন খেপে গেলেন কে জানে। বলতে পার আমার এগুবার পথে এটাও আর একটা ধাক্কা।'

'কেন?'

'আমি মানসম্মান খুইয়ে সেই অধ্যাপকের কাছে আবার একটা চিঠি লিখেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এসে গেল। আসলে আমার জন্য তিনি সচেষ্টই ছিলেন, আমার পেপার তাঁর খুব মনে ধরেছে, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না বলেই অপেক্ষা করছিলেন চিঠি লিখতে।'

'বাবার বন্ধুর মেয়েকে বিয়ে করতে আপত্তি কি শুধু বাবার সঙ্গে বিরোধিতা করবার জন্য?'

'ততোদিনে যে তোমাকে দেখে ফেলেছি।'

'আহা।'

'আহা কী?'

'নিশ্চয়ই ওকেও চিনতে?'

'কাকে? ইরাকে?'

'নাম বুঝি ইরা?'

'ভয় পেয়ো না, চিনতাম, কিন্তু প্রেমরোগে ভুগিনি।'

'ইশ।'

'ইশ কী? সেই চোদ্দ বছর বয়সে একটা যোলো বছরের মেয়ের কাছ থেকে দাগা খেয়ে আত্মহত্যা করতো চেয়েছিলাম, তারপর এই আমার অষ্টাদশী।'

'একবারে আত্মহত্যা?'

'কী করবো? সে যখন আমাকে গাল টিপে দিয়ে চাকুরে বরের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, আমার আর দেহে প্রাণ রাখতে ইচ্ছে করলো না। দৌড়ে গিয়ে ইঁদুরের বিষ কিনে নিয়ে এলাম। তারপর ভাবলাম মৃত্যুযন্ত্রণা বলে একটা কথা শুনেছি, নিজের যন্ত্রণা তো আর নিজে দেখতে পাবো না, বরং একটা একসপেরিমেন্ট করা যাক। এই ভেবে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে একটা বেড়ালকে খাওয়াতে গিয়েই প্রাণটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। আর বুঝে দেখো, বেড়ালের প্রাণের জন্যই যার প্রাণ অমন ছ্যাঁৎ করে ওঠে, নিজের জন্য তার কী হয়?

ঝরনার মতো হেসে উঠলো অঞ্জলি, সেই হাসিতে গলা মেলালো সুদর্শন। তাদের মিলিত গলার অনাবিল হাসি দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে, শেষে ঘর ছাড়িয়ে যেন সমস্ত জগৎ থই থই করতে লাগলো সেই সুখে।

গলা মিলিয়ে সেই হাসির আহ্লাদ কি অঞ্জলি দেবী আজও শুনতে পাচ্ছেন? নইলে বুকের শিরাটায় এমন টান পড়লো কেন?

॥ ১৮ ॥

ফিরে এলো সীতেশদা। বম্বে যাওয়া হয়নি তার। আপিসের কাজে এক মাসের জায়গায় পুরো দু'মাস উত্তর ভারত সফর করতে হয়েছে। তার উপরে রীতাকে আটকে দিয়েছে দিল্লির হেড আপিস। এখন থেকে দিল্লিতেই বদলি হল সে। সবটা মিলিয়ে খুব মন খারাপ হয়ে গেছে তার।

কিন্তু সীতেশদা সীতেশদাই। তার মুখ সব সময়েই অমলিন। পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'ওসব কথা থাক। তোমার খবর কী বল। কেমন আছ?' খুশি মুখে বসতে গিয়ে গরমে ছটফট করে সিলিংয়ের দিকে তাকালো।

অঞ্জলি হেসে বলল ওটা নিয়ে কিছু বোলো না। পাখা আমার লাগে না তবু কত ভাগ্যে যেমনি হোক একা একটা ঘর পেয়েছি।'

'ভাঁড়ার ঘর বল, শুধু ঘর বলছ কেন?'

'এটা আমি স্বেচ্ছায় নিয়েছি কেউ চা-.য়নি।'

'একটা টেবিল ফ্যান অন্তত ভাড়া করতে পারো।'

'টিউশনিটা পেলে তখন দেখা যাবে।'

'টিউশনি? টিউশনি পেয়েছো নাকি?'

'সম্ভবনা হয়েছে।'

'কোথায়?'

'আমাদের কলেজেরই একটা মেয়ের ভাইকে পড়াতে হবে, মাইনে পঁচিশ টাকা, ভালো না?'

'কেন, । এই চল্লিশ টাকায় তোমার কুলোচ্ছে না?' বোঝা গেল রাগ করছে সীতেশদা।

অঞ্জলি হেসে বলল, 'কুলোচ্ছে যে তা বুঝতে পারছ না? কলেজে ভর্তি হলুম, যাচ্ছি আসছি, কেউ কিছু বলছে না বাড়ি থেকে, আর কত প্রমাণ চাও?'

'তবে?'

'এর পর আমি পঁচিশ টাকা দেব, তুমি পনেরো টাকা দেবে।'

'ও।'

'শোনো, এখন আমি কত সময় পাচ্ছি ভেবে দ্যাখো। পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা কী করবার আছে আমার? অথচ টিউশনির ছলে বেরুতেই হয়।'

'আর বেরিয়ে গাড়ি করে দিক্‌বিদিগে ছুটে বেড়াতে হয়। জানি, জানি, সবই জানি।' রাগ ভুলে হাসল সীতেশ, তারপর বলল, 'অন্তত সুদর্শন আর যে ক'টা দিন দেশে আছে, সময়টা তোমার হাতে রাখা উচিত ছিল।'

'ওটা আগামী মাস থেকে হবে সীতেশদা।'

'বরং পনেরো তারিখ থেকে ঠিক করে নাও না।'

'তাও হয়।'

'সুদর্শন ঠিক কবে রওনা হচ্ছে?'

'জানি না। তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'কাল কী কাণ্ড!'

'কী?'

'গিয়ে দেখি সুদর্শন বাড়ি নেই, ওর বাবা বসে আছেন বসবার ঘরে। ঢুকতেই ধরে ফেললেন। বললেন, "এসো তোমাকে বুঝিয়ে দিই, ক্যানসার বোগটা কী। যার নাম কর্কট তার নাম ক্যানসার। ক্যানসার আসলে— আচ্ছা তার আগে তোমাকে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে কী কী ক্রিয়াকাণ্ড চলেছে সেটা বুঝিয়ে নিই। দাঁড়াও তার আগে তোমাকে অ্যানাটমিটা না বোঝালে চলবে না—" আমি তো প্রমাদ গুনলাম। ওদিকে আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে—'

'বেশ পাগল আছেন তো।' অঞ্জলি হাসলো।

'পাগল বলে পাগল! এর পরে হঠাৎ তাঁর ধারণা হলো আমি রোগা হয়ে গেছি, অমনি ডায়েট বিষয়ে তিন পৃষ্ঠা বক্তৃতা, আর তারপরেই লাফিয়ে পড়লেন ছেলের উপর।'

'ছেলে কোথায় ছিল।'

'কোথায় ছিল কে জানে, বাড়িতে তো ছিল না।'

'তবে?'

'উদ্দেশেই বকাবকি শুরু করলেন। ছেলে যে তাঁর কত অপদার্থ তার ফিরিস্তি শুনতে শুনতে প্রায় মাথা ধরে যাবার উপক্রম। শেষ এবং চরম অপদার্থতার নিদর্শন দিলেন তাঁর মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে না করে কোথাকার কোন্—'

বলতে বলতে থেমে গেল সীতেশদা, বললো, 'যাকগে ওসব শুনে তোমার লাভ নেই। সুদর্শন যে কেন এমন রেগে যায় সেটা বুঝতে অন্তত দেরি হল না আমার।'

'আমার খুব খারাপ লাগে।'

'তোমার খারাপ লাগার কী আছে?'

'এই গোলমালটা তো আমারই জন্যই?'

'গোলমাল যিনি করতে চান, তাঁর কোনো কারণের দরকার হয় না। তোমার খবর বলো. কেমন লাগছে?'

'খুব ভালো।'

'নিশ্চয়ই ঠিকমতো যাচ্ছ?'

'এখনো তো কামাই করিনি। সীতেশদা, কলেজে ভর্তি হয়ে আমি অন্য জগতে এসে পৌঁছেছি। তোমার জন্যই তো।'

'মাস্টার মশায় কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'তুমি যাও তো মাঝে মাঝে?'

'নিয়ম করে সপ্তাহে দুদিন যাই। প্রায় ঘরের মানুষ করে ফেলেছেন আমাকে। নিজের থেকেই ওঁর খুঁটিনাটি অনেক কাজের ভার আমার উপর পড়ে গেছে।'

'এটা সুখের কথা। এখন তো বুঝতে পারছো, দুঃখ নিরবচ্ছিন্ন নয়।'

'কিন্তু একটা কথা।'

'কী?'

'আমার কলেজের স্টাইপেন্ডের ব্যাপারটা কিন্তু অদ্ভুত।'

'অদ্ভুত মানে?'

'তুমিও তো কলেজে পড়েছো, এরকম হয় বলে শুনেছ কখনো?'

'কী রকম?'

'বুঝতে পারছ না?'

'না।'

'এরকম হয় না।'

'কী রকম হয় না?'

'এই ধরনের কোনো স্টাইপেন্ড কোনো ছাত্রছাত্রীকে কক্ষনো দেওয়া হয় না কলেজ থেকে।'

'মানে?'

'আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি। আমার কথা শুনে সবাই অবাক হয়।'

'তা হলে তুমি পাচ্ছ কী করে?'

'আমি তো সেটাই ভাবি।'

'তুমি নিশ্চয়ই সকলের কথা জানো না?'

'জানি। আমার সন্দেহ হওয়াতে আমি ভালো করে জিজ্ঞেস করেছি।'

'হয়তো উনি নিজে স্পেশাল কোনো ব্যবস্থা করেছেন।'

'না।'

'তবে?'

'মনে হয় উনি নিজেই সব বহন করছেন।'

'না না—'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে উনি বলতেন না?'

'বলার দরকার মনে করেননি। আমাদেরই বোঝা উচিত ছিল অন্তত তোমার তো নিশ্চয়ই। আমাকে উনি খাতা পেনসিল পর্যন্ত কিনে দেন। বলেন, কলেজ দিচ্ছে। পনেরো টাকা যাতায়াত ছাড়া দেন। এ কখনো হয়?'

'তাই তো।'

'তোমার কিন্তু একটা দায়িত্ব ছিল।'

'কিসের দায়িত্ব?'

'তোমার বোনের। যা তুমি সব সময়ে ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা পালন করে এসেছ এ পর্যন্ত।'

'বলতে চাও যে সেটা পালিত হয়নি?'

'না। এভাবে কোনো খোঁজ-খবর না নিয়ে ওঁর হাতেই সব ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি।'

'অঞ্জু, মাস্টার মশায় তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তুমি তোমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় থেকে ভেবে দ্যাখো ভালো করে, কতভাবে উনি কত সাহায্য করেছেন তোমাকে, সব হয়তো তুমি জানোও না। পীযূষ সেন ওঁর ইচ্ছেতেই স্পেশাল ক্লাস নিতেন তোমার জন্য। সুতরাং ওঁর সম্পর্কে তোমার কিন্তু এ রকম দূরের মতো, পরের মতো কথা বলা শোভা পায় না।'

'কিন্তু আত্মসম্মানে আটকায়।'

'আমি জানি না, সত্যিই এই স্টাইপেন্ডের আড়ালে তিনি নিজেই তোমাকে তোমার পড়াশুনার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করে যাচ্ছেন কি না, যদি সত্যি তা হয় তা হলে জানবো যে তাঁর মতো একজন মহানুভব ব্যক্তির কাছে তোমার-আমার মতো ক্ষুদ্র ছাত্রছাত্রীর সম্মান-অসম্মানের প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়।'

'বুঝি। কিন্তু —'

'কোনো কিন্তু নয়। তিনি তোমার বিষয়ে আমাকে একটা কথা বলেছিলেন।'

'কী কথা?'

'বলেছিলেন, তাঁর বন্ধনহীন জীবন আবার এক নতুন আকর্ষণে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।'

'কী রকম?' ভুরু বাঁকিয়ে তাকালো অঞ্জলি।

'ঠিক মনে নেই কী প্রসঙ্গে — তবে বলেছিলেন।'

'কী বলেছিলেন?'

'এই স্টাইপেন্ডের ব্যাপারেই আমি বোধহয় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম, বলেছিলাম আপনার সাহায্য না পেলে ওর কখনো পড়া হতো না। তার উত্তরেই বললেন, তোমার জন্য উনি যা করেন, কতোটুকু করেন, তাতে তোমার চেয়ে তাঁরই উপকার হচ্ছে বেশি। আমি বললাম কী ভাবে? উনি বললেন, তোমাকে দেখার পর থেকেই উনি অনুভব করেছেন তুমি তাঁর নতুন বন্ধন হয়েই এসেছ।'

'বন্ধন?'

'হ্যাঁ অঞ্জু, তিনি তোমাকে তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের বন্ধন হিসেবে ভাবতে ভালোবাসছেন। ওঁর কেউ নেই। স্ত্রী মারা যান অল্প বয়সে, একটি মেয়ে ছিলো, সেও সাত বছর বয়সে মারা যায়। তারপর থেকেই এই একক জীবন। কে জানে হয়তো তোমার মধ্যে তিনি তাঁর মৃত মেয়ের প্রতিবিম্বই দেখতে পেয়েছেন।'

হতে পারে। চিন্তা করলো অঞ্জলি, মাস্টার মশায়ের স্থির একাগ্র দৃষ্টির হয়তো সেটাই কারণ। কিন্তু তবু যে কোথায় খুঁতখুঁত করতে লাগলো তার মন কে জানে। আস্তে বললো, 'সীতেশদা, তবু

কারো কাছ থেকে অকারণ সাহায্য নিতে আমার ভালো লাগে না। জানো তো আমি জন্ম কাঙাল। আমার তো প্রতিদান দেবার কিছু নেই। হয়তো তাই এই সংকোচ।'

'প্রতিদান দেবার নেই কেন? শ্রদ্ধা সাহচর্য ভালোবাসা — এর বুঝি কোনো মূল্য নেই! ঋণ কি কেবল মানুষ টাকার অঙ্কেই শোধ করে? ওঁর মতো মানুষের কাছে অন্তত তার কোনো দাম নেই।'

'তা হলে কি আমি বা তুমি এই স্টাইপেন্ড বিষয়ে চুপ করেই থাকবো?'

'মনে হয় সেটাই শোভন। উনি যখন কিছু বলছেন না, তখন গায়ে পড়ে এসব জিজ্ঞাসাবাদে অসম্মানিত হতে পারেন।'

'আরো একটা কথা।'

'কী?'

'আমাকে একটা ঘড়ি উপহার দিয়েছেন, বেশ দামি ঘড়ি।'

'রিস্টওয়াচ?'

'হ্যাঁ।'

'কই দেখি?'

'আমি আনিনি।'

'কী বললে?'

'বলিনি কিছু, কিন্তু আনিওনি।'

'উনি কী বললেন? মানে কেন দিলেন?'

বললেন, 'ঠিক এই তারিখেই এক বছর আগে পরিচয় হয়েছিল, তারই স্মরণচিহ্ন।'

'সত্যিই উনি তোমাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন।'

'কিন্তু আমার ভালো লাগছে না।'

'ভালোবেসে দিলে ভালো লাগে না?'

'না।'

'ভালোবাসা কি তুমি এতো বেশি পেয়েছ অঞ্জু, যে ফেলে ছড়িয়ে তা নষ্ট করা যায়?'

'শুধু তাই নয়, এক বছরের জন্য ''ভারতবর্ষের'' গ্রাহক করে দিয়েছেন।'

'ব্রিলিয়েন্ট। একেবারে পুষ্যিকন্যা হয়ে গেছ দেখতে পাচ্ছি।'

'কিন্তু বাড়িতে মা-বাবার কাছে এ সব উপহারের আমি কী কৈফিয়ত দেব?'

মা শব্দটা বহুকাল পরে উচ্চারণ করলো অঞ্জলি। মনোরমাকে সে জীবনেও মা বলে ডাকেনি, ডাকার কথা চিন্তায় আনাও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। মনে মনে যখনই তাঁর সম্পর্কে কোনো কথা ভেবেছে, কেনো গুরুজন, প্রিয়জন বা আত্মীয় হিসেবে ভাবতেও অনিচ্ছা হয়েছে। মনোরমা তার কাছে মনোরমাই মাত্র, শুধুই একটা নাম। একটা অপ্রিয় শব্দসমন্বয়। হঠাৎ মা শব্দটা উচ্চারণ করে নিজের কানকেই তার বিশ্বাস হল না।

সীতেশও খেয়াল করে বলল, 'তুমি বোধ হয় এক যুগ পরে এই শব্দটা উচ্চারণ করলে, না?'

অঞ্জলি অন্যদিকে তাকিয়ে রইল. শব্দটা এখনো তার কাছে একটা দুঃসহ বেদনার প্রতীক মাত্র।

সে এখনো ভুলতে পারেনি তার একজন মা ছিল, যে মা তাকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

'তুমি ভেবে দ্যাখো, ব্যাপারটা কী আশ্চর্য।' অন্য এক ব্যাখ্যা করল সীতেশ, 'এই মাস্টার মশায় তোমার মনের অচৈতন্যে তোমার মায়ের মতোই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর আসনে বসে আছেন। সেজন্যও এতদিন পরে তাঁর প্রসঙ্গেই তুমি মা শব্দটা উচ্চারণ করলে।'

এবার ঠাট্টা করল অঞ্জলি, 'বাব্বা, এ দেখছি মহা মনস্তত্ত্ববিদ। তোমার গুরুভক্তি সত্যি অচলা।'

'তোমারও অচলা হবে। আমি সত্যি বলছি, অঞ্জু, আমি এখন খুব নিশ্চিন্ত তোমাকে নিয়ে। মাস্টার মশায় ঠিকই তোমার সঙ্গে তাঁর কন্যার মতো ব্যবহার করছেন। মানসকন্যা।'

মনের আকাশ তবু পরিষ্কার হয় না অঞ্জলির, সীতেশের সহজ সমাধান তবু তাকে নিঃসংকোচ ক'রে তোলে না। আর তার কিন্তু কিন্তু ভাব দেখে এবার সীতেশ রাগ করে, গম্ভীরভাবে বলে, নিজেকে ছোটো করে দেখো না, তা হলেই বুঝবে যা পাচ্ছো, তা তোমার যোগ্যতারই পুরস্কার।'

'আমার যোগ্যতা!'

'নয় কেন?'

'আমার অস্তিত্বের কোনো মূল্য নেই।'

'তার মানে তুমি নিতান্ত মূঢ়,' চটে যায় সীতেশ, 'এত পেয়েও পাবার অর্থ বোধগম্য হচ্ছে না। সুদর্শনের মতো স্বামী পাচ্ছো, ডক্টর যোগেশ্বর সরকারের মতো গুরু পাচ্ছো—'

'সবচেয়ে বড়ো পাওনাটা বলছ না কেন? হেসে লঘু করল আলোচনাটা, 'যে তোমার মতো দাদা পেয়েছে তার আর জগতে পাবার বাকি আছে কী?'

'থাক, থাক, আর বেশি বলতে হবে না। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। ওঠো, চায়ের আয়োজন করো, মনোরমা দেবীর বোধহয় ঘুম ভাঙলো।'

'ও মা তাই তো। চারটে বেজে গেল এর মধ্যেই?'

'আর পাঁচটা বাজতেই তো তোমার শ্যামের বাঁশি বেজে উঠবে। আজ কোথায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট?'

'আহা, কী রসিকতা!'

হাসিমুখে রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অঞ্জলি। তাকিয়ে দেখে মনোরমাও ঘুম ভেঙে উঠে আসছেন।

॥ ১৯ ॥

ক'দিন থেকে মাস্টারমশায় কেন যে এতো রেগে ছিলেন কে জানে। মাঝে ছোট্ট একটা পরীক্ষা গেল। তাই নিয়েই কী হই-চই। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'শোনো, এরকম করলে চলবে না। আরো ভালোভাবে পড়াশুনো করতে হবে। যদি এখন থেকেই চেষ্টা না করো, তবে কিছু হবে না বলে দিচ্ছি।'

'আমি তো পড়ি।' অঞ্জলি নম্র গলায় জবাব দেয়।

'একে পড়া বলে না। দায়সারা গোছের দু'দিন করে আসো আর ফিরে যাও, চারদিন আসা উচিত তোমার।'

'চারদিন?'

'এবং অস্থিরচিত্ত হয়ে থাকলে চলবে না।'

হঠাৎ অঞ্জলির বুক কেঁপে ওঠে। তার মনে হয় মাস্টারমশায় কি সুদর্শনকে ঠেস দিয়ে কথাটা বলছেন নাকি? কিন্তু মাস্টার-মশায়ের তো সে কথা জানবার কথা নয়। তিনি তো কখনোই দেখেননি তাকে, কখনো শোনেননি কিছু। না কি দেখেছেন কোথাও ঘোরাঘুরি করতে? কানাঘুষো শুনেছেন?

'আমি সীতেশকেও বলবো, বোনকে নিয়ে আড্ডা না দিয়ে একটু পড়তে অবসর দাও।'

তাহলে সীতেশদার প্রতিই এই কটাক্ষ? একটু আশ্বস্ত বোধ করে অঞ্জলি, কিন্তু তারপরেই আবার মনটা খারাপ হয়ে যায়। সীতেশদা বিষয়ে এরকম দোষারোপ তার ভালো লাগে না।

তাকিয়ে থেকে আবার বলেন, 'সীতেশ তোমাকে খুব ভালোবাসে, না?'

আপ্লুত হয়ে অঞ্জলি বলে, 'খুব। আমার জীবনের যা-কিছু ভালো সবই সীতেশদার জন্য।'

'তাই নাকি?'

অঞ্জলি কথার সুরে মুখ তুলে তাকায়, মনে হয় তিনি যেন বিদ্রূপ করলেন। কিন্তু না, মুখ তাঁর কঠিন, গম্ভীর, চিরাচরিতভাবে বইয়ের পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ।

অনেক সময় বলেন, 'চা খাবে?' ব্যস্ত হয়ে অঞ্জলি বলে, 'না-না, আমি তো বেশি চা খাই না।'

'কিন্তু আমি খাই।'

'ও,' অঞ্জলি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ওঠে। তিনি হুকুমের গলায় বলেন, 'নিজে না খাও আমাকে এক কাপ করে দাও। ইলেকট্রিক কেটলি ঠিক নেই, ছোকরাটা বিশ্রী চা করে, রান্নাঘরে গিয়ে ভালো করে জলটা ফুটিয়ে নাও।'

তাড়াতাড়ি পড়া ফেলে উঠে যায় অঞ্জলি, জল বসিয়ে দেয় ক্ষিপ্র হস্তে, গুছিয়ে নেয় সব, নিয়ে

আসে সাজিয়ে। চুমুক দিয়ে মাস্টারমশায় বলেন, 'আঃ! চমৎকার।'

আর এইটুকুতেই আবার খুশি হয়ে ওঠে অঞ্জলি, তার মমতা হয় একা মানুষটির জন্য।

কিছুদিন আগে মাসের প্রথমে বললেন, 'আমি আজ মাইনে পেয়েছি, তোমার কি কোনো টাকার দরকার আছে?'

সংকুচিত হয়ে অঞ্জলি বললো, 'না তো।'

'বালিশের তলায় চাবি আছে, যাও, আলমারি খুলে ব্যাগটা নিয়ে এসো।' মাস্টারমশায়ের ভারি গলার আদেশের সুর।

অঞ্জলি ভিতু গলায় বলে, 'ব্যাগ? মানিব্যাগ?'

'হ্যাঁ। বাঁ দিকের দেরাজে পাবে, যাও।'

উঠতেই হয় অঞ্জলিকে, যেতে হয় শোবার ঘরে, কড়া চুরুটের গন্ধমাখা বালিশের তলায় হাত ডুবিয়ে বার করতে হয় চাবি, অধিকারিণীর মতো আলমারি খুলতে হয় তারপর। বাঁ-দিকের দেরাজের অসংখ্য খুচরো জিনিসের মাঝখান থেকে ব্যাগটাও নিয়ে আসতে হয়।

একগাদা নোট থেকে দু'তিনখানা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরেন তিনি, জলদগম্ভীর গলায় বলেন, 'এই নাও, রেখে দাও তোমার কাছে।'

'আমার কাছে! আমি কী করবো?'

'টাকার অনেক দরকার। আমি চাই না তুমি সে বিষয়ে কোনো কষ্ট পাও।'

'কিন্তু—'

'আমার কাছ থেকে নিতে তোমার কিন্তুর প্রশ্ন নেই কোনো।'

খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি অঞ্জলির হাতব্যাগ খুলে ভরে দেন টাকাটা। অঞ্জলি ভেবে পায় না এর পর তার কী করা উচিত। সে আরক্ত মুখে দাগ কাটতে থাকে খাতার পাতায়।

সীতেশ বলে, 'মাস্টারমশায় ওরকমই। কতো ছাত্রকেই কতো সাহায্য করেন, আর তুমি তো তুমিই।'

অঞ্জলি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'না সীতেশদা, আমি এ ধরনের সাহায্য চাই না।'

সীতেশ হাসে, 'তুমি কেন চাইবে? কিন্তু যিনি দিচ্ছেন তাঁকেও তুমি বিরত করবার কেউ নও, এতেই তাঁর তৃপ্তি। এ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করবে কেন?'

'তুমি বুঝতে পারছো না, এসব থেকেই আমি কেমন একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছি, সেটা আমার ভালো লাগছে না।'

'কিসের বাধ্যবাধকতা?'

'বোঝো, না? এই স্টাইপেন্ডের ব্যাপারটাই আমার মধ্যে একটা কাঁটা হয়ে ফুটে আছে। জেনে শুনে মনকে চোখ ঠার দিয়ে চুপ করে বসে আছি, তার উপর এসব টাকাকড়ি দেওয়া— না না, আমার খুব খারাপ লাগছে।'

এবার গম্ভীর হয় সীতেশ 'কী আশ্চর্য! তুমি কেন কিছুতেই মাস্টারমশায়ের সঙ্গে সহজ হতে

পারছো না বলো তো? উনি যদি তোমার আত্মীয় হতেন, ধরো আমার বাবাই যদি তোমার সব ভার গ্রহণ করতেন, তুমি কি এরকম করতে?'

'না।'

'তবে? কী দাঁড়াচ্ছে তাহলে? আত্মীয় হলেই তাকে ভালোবাসার অধিকারী হিসেবে গণ্য করা যায়, নইলে নয়। এই তো? না, এ বিষয়ে আমি তোমার বিপরীত মেরুর অধিবাসী। আমরা প্রবাসী মানুষ, রক্তের সম্পর্কই সম্পর্ক এই নীতিতে বিশ্বাস নিয়ে বড়ো হইনি। আমাদের কাছে সেটাই মূল্যবান একে অপরকে ভালোবেসে যা দেয়। হোক তা টাকা বা মাটির ঢেলা।'

সীতেশ অঞ্জলির ভ্রাতা দাতা গুরু — সব। তার কথার উপরে আর কথা কী? তার যুক্তির উপরেই বা কী যুক্তি আছে? চুপ করে থাকে অঞ্জলি।

মাস্টারমশায়ের স্বাস্থ্য অসাধারণ ভালো ছিল, বলতে গেলে অসুখবিসুখ তাঁর করতোই না। অন্তত এই দেড় বছরের মধ্যে অঞ্জলি তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখেনি। হয়তো সামান্য মাথাধরা, তাও চোখের জন্য, নয়তো ছোটোখাটো সর্দি-কাশি এই পর্যন্ত। কিন্তু এই রকম সময়ে খুব মেজাজ মর্জি করতেন তিনি। পড়তে এলেই রেগে রেগে বলতেন, 'যাও, একগ্লাস জল নিয়ে এসো।' অথবা 'দয়া করে একবার ছোকরাটাকে বলে এসো, আমি কিচ্ছু খাবো না, পারে তো এক বাটি স্যুপ করে রাখে যেন।' অথবা 'এতো দেরি করে এলে কেন? জানো না আমার শরীর খারাপ হয়েছে?'

অঞ্জলি সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এটা-ওটা করতো, খাবারের বন্দোবস্ত করতো, ব্যস্তভাবে দেখাতো, তবুও মাস্টারমশায়ের মুখ থেকে অভিযোগের চেহারাটা খসে পড়তো না। মনে হতো তার এই অসুখবিসুখ অযত্ন একা-জীবন, সব কিছুর জন্যই যেন তিনি তাকে দায়ী করছেন।

তিনি নিজেই অসাধারণ গুছোনো পরিপাটি মানুষ ছিলেন কিন্তু তবু মাঝে মাঝে তাকে দিয়ে গুছিয়ে নিতেন টেবিল, বলতেন, ছোকরাটাকে বলে একটু ভালো করে ঝাঁটপাট দেওয়াও তো আজ। ঘরে দুয়ারে হেঁটে চলে একটি মেয়ে কাজ করছে দেখেতে কতো ভালো লাগে।'

পড়া ফেলে আলাপ করতেন অনেক সময়, 'আই এ পাস করে কী করবে?'

অঞ্জলি বলতো, 'কী জানি।'

'কী জানি কেন? ভাবোনি কিছু?'

'আমার অবস্থায় কিছুই সঠিক করে ভাববার নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে। তুমি চাইলেই আছে।'

'আমি স্বাধীন নই।'

'বিয়ে করতে চাও?'

'বিয়ে !' অঞ্জলি চকিত হতো। আবার মনে হতো সুদর্শনের কথা বুঝি জেনে গেছেন তিনি।

মাস্টারমশায় তাকিয়ে থেকে স্বগতোক্তির মতো বলতেন, 'বড্ড ছেলেমানুষ। বড্ড কম বয়েস।' তারপরেই নড়েচড়ে বসে বলতেন, 'সীতেশ তোমার কীরকম আত্মীয়?'

'আমার মামাতো ভাই।'

'মামাতো ভাই? কীরকম মামা?'

'আপন মামা।

'তা —' একটু থেমে, 'দক্ষিণ ভারতে মামাকে বিয়ে করা একটা মস্ত ব্যাপার জানো তো?'

'না।'

'সেই হিসেবে মামাতো ভাই তো নেহাতই দূরের সম্পর্ক।' অঞ্জলির ভুরু একথা থেকেই এক হয়ে যেতো, মাথা নিচু করে বলতো, 'কতো দেশে কতো নিয়ম তা জেনে আমার কী হবে? সীতেশদা আমার সবচেয়ে বড়ো আত্মীয়, সবচেয়ে কাছের মানুষ।'

'হ্যাঁ।' নিঃশব্দে হাসতেন, 'তা কি আর জানি না? চোখেই তো দেখছি। থাকগে, বই খোলো।'

অঞ্জলি বই খুলতো, কিন্তু মনটা ভার হয়ে উঠতো। তার মনে হতো সীতেশ সম্পর্কে ডক্টর সরকারের কোথায় যেন একটা বৈরী ভাব। একটা অসন্তুষ্টি। তবে কি তিনি তাদের ভাইবোনের এতটা ঘনিষ্ঠতায় বিশ্বাসী নন? এই ভালোবাসাকে তিনি কি সন্দেহের চোখে দেখেন?

একদিন বললেন, 'সীতেশ যদিও তোমার ভাই নয়, তবু তাকে তোমার আত্মীয়ের পর্যায়ে ফেলা যায়, কী বলো?'

আবার এই সীতেশ প্রসঙ্গ। বিরক্ত হয়ে সে চুপ করে থাকলো।

একটু ভেবে বললেন, 'কিন্তু সেই তুলনায় তোমার উপর ওর দাবি অথবা প্রভাব, অথবা প্রতাপ বেশ একটু বেশি।'

অঞ্জলি মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে বললো, 'দাবি তো নিশ্চয়ই, প্রভাবও সত্য, কিন্তু সীতেশদা কখনো আমার উপর কোনো প্রতাপ খাটান না। সেটা ওঁর স্বভাব নয়।'

উনি বইয়ের পাতা উল্টোতে উল্টোতে বললেন, ' ও, তাহলে সেটা বুঝি তুমি খাটাও?'

'আমি! আমিই বা কেন খাটাবো।'

'তোমাদের আচার-আচরণ অনেকটা সেইরকমই কিনা।' তিনি ঘন ঘন চুরুট কামড়াচ্ছিলেন। অঞ্জলির মুখের উপর দৃষ্টিটা তীব্র আলোর মতো ফেলে রেখেছিলেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'তোমাদের দেখলে কখনোই ভাইবোন মনে হয় না।'

'কী মনে হয়?' ছেলেবেলাকার মতো একটা কঠিন জেদে শক্ত হয়ে ওঠে অঞ্জলি।

'বলছিলাম, ছাত্রজীবনে লেখাপড়াটাকেই তোমার একমাত্র শ্রেয় জ্ঞান করা উচিত। এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে বাচালতা কিছু কাজের কথা নয়।'

মাস্টারের মতোই এই তিরস্কার। বলার কিছু নেই। তবু অঞ্জলির কান গরম হয়, পড়ার বইয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চোখ জ্বালা করে।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় মাস্টারমশায়ের বাড়ির একতলার প্রবেশ পথের মুখে দাঁড়িয়ে সীতেশদার সঙ্গে আজ সে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল। তারা তিনজন — সুদর্শন, সে আর সীতেশ। প্রথমে গিয়েছিল নিউমার্কেটে কিছু জিনিসপত্র কিনতে, তারপর মার্কেট থেকে বেরিয়ে চা খেলো একটা রেস্তোরাঁয়, তারপর সুদর্শন চলে গেল অন্য কী এক জরুরি কাজে, সীতেশ তাকে নিয়ে মাস্টারমশায়ের এখানে এলো। ভেবেছিল উপরেই উঠে আসবে, তারপর আর এলো না। বলল, 'তুমিই যাও, হাজিরা দিয়ে এসো গিয়ে, নইলে চটে যাবেন। আমি আর একদিন সময়মতো এক আসব।'

|| ২০ ||

সীতেশদা যতোই বলুন, মাস্টার মশায়ের ভাবস্বভাব অনেক সময়ে তার যেন কেমন রহস্যজনক বলে মনে হতো। অনেক কথার অর্থই যেন বোধগম্য হতো না। তিনি যে তাকে ভালোবাসেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কী সুন্দর পড়ান, কতো আগ্রহ প্রকাশ করেন তাকে শ্রেষ্ঠ ছাত্রী হিসেবে যোগ্য করে তোলার জন্য। সত্যি বলতে যতোটুকু পড়াশুনো সে করে ঐ মাস্টারমশায়ের চাপে পড়েই। নইলে বাড়িতে তার সময় কোথায়? এখন আর ভোর পাঁচটায় উঠে পড়ার কথা ভাবা যায় না। সুধাগঞ্জের জীবন আর কলকাতার জীবন সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। সন্ধের পর লণ্ঠনের আলোতে কেউ বেশিক্ষণ জেগে থাকার কথা ভাবতো না সুধাগঞ্জে। সুধাগঞ্জের প্রাণস্পন্দন সূর্যের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অস্তমিত হয়ে যেতো। তারপর আর কী? খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়া। আর শুয়ে পড়লে ঘুমই বা আসবে না কেন? আর অত সকালে ঘুমুলে ঘুমের আয়ুও অত সকালেই ফুরিয়ে যায়। সুতরাং ভোরে উঠতে ভালো লাগতো, ভোরের শিশির, ভোরের ফুল, ভোরের সূর্য সব কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকতো হৃদয়। না উঠতে পারলেই মন খারাপ, শরীর খারাপ।

কলকাতা এসেও অনেকদিন পর্যন্ত সেই অভ্যাসই ছিল, সেই সময়টুকু ছাড়া নিজস্ব কোনো সময়ও ছিল না। আস্তে আস্তে কখন তা ঝরে গেছে। এখন রাত দশটার আগে খাওয়া হয় না, বাচ্চারা পর্যন্ত জেগে থাকে। কতোদিন মনোরমা তাঁর মায়ের কাছে শ্যামবাজারে যান, রাত হয়ে যায় ফিরতে ফিরতে। বাবা কার সঙ্গে কোথায় কোথায় দেখা করতে যান, এমন কি টুকুটাও বন্ধুর বাড়ি যাওয়া ধরেছে।

শুতে শুতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। কাজেই অত ভোরে ঘুম ভাঙতে চায় না। আর সেজন্য ভোর পাঁচটার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পবিত্র হাওয়ায় পাইচারি করে পড়ার সুখ কল্পনা মাত্র।

তার উপর অন্য কাজ বেড়েছে, টুকু নন্টুকে পড়ানো। মনোরমা যদিও পনেরো বছর মাস্টারি করেছেন, তবু তাঁর ধৈর্য নামে কোনো পদার্থ নেই স্বভাবে। তাঁর পড়তে বসানো মানেই চিৎকার চ্যাঁচামেচি এবং উত্তম-মধ্যম। টুকু নন্টু দু'জনেই মায়ের ভয়ে চোর হয়ে থাকে, দিদির কাছে পড়তে চায়। সকালবেলাটা একটা ঝড়ের বেগে কেটে যায়। ঠিকে ঝি এসে বাসন মাজে ঘষঘষ করে, সাত তাড়াতাড়ি জল তুলে মশলা পিষে উনুন ধরিয়ে চলে যায়। মনোরমা চা করেন, অঞ্জলি খাবার পরিবেশন করে। তার মধ্যে বায়না করে বাচ্চারা, ছোটো দুজন পা ছড়িয়ে কাঁদে, বড়ো দু'জন মারামারি করে, ঘরে ঘরে বাসিগন্ধ বিছানার গন্ধমাদন, অপরিচ্ছন্ন মেঝেতে ডাঁই-করা আধা-ভেজা কাপড়, এ সবের সংস্কার করতে করতেই বাবা ঊর্ধ্বশ্বাসে স্নান করতে ছোটেন। স্নান অবশ্য পর পর সকলকেই করতে হয়। কর্পোরেশনের জল, দশটা বাজতেই শেষ— তারই মধ্যে যা পারো যতোটুকু পারো সেরে নাও।

কোনোমতে ঝোল ভাত নামিয়ে ঘরে এসে মনোরমা হাঁপাতে থাকেন, মাথার উপর ভাড়া কর পাখাটা ঝকরঝকর শব্দ করে ঘুরতে থাকে, তবু তিনি দরদর করে ঘামেন। শরীরটা সত্যিই ভালো ছিল না তখন।

বাকি রান্না শেষ করে বাবাকে খাবার দিয়ে টুকু নণ্টুকে স্কুলে পাঠিয়ে তবে তার নিজের আয়োজন।

এ অবস্থার মধ্যে বই খোলার কথা ভাবা যায় না। নিয়ম করে মাস্টারমশায়ের কাছে যাওয়াটা সেদিক থেকে আশীর্বাদ। তাছাড়া বছরের গোড়া থেকেই এমন একজন প্রোফেসরের সাগ্রহ সাহায্য যে কোনো ছাত্রছাত্রীর পক্ষেই স্বপ্ন।

কিন্তু গেলেই কোনো কোনোদিন আচমকা তিনি এমন সব প্রশ্ন তোলেন, যার কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পায় না অঞ্জলি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই সীতেশের কথা।

পড়াতে পড়াতে হঠাৎ একদিন থেমে বললেন, 'শুনেছিলাম সীতেশ বিলেত যাচ্ছে, তার কী হ'লো?'

অঞ্জলি বলল, 'যাবে।'

'কবে?'

'আমার মামার শরীর খুব খারাপ, তিনি একটু সুস্থ না হলে যেতে সাহস পাচ্ছে না।'

'তার মানে সে কবে যাবে সেটা তার ইচ্ছাধীন?'

'অনেকটা তাই। চাকরি তো নয়, কাজ শিখতে যাচ্ছে।'

'মাইনে পাবে না?'

'অ্যালাউন্স পাবে, সেটা বেশ ভাল। নিজের খরচ রেখেও বাড়িতে পাঠাতে পারবে।'

'তখন তুমি কী করছো?'

'আমি?'

'আমার কাছে একদিন এসেছিল সীতেশ, বলছিল, তার যাবার আগে তোমার বিয়ে হলে সে নিশ্চিন্ত হতো।'

বুকের মধ্যে ধক করে উঠলো। তা হলে সীতেশদা এসে সুদর্শনের কথা বলে গেছে মাস্টারমশায়ের কাছে। কী অন্যায়। কবে কী হবে ঠিক নেই, আন্দাজেই এসব—

'তোমার কী ইচ্ছে।'

'আমার?' জিব দিয়ে ঠোঁট ভেজালো সে।

'নিশ্চয়ই তোমারও তাই ইচ্ছে?'

'না।'

'না? আমি তো অন্য রকম ভেবেছিলাম।'

কী ভেবেছিলেন সেটা অঞ্জলির জিজ্ঞেস করার কথা নয়।

সে চুপ করে ছিল। মাস্টারমশায় নিজের গরজেই বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়েই সে বিলেত যেতে চায়, তাই এই অপেক্ষা।'

এবার অঞ্জলির বোধগম্য হলো ব্যাপারটা। মুখের চামড়া টান হলো।

মাস্টারমশায় বোধহয় জবাবের অপেক্ষাতেই তাকিয়ে ছিলেন মুখেব দিকে, মাথা নিচু করে বলল, 'আপনি কী বলতে চান, আমি অনেক সময়েই ঠিক বুঝতে পারি না, তাছাড়া এ ধরনের অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তাও আমার ভাল লাগে না।'

'বুঝতে পারো না, না?' মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে তিনি জল খেলেন, আস্তে বললেন, 'না বুঝতে চাইলে কি আর বোঝানো যায়?'

তারপরেই পড়াতে আরম্ভ করলেন এবং স্বভাব-অনুযায়ী তাতে নিবিষ্টও হলেন। কিন্তু মানসিকভাবে বোধহয় বেশিই চঞ্চল ছিলেন, বারে বারেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন, খানিকক্ষণ বাদে গম্ভীর গলায় বললেন, 'কী ধরনের বিয়ে হলে তুমি সুখী হও অঞ্জলি?'

অঞ্জলি বলল, 'আমি সেসব ভাবছি না।'

'ভাবছো না?'

'না।'

'কেন?'

'আমার বাৎসরিক পরীক্ষার বেশি দেরি নেই, আপনি বরং সে বিষয়ে সাহায্য করুন।'

'ও, হ্যাঁ।' হঠাৎ লজ্জিত হয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি পড়াতে লাগলেন।

।। ২১ ।।

এদিকে হঠাৎ খুব অপ্রত্যাশিতভাবে যাওয়া পিছিয়ে গেল সুদর্শনের। যাচ্ছিল সে শীতেব কাছাকাছি অন্য একজন মাস্টারের বদলে, যাওয়ার অল্প আগে খবর এলো অনিবার্য কারণে সেই মাস্টার তাঁর ছুটি বসন্তকাল পর্যন্ত স্থগিত রেখেছেন। এই পাঁচ মাস অপেক্ষা করতে রাজি আছে কি না সুদর্শন। তা আর নেই!

ফূর্তিতে সে একেবারে টগবগ করছিল, 'এই, শোনো আমি যাচ্ছি না।'

'যাচ্ছ না?' অঞ্জলির বুকের ভিতরটা লাফিয়ে উঠেছিল আশায়। 'সত্যি?'

'সত্যি।'

'কী হলো?'

অঞ্জলি ভেবেছিল, বিদেশ ছেড়ে দেশেই বুঝি সে কোনো অন্য চাকরি জোগাড় কবে নিল শেষ পর্যন্ত। সুদর্শন দূরে যাবে না, কাছেই থাকবে এই স্বার্থপর কারণে তার আবাব এমন একটা সম্মানেব সুযোগ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিল বলে দুঃখও হচ্ছিল।

সুদর্শন প্রায়ই সীতেশদার কাছে খবর নিত, 'আচ্ছা সীতেশ, বেশ মোটামুটি ফ্ল্যাটের ভাড়া কী রকম হয় বলো তো?'

সীতেশদা বলত, 'মোটামুটি বলতে তুমি কী রকম বোঝো? সকলের মোটামুটি তো আর একরকম হয় না?'

সুদর্শন বলত, 'কী আর! এই ধর খান চার-পাঁচ ঘর, দুটো বাথরুম, খোলা বারান্দা, একতলা হলে সামান্য বাগান—'

সীতেশদা হাসত, বলত, 'কোন পাড়ায়?'

'এই এলগিন রোডেও হতে পারে, পার্ক স্ট্রিটেও হতে পারে, ওদিকে তোমার হরিশ মুখার্জি বা ল্যানসডাউনটাও মন্দ নয়—'

বলাই বাহুল্য, সেই সময়ে বালিগঞ্জের কোনো বোলবোলাও ছিল না, সে তখন গজাচ্ছে। পার্ক স্ট্রিট এলগিন রোড ছাড়িয়ে ভবানীপুর অঞ্চলই পুরো আধুনিক। আর তার মধ্যে সবচেয়ে দু'টি বড়োমানুষ রাস্তা এই হরিশ মুখার্জি আর ল্যান্সডাউন।

সীতেশদা তাকিয়ে থেকে বলতো, 'এই তোমার মোটামুটি, না?' থতমত খেয়ে সুদর্শন বলত, 'বেশি বলেছি?'

'একটু-ও না।' সীতেশদা মাথা নাড়তো, 'একশো-দেড়শো হলে পেতে পার।'

'বাড়ি ভাড়া এতো?'

'তাই তো শুনেছি।'

'তা হলে কতো মাইনে পেলে দু'জনের খরচ মিটিয়ে অত ভাড়া দেওয়া যায়?'

'শো পাঁচেক।'

'ছ'-সাতশো, না?'

'হ্যাঁ।'

সুদর্শন চিন্তা করতো চুপ করে। অনেক পরে বলতো, 'আই-সি-এসটা দিয়ে দিলে হতো। কী বলো?'

'মন্দ কী!'

'যাকগে, বরং বিদেশ-ফেরতাই হয়ে আসি। ডিগ্রির ল্যাজ পিছনে থাকলে একটা কিছু হয়ে যাবে।'

দেড়শো টাকা বাড়ি ভাড়া, পাঁচশো টাকা মাইনে, এসব সংখ্যা তখন এত অধিক ছিল যে এখনকার তুলনায় সেই দু'শো টাকা প্রায় পাঁচশো আর ছ-শো টাকা দেড় হাজারের কম নয়।

সুদর্শনের বাবা ডাক্তার হিসেবে অনেকখানি উঁচু ধাপে ছিলেন। লোকেরা তাঁকে বিধাতাপুরুষ বলতো। বলতো তিনি এসে দাঁড়ালে মরা মানুষও কথা কয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্নামও ছিল, অত্যন্ত বদরাগী এবং টাকাকড়ি বিষয়ে অত্যন্ত কড়া। রোগী মরে গেলেও ভিজিটটি তাঁর চাই। শুধু বাংলা দেশেই নয়, সারা ভারতবর্ষেই তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল, দু'একবার বিদেশেও ঘুরে এসেছেন। উপার্জনেরও কোনো সীমা ছিল না।

সুদর্শন তাঁরই একমাত্র সন্তান, যথাসম্ভব সুখেই লালিত পালিত, হয়তো বাবার কথামতো ডাক্তার হলে উপার্জনেরও কোনো সীমা থাকত না, সুতরাং সেই সুদর্শনের মোটামুটি জীবন

ধারণের ছকটা আর এর চেয়ে নিচে নামে কী করে?

অঞ্জলি বলত, 'এসব চিন্তা ছাড়ো তো। এমন একটা সুযোগ পেয়েছ, সম্মান পেয়েছ, এখন তোমাকে অন্য কথা ভাবতে হবে না।'

সুদর্শন বলত, 'আমার একটা অসুখ করলে কিন্তু বেশ হয়, না?'

'কী সব বাজে কথা।'

'তুমি অস্থির হবে, সেবা করবে, আমার যাওয়া হবে না—'

'আমি তা চাই না।'

'তুমি কী চাও?'

'আমি চাই তুমি বড়ো হও, অনেক, অনেক বড়ো। যা তুমি হতে চেয়েছ, ঠিক তাই।'

'অঞ্জু—'

'কী।'

'ভালোবাসা বোঝো?'

'না।'

'তবে এসো, একটু তালিম দিয়ে দি।'

হেসে ফেলে অঞ্জলি বলত, 'থাক, সে বিষয়ে তালিম না নিলেও চলবে আমার।'

'কিচ্ছু কঠিন না। তার জন্য তোমাকে বই-টাই কিচ্ছু পড়তে হবে না, একেবারে প্র্যাকটিকাল শিক্ষা—'

'ধ্যেৎ।'

'অবশ্য বলতে পার, বিদ্যালয় হিসেবে খুব উপযুক্ত স্থান নয় এটা,' সুদর্শন ধোঁয়ার রিং ছুড়ত আকাশে, চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলতো, 'তবে খুব সহজ সহজ দু'একটা বিদ্যা — দেব নাকি চট করে বুঝিয়ে? এই যেমন—' মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে আসতো সে। 'এ মা এ কী।' বলে অঞ্জলি সভয়ে সরে বসত।

'কেন? কী হয়েছে? আমারই তো বউ।' অগত্যা হাতের উপর হাত রেখে হাসত সুদর্শন।

তারপর হঠাৎ মন খারাপ করে বলত, 'মায়েরা এরকম চটপট চলে যায় কেন বল তো?'

সেটা তো অঞ্জলিরও প্রশ্ন। ম্লান মুখে সে তাকিয়ে থাকতো দূরের দিকে। সুদর্শন বলত, 'বাবাদের বুদ্ধি পরামর্শ দেবার কেউ না থাকলে যে কী বিপদ হয় তা তো জানেন না তাঁরা।' সে ঢিল ছুড়তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পুকুরে, ছোট্ট তরঙ্গ উঠে মিলিয়ে যেতো আস্তে আস্তে, আবার ঢিল কুড়োতে কুড়োতে বলত, 'মেয়েরা হচ্ছে মাটি, বুঝলে? আর পুরুষেরা হচ্ছে গাছ। বৃক্ষই বলো আর পায়ের তলার ঘাসই বলো, সবের আশ্রয়ই ঐ মাটি, সরে গেলে পুরুষের আর থাকে কী? সেবার সেই যে লেকের ধারে একটা ঝড় হয়ে গেল, বড়ো বড়ো গাছগুলো কেমন মাটি থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে শিকড়বাকড় শুদ্ধু উপড়ে পড়ে গেল লম্বা হয়ে, কোথায় বা রইল তার রং রস প্রাণ পাতা শাখা আর ডালে-ডালে পাখির আশ্রয়। এক একটা মহীরুহ দৈত্যের মতো শরীর নিয়ে কী অনর্থক হয়ে পড়ে রইল। দেখতেও কষ্ট হচ্ছিল। অথচ একদিন এই গাছেরা মাথা উঁচু

করে কতো দাপাদাপিই না করেছে। যেন যুদ্ধ করবে আকাশের সঙ্গে। ডালপাতা বিস্তারের কী অহংকার। সব এক নিমেষে ধূলিসাৎ। কী? না মাটি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তাঁরা।'

ব্যাখ্যা শুনে চোখের কোলে হাসল অঞ্জলি, 'যাক, মেয়েদের তা হলে তুমি নরকের দ্বার বলছ না?'

'নরকের দ্বারই বটে। মা চলে গিয়ে বাড়ির যা হাল হয়েছে না, বাবা তো বরাবর এরকম দাম্ভিক, রাগী, স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু মা থাকতে একটা আচ্ছাদন ছিল। বাবার দোষ মা তাঁর নিজের দয়ামায়া সেবা-সান্ত্বনা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন, মায়ের আশ্রয়ে বাবা কখনো কি এরকম উগ্র হয়ে উঠতে পেরেছেন? কক্ষনো না। অঞ্জু, আমিও মাটি চাই, তোমাকে চাই। তোমাকে ছেড়ে আর আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।'

নির্দয় নিয়তির বঞ্চনায় আশৈশব অভ্যস্ত অঞ্জলি ভাগ্যের এই অকৃপণ দানে উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করে। তার চোখে সুখ আর ভয় একসঙ্গে ছায়া ফেলে। স্বপ্ন বলে ভ্রম হয়, মনে হয় ঘুম ভাঙলেই দেখবে সব মিথ্যা, সব অলীক। সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে তার বুক ভালোবাসায় ভেঙে যেতে চায়।

অনেক পরে বলে, 'সুদর্শন, আমাকে একবার তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন?'

'আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করবো।'

'আমার বাবার সঙ্গে?' এমনভাবে ভুরু কুঁচকোয় যেন ভারি উদ্বিগ্ন হয়েছে।

অঞ্জলি বলে, 'হ্যাঁ, দরকার আছে?'

'কী আশ্চর্য। কী দরকার? কী অসুখ করল আবার?'

'অসুখ?'

'তা না হলে ডাক্তারের কাছে যেতে চাইছ কেন?'

অঞ্জলি রেগে গিয়ে বলে, 'ভারি অসভ্য।' হাসতে থাকে সুদর্শন, নিজের ঠোঁট থেকে সিগারেটটা অঞ্জলির ঠোঁটে ছুঁইয়ে বলে, 'একটা টান দিয়ে দাও না।'

অঞ্জলিকে চুপ করে থাকতে দেখে অপরাধীর ভান করে, 'আচ্ছা, অসভ্যতা কী করলাম তুমিই বলো। আমার তো যদ্দুর ধারণা, ডক্টর রায়চৌধুরীর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই।'

'আলাপ তো কোনো না কোনোদিন কারো সঙ্গেই থাকে না, ডক্টর রায়চৌধুরীর ছেলের সঙ্গেও তো ছিল না।'

'তা বটে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে তুমি আলাপটা করবেই বা কেন?'

'সব কি তোমাকে বলতে হবে?'

'না, সব বলতে বলছি না, তবে এক্ষেত্রে আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ঘটকবিদায়টি তেমন সুবিধের হবে না।'

'কী?'

'ধরো তুমি গেলে, নিজের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে দেবার জন্য, অনেক খোসামোদ করলে—তারপর—'

'ফাজিল। যাও, তোমার সঙ্গে আমি কথা বলবো না।'

'লক্ষীটি—'

'তুমি ভীষণ ইয়ে—'

'সোনামণি—'

'সবটা নিয়ে কেবল ইয়ার্কি—'

'আমার মণিসোনা—'

'অঞ্জলি উঠে দাঁড়ায়, 'তোমার সঙ্গে আর অমি দেখাই করব না।'

'না করলে।' গাঢ় সন্ধ্যার গড়ের মাঠের বড়ো গাছের ছায়ার ঝুপসি অন্ধকারে সুদর্শনও উঠে দাঁড়ায় গা ঘেঁষে, তারপর হঠাৎ জড়িয়ে ধরে বলে, 'তুমি দেখা না করলে যে আমি করব না সে কথা তোমাকে কে বলেছে? আমি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিভুবন তোলপাড় করে ফেলতে পারি তোমার জন্য। তোমার জন্য সব পারি। সব। সব। সব।'

তুমি আমার জন্য সব পারো, না? এক ফোঁটা হাসি চমকালো অঞ্জলি দেবীর মুখে, ঘরটা অন্ধকার হয়ে এসেছে, উঠে গিয়ে আলোটা জ্বেলে দিলেন।

হিসেব করলে এখন তাঁর বয়েস ছেচল্লিশ, কিন্তু তার চেয়ে কম দেখায়। শরীরের গঠন যুবতীর মতো, কোথাও অতিরিক্ত মেদ নেই, ছিপছিপে একহারা চেহারা। রং এক সময় ফর্সা ছিল, এখন অযত্নে মলিন। ঠোঁটের বাঁকটা ভারি সুন্দর, হাসলে লাবণ্য ভেসে ওঠে, বড়ো বড়ো চোখে বিষাদ মাখা। ঝাঁপানো রুক্ষ চুলের ডৌল কপালের উপর একটি ত্রিকোণ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু চুল তিনি প্রায় আঁচড়ান না, হাতেই সাপটে টান করে পিছনে একটি আঁটো খোঁপা বেঁধে রাখেন। সব সময়েই মোছা মোছা পাড়ের শাদা শাড়ি পরেন, ব্লাউজও সাদা, সিঁথিতে দূরবীন দিয়ে দেখার মতো এক ছিটে সিঁদুর কখনো থাকে অথবা থাকে না, বাঁ হাতে সোনা-বাঁধানো লোহা আছে একটি, ডান হাতে ঘড়ি।

সিঁদুর নয়, ঐ লোহা দেখেই বোঝা যায় তিনি সধবা। আগে তাঁর ছেলে মাঝে-মাঝে টেনে খুলে দিয়ে বলতো, 'এটা ছাড়ো তো মা।'

তিনি চোখ নিচু করে অস্ফুট বলতেন, 'ছাড়বো।'

ছেলে নাছোড় হয়ে বলত, 'ছাড়বো না, এখনি ছাড়ো।'

নিশ্বাস ফেলে উঠে যেতে যেতে বলতেন, 'কি পাগলামি করিস!'

জেদি বালকের মতো ছেলেও সঙ্গে সঙ্গে এসে মুখোমুখি হতো, 'আমি ভেবে পাই না, তোমরা মেয়েরা এমন আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন কেন। এটা রেখে তুমি কী মোক্ষলাভ করছো?'

'সর, আমার কাজ আছে।' ছেলেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করতেন তিনি। কিন্তু সে নিরস্ত হতো না, রেগে গিয়ে বলত, 'যার জন্য কয়েদির মতো এই লোহার বালাটা তুমি ধারণ করে আছ, জিজ্ঞেস করতে পারি কি, সেই লোকটার সঙ্গে তোমার অপমান ছাড়া আর কোনো সম্পর্কের স্মৃতি অবশিষ্ট আছে কি না?'

ছেলের চোখে চোখে তাকিয়ে অঞ্জলি দেবী এবার একটু রাগ করতেন, 'লোকটা বলছো কেন? সম্মানের পাত্রকে অসম্মান করাতে গৌরব নেই কিছু।'

'লোক ছাড়া আবার কী?' গলায় জোর দিত ছেলে, 'আমাদের জীবনে সে একটা লোকই মাত্র. আর কিছু নয়।'

এর পর অঞ্জলি দেবী চুপ করে বসে থাকতেন, ভাবতেন। কী ভাবতেন জানেন না, সে ভাবনার কোন ধারাবাহিকতা থাকতো না। সবই তো এক নিস্তরঙ্গ পানাপুকুরের জল। হঠাৎ একটা ঢেউ উঠেছিল শুধু, তারপর আবার থেমে গেল সব।

কিন্তু সে সব এখন অতীত। এখন সে সব পুরন্দরের ষোলো-সতেরো বছর বয়সের খ্যাপামি মাত্র। লোহাটা এখনও তেমনিই আছে হাতে, শুধু ক্ষয়ে গেছে অনেকটা, অথচ আজ এতদিন বাদে কেমন ছবির আকার নিয়ে ফিরে এলো মানুষটা! কী আশ্চর্য।

তিনি আবার আলমারি খুলে শাড়ির ভাঁজ থেকে সন্তর্পণে বার করে আনলেন প্রতিকৃতির সুদর্শনকে, তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখ ভরে জল এলো, বললেন, 'না, পারো না, পারো না, তুমি পারোনি। বলা আর করা দু'টো এক হয়নি তোমার কাছে। তবু সুদর্শন, তবু এই মুহূর্তেও আমি তোমাকে তেমনিই ভালোবাসি।

।। ২২ ।।

আসল খবরটা জানা গেল অনেক পরে। অনেক পরে সুদর্শন বলল, 'আমার যাওয়া পেছিয়েছে।'

সীতেশদা বলল, 'হুরে! কদ্দিন?'

'আরো পাঁচমাস।'

'বা বা তোবা, তোবা, চলো সেলিব্রেট করা যাক।'

খুশি মুখে সুদর্শন বলে, 'আমি কী ঠিক করেছি জানো?'

'কী?'

'আমি আর আমার অসমাপ্ত ডিগ্রি শেষ করব না গিয়ে। এই চারমাসে এখানকারটা এখানেই শেষ করে যাব, ওখানে গিয়ে নতুন ভাবে কাজ শুরু করব।'

'এই ক' মাসে তোমার শেষ হবে নাকি?'

'হ্যাঁ, হবে। আমি অনেকটা এগিয়ে এসেছি। কিন্তু অঞ্জলি, তুমি কাল দুপুরে ক্লাস কাটবে।'

'কেন?'

'ভালো একটা ছবি এসেছে লাইটহাউসে, তোমার জন্য দেখা হচ্ছে না।'

সীতেশদা বলল, 'আর আমি?'

'তুমি আবার কী। তুমি তো যাবেই।'

'আপিস?'

'আপিস?'

'সেটা বোধহয় কনসিডার করতে পারো, না?' সীতেশদা চোখ টিপলো, 'বরং আপিসে আমার যাওয়াই ভালো, কী বলো? আপিস কি কেউ কামাই করে? সুতরাং নিরুপায় হয়ে একা অঞ্জুকে নিয়েই দিন কাটাবার প্ল্যানটা করতে হয়।'

সুদর্শন হা হা করে হাসতে লাগলো কথা শুনে। অঞ্জলি লজ্জা পেলো।

আচমকা এই অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে দিনগুলো যেন পাখি হয়ে গিয়েছিলো। সকাল-বিকেল দুপুর-রাত, প্রকৃতির সব অংশ যেন সমান সুন্দর হয়ে দেখা দিল অঞ্জলির কাছে। এমনকি মনোরমার জন্যও সে ভালোবাসা অনুভব করলো হৃদয়ে, ভাইবোনের জন্য স্নেহ। মনে হলো বাবাকে তার আরো একটু বেশি যত্ন করা উচিত।

কিছুটা আত্মহারা হয়ে পড়েছিলো। উন্মনা হয়ে পড়েছিলো। দিনের আর সব কাজ কচুরিপানার মতো ঠেলে কখন সন্ধ্যার অবসরে সে ডুব দেবে সুদর্শনের সান্নিধ্য-সমুদ্রে, এই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য।

মাস্টারমশায় ধমক দিলেন, 'হয়েছে কী তোমার? এর নাম পড়াশুনো? যাও, রান্নাঘরে ফিরে যাও, মেয়ে হয়ে জন্মেছ, সেটাই তোমাদের আসল জায়গা। পুরুষের বিদ্যা আয়ত্ত করা অন্তত তোমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

মাস্টারমশায়ের কটু কথায় আহত হয় অঞ্জলি, কিন্তু কিছু মনে করে না। তিনি তার প্রোফেসার, এ তো তাঁর নায্য অধিকার। তাছাড়া তিনি যা করেন, তা তো তার বাবা কখনো করেননি, তবে তাঁর ধমকেই বা অসম্মান কী?

তবু তার কষ্ট হয়, চোখের পাতা কাঁপে।

মাস্টারমশায় নরম হয়ে যান তক্ষুনি, মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমার কি খুব মন খারাপ?'

চোখ নিচু রেখে অঞ্জলি বলে, 'না তো।'

'মুখে না বলছ, কিন্তু তোমাকে দেখেই আমি বুঝতে পারি, কী যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে।'

'পরিবর্তন?'

'কেমন অর্ধমনস্ক, যেন সব সময়েই কী ভাবছ—'

'ন্না—'

'সীতেশ কবে যাচ্ছে?'

'কোথায়?'

'বিলেত যাবার কথা ছিল না?'

'ও। এখনো ঠিক হয়নি।'

'যাচ্ছে এটা তো ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'এবং তার খুব বেশি দেরিও নেই সেটাও ঠিক, কী বলো?'

'মনে হচ্ছে।'

'সেজন্যই বোধহয় ভালো করে কোনো কাজে তুমি মন দিতে পারছ না, না?'

তাকিয়ে থাকলো অঞ্জলি। আস্তে বলল, 'হতে পারে।'

'হতে পারে মানে?' মাস্টারমশায়ের ভারি খাদের গলা, আরো গভীর শোনালো, 'হতে পারে না, সেটাই আসল।' সুতীব্র দৃষ্টি তিনি স্থির করলেন মুখের উপর, বুকটা কেঁপে উঠল অঞ্জলির।

'তা হলে সেই ধ্যানই কর, পরীক্ষার প্রহসনে আর দরকার নেই। আর আমাকেই বা তা হলে মিছিমিছি খাটাচ্ছ কেন?' চুরুটটা ধরাতে প্রায় দশটা কাঠি খরচ করলেন তিনি, তবু ধরাতে পারলেন না।

'কী আশ্চর্য!' মুখ তুলে কিছু বলতে গিয়েও অঞ্জলি থেমে গেল। ভীষণ রাগ হলো তার, শক্ত মুখে বসে রইল গুম হয়ে।

খানিক বাদে মাস্টারমশায় পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে বললেন, 'আমার ভিতরে একটা অক্ষম আক্রোশ আছে অঞ্জলি, একটা জায়গায় আমি ভীষণভাবে হেরে আছি মনে হয়। আমার দোষ, আমি হারতে শিখিনি, মেনে নিতে শিখিনি, তাই অনেক সময়েই অনেক অন্যায় ব্যবহার করি। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

এবার চুরুটা ধরাতে পারেন। তাঁর মুখের রেখা কোমল দেখায়, কপালে জ্ঞানের আলো। অঞ্জলি তৎক্ষণাৎ ক্ষমার মন নিয়ে বিশ্লেষণ করে, তার মায়া হয় নিঃসঙ্গ হতভাগ্য মানুষটার জন্য। যদি ভদ্রলোকের মেয়েটিও বেঁচে থাকতো, অবলম্বন থাকতো একটা। সীতেশদা ঠিকই বলে। সত্যি যদি এমন হয়, তিনি তাকে সেই মৃত মেয়ের পরিপূরক হিসেবেই গ্রহণ করে থাকেন, তা হলে তো সবই মানায় তাঁকে। বাবারা সন্তানকে যে নিজের মতাদর্শ অনুসারে কত উত্ত্যক্ত করতে পারেন, তা কি অঞ্জলি জানে না? উনি যা বলেন তা তো আভাস ইঙ্গিত মাত্র, হয়তো বা আভাস ইঙ্গিতেও নয়, সত্যই নয় ব্যাপারটা, নেহাতই অঞ্জলির ধারণা মাত্র, হয়তো পড়া আর পড়ানো—(সীতেশদার কথামতো) এমন একটা উদ্ভট পর্যায়ে তাঁকে নেশাগ্রস্ত করেছে, যাতে তিলমাত্র প্রতিবন্ধকও তাঁকে উতলা করে তোলে।

তিনি অঞ্জলিকে যতোই করুন কিছুতেই সে তাঁকে সেই আসন দিতে পারে না, যেখান থেকে তিনি আদরের মতো শাসনের বেলায়ও —বাবার মতো নয়, সত্যি সত্যি বাবা হয়ে কাছে নেমে আসতে পারেন। সমাজ! এই আমাদের সমাজ। সমাজের গড়নই আমাদের এমন আত্মীয়তান্ত্রিক হিসেবে তৈরি করেছে। এ থেকে কোনোরকমে মুক্তি নেই।

নইলে কেন মাস্টারমশায়ের সামান্যতম শাসনেও ভিতরে ভিতরে এমন উদ্ধত হয়ে ওঠে, কেন ইচ্ছে করে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিতে? অধিকাব দেয়নি বলেই।

কিন্তু কেন দেয়নি? কী তিনি করেননি যা থেকে একতিল বেশি তার বাবা করেছেন? অথবা এ ভাবে বলা যায়, তিনি যা করেছেন বা কবছেন অঞ্জলির বাবা কবে তা করেছিলেন? বা করছেন? বাবাকে সে টাকা দেয় তাই খেতে পায়, পরতে পায়। আর মাস্টারমশায় সর্বতোভাবে তাকে লিখিয়ে পড়িয়ে জগতের কাছে একটা মানুষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েও কতোটুকু পান?

মানুষ বড়ো অদ্ভুত জীব। নইলে মাস্টারমশায়েব কাছে তার আরো আনত হয়ে থাকা উচিত, মাস্টারমশায়কে শুধুমাত্র ভক্তি-শ্রদ্ধাই নয়, সেবা দিয়েও তৃপ্ত করা উচিত। মাস্টারমশায় তাকে জন্ম দেননি. মনুষ্য পদবাচ্য করে তুলতে বাধ্য নন, অথচ কী অপরিমিত তাঁর স্নেহ তাঁর দান। এ ঋণ অঞ্জলির পক্ষে কখনোই শোধনীয় নয়।

।। ২৩ ।।

দুটো খবরই খুব কাছাকাছি এলো। একটা, সুদর্শনের যাওয়া পিছিয়েছে, আর একটা, সীতেশের আপিস সীতেশকে শেষ সুযোগ দিয়েছে, যেতে হলে তাকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে, নইলে এই প্রস্তাব বাতিল করে তারা অন্যভাবে ভাববে।

সীতেশের প্রায় মাথায় হাত। সংসারের সে-ই কর্তা, কতোদিকে কতো ব্যবস্থা বাকি, ভেবেছিলো, বিয়ে করে তারপর পাড়ি দেবে। এখন এই অল্প সময়ের মধ্যে কোনদিকে কী করে?

এখন মা-বাবার কাছে যাওয়া দরকার, এলাহাবাদে দিদি আছে তার সঙ্গে দেখা কবা দরকার, সর্বোপরি রীতা আছে দিল্লিতে। তার বিষয়ে মনস্থির করা বিশেষ প্রয়োজন।

যাবে প্লেনে, যাবার খরচ আপিসই দিচ্ছে, ফেরবার খরচ নিজের।

সেদিক থেকে একটা চিন্তা অবশ্য কমেছে। সুদর্শন বললো, 'তুমি এইভাবে বন্দোবস্ত করো। দিদির কাছে এলাহাবাদ যাও, দিদিকে নিয়ে বম্বে যাও, দিদিকে দিয়ে রীতার বিষয়ে বলাও।'

অঞ্জলি বললো, 'আমার বাৎসরিক পরীক্ষাটা কাছে না থাকলে আমি যেতাম তোমার সঙ্গে।'

সীতেশ হেসে বললো, 'যেতে? না?'

'হ্যাঁ, যেতাম।'

পা নাচাতে নাচাতে সুদর্শন বললো, 'আমি যেতে দিতাম না।'

'শুনেছ?' সীতেশও পা নাচালো, 'বেশ কর্তা কর্তা ভাব হয়েছে, না?'

'তা হলে তুমি সত্যিই যাচ্ছ?' অঞ্জলির মন খারাপ হয়ে গেছে, এই সব সুখকর ঠাট্টায়ও সে যোগ দিতে পারছে না।

সীতেশ হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললো, 'এবং দেখতে না দেখতেই ফিরে আসছি।'

সীতেশের মেসের ঘরে বসেই সেই সন্ধ্যায় কথা বলছিলো তারা। একটু বাদেই চলে গেল সুদর্শন, সে তার থিসিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো তখন। তাকে বিদায় দিয়ে এসে সীতেশ বললো, 'মুশকিলটা কী, জানো?'

'কিসের মুশকিল?'

'আমি রীতার বিষয়ে বলছি।'

'কী?'

'আমার মা-বাবার এই একটা ব্যাপারে ভীষণ কার্পণ্য আছে।'

'কার্পণ্য?'

'এমনিতে তো জাত গোত্র নিয়ে কোনো সংস্কার নেই, সে সব দিকে সত্যিই ওঁরা খুব উদার—'

'তবে?'

'বুঝতে পারছি না, এটা ঠিক কী ভাবে নেবেন। আমাদের দেশের এই অপাংক্তেয় সম্প্রদায় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের উপর একটা তীব্র ঘৃণা আছে ওঁদের।'

'সে কী!'

'অবশ্য কারণও আছে। প্রথম জীবনে বাবা রেলের চাকরিতে ঢুকেছিলেন, থাকলে এতোদিনে ডি টি এস হয়ে যেতেন। উঠেও ছিলেন অনেক দূর পর্যন্ত। জানো তো রেলের চাকরিতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরাই প্রধান? ওদের প্রতাপ সেখানে অপ্রতিহত।'

'কেন?'

'কেন আর? নিজেদেরই সন্তানসন্ততি তো? হোক না তারা কয়লা খাদের কামিন বা চা বাগানের কুলি রমণী, লোভের তাড়নায় ভোগ তো করেছে সবাইকেই। সেই অপোগণ্ডদের মধ্যে নিজেদের রক্ত আছে বলেই ইংরেজ প্রভুদের কৃপাদৃষ্টি একটু বেশি ওদের প্রতি। আর ওরাও দেখছো না কেমন আলাদা করে রাখে নিজেদের? ''আমরা সাহেব'' এটা ভেবে খুব গর্বিত। রেলের সব ভালো ভালো পোস্ট ওদেরই একচেটে। মাঝখান থেকে বাবা কী সব পাসটাস করে, কোন কর্তার পেয়ারের হয়ে লাফিয়ে ডিঙিয়ে উঠে যাচ্ছিলেন উপরে। আমি ঠিক জানি না, ঝাপসা ঝাপসা শোনা কথা, মনে হয় ওরা দল বেঁধে সব বাবার বিরুদ্ধে লেগেছিলো, অকারণে ঝগড়া বাধিয়ে কেউ বোধ হয় ধাক্কা-টাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলো চেয়ার থেকে, বাস, আর যাবে কোথায়? বাবা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দলের অন্য একজন বাবার শার্টের কলার টেনে ধরে কুৎসিত গালাগালি দিচ্ছিলো, যা ওদের ভাষা—'

'ওদের আবার আলাদা ভাষা কী?' গল্প শুনতে শুনতে চোখ বড়ো করলো অঞ্জলি।

সীতেশ হাসলো, 'দূর বোকা, ভাষা আলাদা মানে, ভাষা নয়, গালাগালির ভাষা। ''ব্লাডি নিগার'' ''সান অব এ বিচ্'' এসব তো মুখের বুলি, ওদের নাম না জানা বাবারা সব সময়ে যা বলে। সেই সব বলামাত্র ঘুরে দাঁড়িয়ে এক ঘুষি। দেখেছ তো কী ডাম্বেল-করা চেহারা বাবার, দুটোকে সমানে এলোপাথাড়ি কিল চড় ঘুষি লাথি, একেবারে অজ্ঞানের মতো মারতে লাগলেন। লোক দুটো তিনমাস হাসপাতালে ছিলো, মামলা করেছিলো বাবার নামে। কিন্তু বাবাকে পাবে কোথায়? তাঁর ধারণা হয়েছিলো, দুটো না হোক, একটা ঠিকই খুন হয়েছে। আমি তখন বছর খানেকের। ভেবে দ্যাখো মায়ের কী অবস্থা। অনেকদিন পর্যন্ত আমাকে নিয়ে মা মামাবাড়িতে রইলেন, সেই সময় বাবার কোনো খোঁজও জানতেন না কিছুদিন। তারপর হঠাৎ একদিন এসে আমাদের নিয়ে বম্বেতে পাড়ি দিলেন। খুব ছোট একটা কাজে ঢুকেছিলেন দায়ে পড়ে, কিন্তু সেখানেও যোগ্যতার পুরস্কার পেয়েছিলেন, উপরের আসনে উঠে গিয়েছিলেন। তারপর তো দেখছোই কী ভাগ্য। এখন এখন একমাত্র বিছানাই বাবার সম্বল। এতো খারাপ লাগে। সেই

ব্যাপারের পর থেকেই এই বিদ্বেষ ওঁদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য, আমি তো সাফারার নই, দেখিওনি সে অবস্থা, শুধু গল্প শুনেছি, আমারও কী ভীষণ রাগ ছিলো। অথচ মাথাটি আমি সেখানেই মুড়োলাম।'

অঞ্জলি বললো, 'ভালোই। প্রায়শ্চিত্ত হলো।'

'প্রায়শ্চিত্ত কেন?'

'এক-দু'জন ব্যক্তির অপরাধে সবাইকেই দায়ী করা কখনোই উচিত নয়।'

'ঠিকই বলেছ। রীতার দৌলতে এদের অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছে, বরং ভাবতে খারাপই লাগে, কীভাবে দেশের এতো বড়ো একটা সম্প্রদায়কে আমরা কোণঠাসা করে ফেলে রেখেছি।'

'আমি বলি কী সীতেশদা—'

'বলো?'

'তুমি নিজে মুখেই মামীমাকে সব বোলো।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কী? চুরিও করছো না ডাকাতিও করছো না, শুধু ভালোবেসেছ একজনকে। যাবার আগে তোমার জানিয়ে যাওয়া উচিত।' ঘড়ি দেখে অঞ্জলিও উঠলো। 'তুমি দেখো প্রথমে যতোই চমকে উঠুন আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাই কি?'

'নিশ্চয়ই।'

সীতেশ আশান্বিত হৃদয়ে বললো, 'মা বাবাকে কোনো কষ্ট দিতে আমার বেদনা বোধহয়, সেজন্যই এতো ভাবি। তোমার কথা শুনে আমার ভরসা হচ্ছে।

শার্ট গায়ে দিয়ে সীতেশদা তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

যাবার আগে সীতেশদা মাস্টারমশায়ের সঙ্গেও দেখা করে গেল। মাস্টার-মশায় বললেন, 'তুমি একদিন তোমার বোনের সমস্ত দায়িত্ব আমাকেই নিতে বলেছিলে, আমি তা নিয়েছি, সীতেশ। আমার সাধ্যমতো আমি তা পালনও করছি। ওর জন্য তুমি ভেবো না।'

সীতেশ বলল, 'তা আমি জানি মাস্টার-মশায়, তবু ভাবনা। তাছাড়া অঞ্জু এত মন খারাপ করে আছে যে আমিও দুর্বল হয়ে পড়ছি।'

'খুব মন খারাপ বুঝি?' ঠোঁটের ফাঁকে একটা অদ্ভুত হাসি ঝিলিক দিল মাস্টার মশায়ের।

সীতেশ বলল, 'আমি তো যতদিন পারি পেছিয়েছি যাওয়াটা। হাজার হোক একটা চাকরি তো, তার তো কতগুলো নিয়মকানুন আছেই, যেতে হলে আর পেছনো চলে না।'

'তা হলে না গেলেই পারতে।'

'তাও ভেবেছিলাম।'

'বাবাঃ, তাও ভেবেছিলে? বোনের জন্য সত্যি তোমার টান আছে!'

'কিন্তু এ সুযোগ আর আমি কবে পাবো? আর বারো-চোদ্দ মাসের তো ব্যাপার, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

মাস্টারমশায় অঞ্জলিকে দেখছিলেন। সীতেশ প্রণাম করল তাঁকে। তিনি চকিত হয়ে হাত জড়িয়ে ধরলেন, ধরা গলায় বললেন, 'থাক থাক, ভালো থেকো, সফল হয়ে ফিরে এসো। আমি আজকাল এমন হয়েছি না, কী ভাবি কী করি কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারি না। গুড্ লাক্, মাই বয়। তোমার অসমাপ্ত কাজ যেন সুসম্পূর্ণ হয়।'

।। ২৪ ।।

চলে গেলো সীতেশ। অঞ্জলি আর সুদর্শন তাকে তুলে দিতে এসেছিল স্টেশনে, অনেক দিন আগে সেই বালিকা বয়সের একটি ছবি ফিরে এল অঞ্জলির মনে। বম্বে থেকে সুধাগঞ্জে ফিরছিল সে, সীতেশ ম্যাট্রিক পাস করে পড়তে আসছিল কলকাতায়। একটু উল্টো ছিল ছবিটা, তখন সীতেশ দাঁড়িয়েছিল প্ল্যাটফর্মে, আর সে ছিল ট্রেনে। এমনি করেই দুলে উঠেছিল ট্রেনটা, এ রকমই একটা শিরছেঁড়া কষ্টে সে কেঁদে ফেলেছিল, সীতেশ রুমাল নাড়তে নাড়তে চোখ মুছছিল।

জীবনের প্রথম আস্বাদ তার সীতেশদা, সীতেশই তাকে মৃত্যুর পরপার থেকে হাতে ধরে নিয়ে এল জীবনের জগতে, সীতেশদাই—

'কী হলো? কী ভাবছো?' সিগারেট ধরাল সুদর্শন, 'পাগল নাকি ? কাঁদছ কেন?' নিজের রুমালে সে অঞ্জলির মুখ মুছিয়ে দিল।

বিচ্ছেদবেদনা শুধু তার সীতেশদার জন্যই নয়, সুদর্শনের আসন্ন বিদায়ের সম্ভাবনাও তাকে উতলা করেছে। আজ সীতেশদা গেল, কিন্তু সুদর্শন আছে, তার সঙ্গে কিন্তু মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানেই তাকে আবার আসতে হবে স্টেশনে, এমনি করেই বিদায় দিতে হবে এই মানুষটিকে, ফিরবে একা।

একটা শূন্য হাহাকারে ভরে থাকবে এই কলকাতা শহর।

'অঞ্জু—'

'আমি তখন কী করব, সুদর্শন, তুমি চলে গেলে আমি থাকব কী করে?'

সুদর্শনের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে ফুঁপিয়ে উঠলো।

'শোনো, শোনো, লক্ষ্মী তো, শোনো—'

'তোমরা যাবে নতুন দেশে, তোমাদের কাছে সেটা একটা স্বপ্নের জগৎ, কিন্তু আমি? আমার কাছে এই শহরে কী অবলম্বন থাকবে তখন?'

'সব থাকবে, সোনা, সব থাকবে। আমি রোজ চিঠি লিখব, সীতেশ চিঠি লিখবে, তারপর দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে দিন, তুমি স্টেশনে আমাদের নিতে আসবে। হয়তো আমার বাবাও আসবেন। বিলেতফেরত ছেলে তো?' একটু রসিকতাও করল সুদর্শন, তারপর ঘড়ি দেখল, 'আজ তো টিউশনিতে যাচ্ছো না, না?'

'না।'

'তা হলে চল, কোনো একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসি। মুখটা মোছো। পাগলি।' বুকের উপর অঞ্জলির মাথাটা একটু চেপে ধরে ছেড়ে দিল সে।

আজ গাড়ি নেই সুদর্শনের, হেঁটে হেঁটে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো, পায়ের কাছে এসে ট্যাকসি থামল একটা, তখনকার দিনের বড়ো ট্যাকসি, যখন সেধে সেধে লোক ডাকত শিখ ড্রাইভাররা।

সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল, চাঁদ উঠে আসছিল গঙ্গার উপরে, জলের উপর চিকচিক করছিল তার কিরণ। এত লোক ছিল না তখন কলকাতায়, তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি, বাংলাদেশ দু-ভাগ হয়ে যায়নি। স্টেশনটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল মেইল ছেড়ে যাবার পরেই।

দিল্লি মেইল তখন বেলাবেলি ছাড়তো।

সীতেশ প্রথমেই দিল্লি যাচ্ছিল, রীতাকে ছুটি করিয়ে বম্বে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে। দিদিও বম্বেতেই যাবে তুলে দিতে।

কোনো কথাই ভোলে না সীতেশদা। এইসব গুরুতর ভাবনা-চিন্তার মধ্যেও জোর করে অঞ্জলির নামে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করিয়ে গেল। বলল, 'আমি এবং সুদর্শন, কেউই থাকছি না, টাকাটা থাকলে তুমি অনেক নিরাপদে থাকবে। পারো তো টিউশনিটা ছেড়ে দিয়ো।'

অঞ্জলি একেবারে সনির্বন্ধ হয়ে বলেছিল, 'আমি কিছুতেই এ টাকা রাখব না সীতেশদা। তুমি যাচ্ছো, কত দরকার, ওদিকে মামা মামী আছেন, বাড়িটা এখনও সম্পূর্ণ হলো না, যদি—'

'থাক, আর ''যদি '' খুঁজতে হবে না, আমি দাদা, অভিভাবক, আমার কথার উপরে আর কথা না।'

কী ভাবে জমা দিতে হবে, কী ভাবে তুলতে হবে সব সে শিখিয়ে দিয়ে গেল।

'কোন্ রেস্তোরাঁয় যাবে বল। সব জায়গায় এত ভিড়, এত আলো—' ট্যাকসি পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, অঞ্জলি তাকিয়েছিল গঙ্গার দিকে, মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোমার যেখানে খুশি।'

'কার্জন পার্কে যাবে? কী সুন্দর আলোছায়া, ঝোপ ঝোপ—'

'চলো।'

'সবাই বলে সন্ধ্যার পরে সেখানে গুণ্ডারা ঘোরে, বরং আজ একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে তোমাকে আমি রক্ষা করতে পারি কি না।'

'পুলিসও ঘোরে। তারা ধরলে?'

'হাজতে। সে একরকম বেশ হবে, দু'জনেই একটা ঘরে আটকে থাকব।'

'যদি আলাদা রাখে?'

'বলব স্বামী-স্ত্রী।'

চোখের গভীরে তাকাল অঞ্জলি, 'স্বামী-স্ত্রী, না?'

'না?'

'সুদর্শন।'

'অঞ্জু।'

'তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো?'

'কেউ কি ভোলে।'

'ভোলে।'

'যারা ভোলে আমাকে কি তাদের দলের কেউ বলে মনে হয়?'

'না।'

'তবে?'

'তবু ভয় যায় না।'

'আর যদি এমনিই হয় সে সত্যিই ভুলে গেলাম তা হলে তো আমি তোমার গ্রহণযোগ্য কি না সেখানেই পরীক্ষা হয়ে যাবে। তেমন অপদার্থকে তুমিই বা মনে রাখবে কেন?'

গাড়ি স্ট্রান্ড রোড ছাড়াল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠল, খুব ধুলো উড়ল, তারপরেই মোটা ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

সুদর্শন বলল, 'অসময়ের বৃষ্টি।'

'তা হলে আর কার্জন পার্কে নামা হল না, কী বল?'

'না।'

'গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমাকে আর বীরত্ব দেখানো গেল না, কী বল?'

'না।' একটু চুপ করে থেকে অঞ্জলি বলল, আমাকে বরং বাড়িতেই নামিয়ে দিয়ে এসো।'

'পাগল।'

'বাড়ি গিয়ে রোজ রোজ মিথ্যে কথা বলতে আমার আর ভালো লাগে না।'

'কেন? মিথ্যে কেন? তুমি তো এখন টিউশনি কর।'

'করি, কিন্তু এতক্ষণ তো করি না।'

'বাড়ি যদি কারাগার হয়, তা হলে মিথ্যার আশ্রয় ছাড়া আর গতি কী?'

'তবু মিথ্যা মিথ্যাই। আমার নৈতিক অপরাধ হচ্ছে!'

'কিন্তু কার জন্য মিথ্যে কথা বলছ, সেটা ভেবে দেখেছ কি?'

'কার জন্য?'

বড় বড় চোখে গম্ভীর ভাব দিয়ে সুদর্শন বলল, 'যে তোমার হৃদিস্থিত হৃষিকেশ। যে তোমার অন্তর বাহির সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে?'

'ঈশ!'

'ঈশ কী? সত্যি নয়?'

'না, হৃষীকেশের জন্যও আমি মিথ্যে কথা বলতে রাজি নই।

'তার মানে পাপবোধ তোমার এতই প্রবল?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে শোনো, একটা গল্প বলি।'

'সংক্ষেপে।'

'কেন? সংক্ষেপে কেন?'

'পথ তো অনেক এগিয়ে এসেছি, কোথায় যাবো বলে দিতে হবে যে।'

'ওর যেদিকে খুশি যাক না।'

'বা—রে!'

'ড্রাইভার সাব—'

'জি—'

'গঙ্গা মাইকা—'

''হাঁ সাব, সমঝতা; থোড়া হাওয়া খানে মাংতা।'

'ঠিক বাত্। তারপর শোনো, কৃষ্ণের ভক্তরা একদিন ভীষণ ধর্মঘট করলো। কৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, কেন, কেন, কী অপরাধ হয়েছে আমার তাড়াতাড়ি বলো। আমি এখনি তা নিরসন করবো।

ভক্তরা জিগির দিল, 'পক্ষপাত চলবে না, চলবে না।'

'পক্ষপাত! কার সঙ্গে পক্ষপাত?'

'রাধার সঙ্গে। রাধা কী করে আমাদের চেয়ে বড়ো ভক্ত হলো শুনি?'

'ও, এই কথা?' হাস্য করলেন তিনি। তুড়ি দিয়ে হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'আজ আমার শরীরটা বড়ো খারাপ হয়েছে হে, শুয়ে পড়ি গিয়ে, কাল ঠিক জবাব দেব।'

'আপনার শরীর খারাপ হয়েছে?' ভক্তরা একেবারে উথাল পাথাল। কেউ পাখা আনে, কেউ জল আনে। কৃষ্ণ তো শুয়ে পড়লেন চোখ বুজে, খুব উ আ করতে লাগলেন, ধড়াচূড়া সব খুলে গেল। হাহাকার পড়ে গেল ভক্তদের মধ্যে। দিকবিদিকে লোক গেল নকুল সহদেবের বাবা অশ্বিনী ডাক্তারের খোঁজে, তখন কৃষ্ণ বললেন, 'তিষ্ঠ!'

'কী, কী, কী?' একেবারে হামলে পড়লো ভক্তরা।

তিনি নিমীলিত নেত্রে চন্দনচর্চিত কপালে হাত রেখে ধীরে ধীরে বললেন, 'ভক্তগণ, আমার নিরাময়ের ওষুধ তোমাদের কাছেই, সেজন্য অত ভিজিট দিয়ে স্বর্গের অশ্বিনী ডাক্তারকে ডাকবার দরকার নেই কোনো।'

'আমাদের কাছে প্রভুর নিরাময়ের ওষুধ! কী আশ্চর্য কথা!'

'তোমরা দয়া করলেই আমি এই কঠিন ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি।'

ভক্তরা জিব কেটে লজ্জায় লাল, 'ভগবন, আপনি দয়া বলছেন? আপনার জন্য আমরা প্রাণ দিতে পারি, আর আপনি বলছেন দয়া। আপনি এখনি বলুন, আমরা কী করবো। অনলে ঝাঁপ দেব? সলিলে ডুববো? পর্বত থেকে লম্ফ দিয়ে পড়বো? না কি গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে কবিরাজি গাছ-গাছড়া খুঁজে আনবো!'

'কিছু করতে হবে না, শুধু এক ঘটি জল নিয়ে এসো।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, এক্ষুনি আনছি।'

দেখতে দেখতে ঘটি ঘটি জলে ভরে গেল কৃষ্ণের শোবার ঘর।

'এবার আদেশ করুন কী করবো।'

'আমি তোমাদের পাদোদক খাবো।'

'কী!' ভক্তরা বিজলীর মতো চমকে পা ঢেকে সরে দাঁড়ালো সব।

কৃষ্ণ বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ একজন তার পায়ের বুড়ো নখ ডুবিয়ে সেই জল আমার মুখে দিয়ে দিক, তবেই আমি সেরে উঠবো, নইলে এই আমার শেষ শয়ন।'

'এ কী আদেশ, প্রভু ? হে গোবিন্দ, হে মাধব, এতো বড়ো পাপ আমরা করি কী করে? অসম্ভব অসম্ভব।'

'কয়েকজন ভক্ত তো এই ভয়ংকর কথা শুনে সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়লো। সখীরাও এলো, তারাও কানে চিমটি দিয়ে জিব বার করে পালিয়ে গেল। যিনি স্বয়ং ভগবান, তাঁকে কে পাদোদক খাওয়াবে। এমন পাপিষ্ঠ কে আছে জগতে।

'কিন্তু কৃষ্ণের জেদ, হয় সে পাদোদক খেয়ে ভালো হবে, নয় সে শয্যা ছাড়বে না।

'এই রকম এক সংকটময় মুহূর্তে ললিতা দৌড়ে গিয়ে রাধাকে ডেকে নিয়ে এলো। অসুখ শুনে রাধা তো কেঁদে অস্থির। ললিতা বললো, কেঁদে কী করবে আগে গিয়ে দ্যাখো, কী করলে তাকে সারিয়ে তোলা যায়।

'লাল টুকটুকে ঘাগরা, ঘাসের মতো সবুজ কাঁচুলি আর করবী ফুলের মতো হলুদ ওড়না পরে রাধা তো একেবারে আলুথালু হয়ে চলে এলো। কান্নাকাটি করে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছিলো তাকে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললো, 'কী? কী হয়েছে তোমার? প্রভু আমাকে বলো তোমার কী হয়েছে, কী করলে তুমি সেরে উঠবে।'

অতি কষ্টে পাশ ফিরে কৃষ্ণ বললেন, 'কোনো ভক্ত যদি তার পা ডুবিয়ে সেই জল আমার মুখে দেয়, তাহলেই আমি এই ব্যাধিরূপ যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ পাই।' কথা শুনে রাধাও চোখ বড়ো করে তিন হাত সরে গেল। তারপর চুপ করে থেকে অভিমান-আহত কণ্ঠে বললো, হে জনার্দন, হে হৃষীকেশ, তুমি সর্বাত্মা, সর্বভূতের সুহৃৎ তুমি ব্রহ্মারও গুরু, তুমি ব্যক্ত, তুমি অব্যক্ত, তুমি ছাড়া ত্রিভুবনে অন্য কিছু নেই। তুমি যদি নিষ্ঠুর হয়ে ভক্তদের দ্বারা এই পাপ সিদ্ধ করাতে চাও, তবে তাই হোক।

'এই বলে রাধা তার গাগরির জলে পা ডুবিয়ে সেই জল কৃষ্ণের মুখে দিল। ভক্তরা হায় হায় করে উঠলো।

'কিন্তু কৃষ্ণ উঠে বসলেন, তৎক্ষণাৎ সহাস্যে বললেন, 'ভক্তগণ, তোমাদের অভিযোগের জবাব কি আমি দিতে পেরেছি?'

ভক্তরা ভুরু কুঁচকে বললো, 'অভিযোগ? কিসের অভিযোগ প্রভু ?'

'আমার পক্ষপাতিত্বের? এখন তো দেখলে কী কারণে রাধা সকল ভক্তের সেরা ভক্ত। তোমাদের কাছে তোমাদের পাপের চিন্তাই বড়ো, তারপরে আমি। আর রাধার কাছে আমিই সব কিছুর ঊর্ধ্বে।'

গল্পটা বলে সুদর্শন খুব জয়ীর ভঙ্গিতে চোখভরা হাসি নিয়ে তাকিয়ে রইলো অঞ্জলির দিকে। তারপর অঞ্জলির দুই হাত জড়ো করে নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে বললো, 'পাপ পুণ্য কিছু নেই

অঞ্জলি, আছে শুধু ভালোবাসা। ভালোবাসা সকলের চেয়ে ভালো, সব কিছুর চেয়ে বড়ো। সেই ভালোবাসার জন্য সব কিছু বিনিময়যোগ্য, বুঝেছ?'

না, বুঝিনি, বুঝিনি আমি। সহসা এই বয়সের অঞ্জলি দেবী, সেই বয়সের অঞ্জলির মতো একটা ব্যাকুল বেদনায় অস্থির হয়ে হাত থেকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলেন ছবিটা। তারপর একা ঘরে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে তুলে আনলেন আবার। কিন্তু আর তাকালেন না, বিছানার উপর ফেলে রেখে বসে রইলেন চুপচাপ।

তিনি জানতেন না হঠাৎ সুটকেসের তলা থেকে এ ছবিটা বেরিয়ে পড়তে পারে, আর বেরিয়ে এসেই একটা ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফণা তুলে এইভাবে দংশন করতে পারে।

।।২৫।।

সীতেশদা চিঠি লিখল, 'অঞ্জু, আমি কাল প্লেন ধরছি। কলকাতা থেকে এসে পর্যন্ত, কী ভয়ানক উৎকণ্ঠা এবং ব্যস্ততার মধ্যে আমার সময় কেটেছে বলবার নয়। দিল্লি গিয়ে রীতাকে ছুটি করাতে পারিনি। ও ছুটি নিয়ে পরে, মাত্র কাল রাত্রিবেলা এসে পৌঁছেছে। দিদি-জামাইবাবুও এসেছেন। বাবা এখন অনেকটাই ভালো। বরাবরের মতো চলাফেরা করার অবস্থা হয়ত বাকি জীবনে আর হবে না, কিন্তু ঘরের মধ্যে চলাফেরা করাব মত শক্তি যে তাঁর শেষ পর্যন্ত হল সেটাই অনেক ভাগ্য। প্রায় দুবছর তিনি একেবারে পঙ্গু হয়ে বিছানায় ছিলেন।

'আমাদের বাড়িটা যেমন তেমন করে শেষ হয়েছে। একেই ছোটো বাড়ি, তাকে ছোটোতম করে মা একজন মারাঠি বিধবাকে একখানা ঘর ভাড়া দিয়েছেন। বাকি অংশে নিজেরা চলে এসেছেন, বললেন, তুই যাবাব আগে, আয় তোকে নিয়ে আমরা তিন রাত বাস কবি।

'নতুন বাড়িটাতে এসে বেশ ভাল লাগছে। মা ধীরে ধীরে আগেই গুছিয়ে রেখেছিলেন। আমি চলে গেলে বাড়ি ভাড়া চালানো অসুবিধে হবে ভেবেই ঊর্ধ্বশ্বাসে সমাপ্ত করেছেন বাড়ি। অবশ্য যদি তাকে সমাপ্ত বলা যায়। কাজ অবশ্য আরও অনেক বাকি, তবু বাস করার যোগ্য হয়েছে সেটা ঠিক।

'এবার রীতার কথা। তোমার বুদ্ধিমতো আমি সে সংবাদ তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা, মানে দিদির সাহায্যে পরিবেশন না করে নিজেই বলেছিলাম। বললাম, পরিচয় দু'বছরের, মনস্থির করেছি এক বছর, তবে তোমরা যদি দুঃখ পাও আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি। কেননা আমি জানি আমিও যেমন তোমাদের দুঃখ দিতে পারি না, তোমবাও তেমন আমার কষ্ট সইতে পাবো না।

'মা বাবা দু'জনেই চুপ করে রইলেন। অনেক পরে মা বললেন, 'তুমি যে অপেক্ষা কবতে রাজি

তা তো বুঝতেই পেরেছি, নইলে এক বছর আগে মনস্থির করে আজ পর্যন্ত কীভাবে চুপ করে আছো? কিন্তু মেয়েটি কদ্দিন রাজি থাকবে সেটাই কথা। ধরো, আমাদের কোনোদিনই মত হল না, তখন কী করবে?

'বললাম, তা তো ভাবিনি। শুধু ভেবেছি, আমি যাকে ভালোবাসি তাকে তোমরা একটা জাত নামক পাপের অন্ধকারে চিরকাল ঠেলে রাখতে পারবে না, কোনো না কোনোদিন সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে।

'বাবা খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ছিলেন, বললেন, ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল, সীতু।'

'আমি বললাম, কী?'

'মারামারির সময়ে ওদের সবাই, মানে ওদের কমিউনিটির সবাই কিন্তু আমার বিপক্ষে ছিল না, ধরা যায় আধাআধি, এমন কি আমাকে যিনি টপ করে অত উঁচুতে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, তিনিও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানই ছিলেন। কিন্তু ওদের প্রতি আমাদের একটা জন্মগত বিতৃষ্ণা থাকার দরুন আমি প্রত্যেককে দায়ী করেছিলুম, ঘৃণা করেছিলুম এবং যাকেই হাতের নাগালে পেয়েছিলুম, পরিচয়ের সম্মান, বন্ধুতার সম্মান, উপকারের সম্মান সব ভুলে উন্মাদের মতো পিটিয়েছিলুম। যখন রাগ পড়ে গিয়েছিল, কষ্ট হয়েছিল মনে, সামান্য অনুতাপও অনুভব করেছিলুম। প্রকাশ করিনি, কিন্তু একটা অপরাধবোধের বেদনা লেগেছিল কোথায়। তা ভালোই হল, তোমার স্ত্রীকে ভালোবেসে সে দুঃখ ভোলা যাবে।

'অতএব আমার অবস্থা বুঝতেই পারো। বাচ্চাবয়সের মতো লাফাবো না ডিগবাজি খাবো সেটাই ভাবছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাঙ্ককল গেল দিল্লিতে, খবর শুনে শ্রীমতী একেবারে লক্ষ্মীসীতার মতো লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি পরে এসে বম্বেতে উপস্থিত, শুধু সিঁদুরের টিপটিই যা বাকি ছিল, কাল রাত্রে হোটেলেই উঠেছিল, আজ মা বাড়িতে নিয়ে এসেছেন।

'লোকজন ডেকে সামান্য একটু পাকা দেখার অনুষ্ঠানও হয়েছে, বউয়ের দুধে আলতায় রং দেখে দেখে মা আর চোখ ফেরাতে পারছে না, দিদি দিনে রাত্রে তাকে সাজাচ্ছে, আর বাবা আগের মতো হাঁক ডাক করে কেবল মাছ মাংসের অর্ডার দিচ্ছেন।

'আপাতত এই পর্যন্ত ঠিক হল যে রীতা যেমন কাজ করছে করবে, মাঝে মাঝে ছুটিতে এসে আমার সাবসটিটিউট হিসেবে ভাবী শ্বশুর-শাশুড়িকে দেখে যাবে, খবরাখবর করবে, তারপর আমি ফিরে এলে তোমাদের সকলকে সাক্ষী রেখে সানাই টানাই বাজবে।

'সুদর্শনেরও যাবার সময় হয়ে এল। তুমি কিন্তু বিচলিত হোয়ো না। গড়েপিটে মানুষ হয়েছো, পায়ের তলায় মাটি পেয়েছ, মন শান্ত রেখে মাস্টারমশায়ের অনুগামী হয়ে ঠিকমতো পড়াশুনো কর। আজ এই থাক। আমি পথে-পথে তোমাকে চিঠি লিখে যাব। যখন যা দরকার আমাকে লিখো। জেনো তোমার দাদা সব সময়ে তোমার পাশে আছে।

সুদর্শনকে আলাদা লিখলাম। ভালবাসা নাও।

সীতেশদা'

চিঠি পেয়ে আনন্দে অধীর হল অঞ্জলি। মামা-মামী যে এত সহজে এমন সুন্দরভাবে সীতেশদার

মনোনীতাকে গ্রহণ করবেন তা কিন্তু সে ভাবেনি। মনোরমা বললেন, 'সীতেশ এত কী সুখের কথা লিখেছে যে কাজকর্ম ফেলে কেবল চিঠিই পড়ছ?'

অঞ্জলি সব বিরোধ ভুলে ছুটে এল কাছে, উৎফুল্ল স্বরে বলল, 'সীতেশদার বিয়ে ঠিক হয়েছে, খুব সুন্দর বউ, মামা-মামীমা খুব খুশি।'

'ও।'

'কতদিন থেকে সীতেশদা এই মেয়েকে ঠিক করে রেখেছে, এতদিনে—'

'প্রেমের বিয়ে বুঝি?' মুখ বাঁকালেন মনোরমা। যেন প্রেমের বিয়ে একটা ভীষণ ঘৃণার ব্যাপার। দুশ্চরিত্র স্ত্রী-পুরুষের কাণ্ড-কারখানা। অথচ এই মাত্র কয়েক বছর আগে নিজে প্রেম করে বিয়ে করেছেন। আশ্চর্য মানুষের মন।

'কোথাকার মেয়ে?' আয়না দিয়ে দেখে দেখে তিনি পাকা চুলগুলো তুলে ফেলছিলেন।

'এই কলকাতারই।' উৎসাহ নিবে গিয়েছিল অঞ্জলির, সে চিঠিটা খামে ভরতে-ভরতে ভাবছিল কখন দেখা হবে সুদর্শনের সঙ্গে। কখন সুখবরটা দিয়ে তাকে অবাক করে দেবে।

মনোরমা আবার বললেন, 'কী জাত? বৈদ্য, কায়স্থ না ব্রাহ্মণ?'

'জানি না।'

'জানি না মানে? বিয়ে হচ্ছে আর জাত জানো না?'

'সীতেশদা জাত মানেন না।'

'তার মা বাপ তো মানে।'

'ওঁরা তা নিয়ে কথা তোলেননি।'

মনোরমা রেগে গেলেন, পাকা চুল তোলা রেখে ঘচ্‌ঘচ্‌ করে সরু চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বললেন, 'তা তুলবেন কেন? যাদের নিজেদেরই জাতজন্মের ঠিকানা নেই, তাদের কাছে আবার জাতের মূল্য। যতো সব ইয়ে হয়েছে—'

অঞ্জলি একবার তাকিয়ে ঢুকে গেল নিজের ঘরে।

বাড়িটা তখন শান্ত ছিল। বাবা আপিসে চলে গিয়েছিলেন, টুকুরা ইস্কুলে গিয়েছিল, সকালবেলাকার কাজকর্মের ঝড়-ঝাপটা বোঝা যাচ্ছিল না কিছু। এবার তার নিজের কলেজে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আজ দেরিতে কলেজ।

কিন্তু এখন এই চিঠি পড়বার পরে মনোরমার মুখোমুখি বসে যাদের জাত-জন্মের ঠিক নেই তাদের নিয়ে আলোচনা করতে মন বিমুখ হল। জানলায় দাঁড়িয়ে চুলের লম্বা বেণীটা সামনে টেনে এনে ক্ষিপ্র হাতে খুলতে শুরু করল। মনে হলো তার চেয়ে স্নান করে খেয়ে বেরিয়ে পড়া ভালো।

কিন্তু কোথায় যাবে? এই সময়ে কাকে পাবে সে? অন্তত যাকে পেতে চায় তাকে তো নিশ্চয়ই নয়।

চুলের বেণীর উপর হাত শিথিল হল। কী লম্বা চুল। বিরক্ত লাগছিল অতক্ষণ ধরে খুলতে; মনে হচ্ছিল খানিকটা বেণী কেটে দেয় তক্ষুনি।

বাইরে থেকে কথা ছুড়লেন মনোরমা, 'তোমার তো আজ বারোটায় ক্লাস, বিকেলের পরোটা কখানা তৈরি করে রাখতে পারবে নাকি ? না কি আমাকেই আবার হেঁশেলে ঢুকতে হবে?

আধখোলা বেণীতে আবার খোঁপার পাক দিল অঞ্জলি, কিছু না-বলে চলে এলো রান্নাঘরে, কাঠের বারকোষ বার করে ময়দা মাখতে বসল।

কলেজের রুটিন সবই মনোরমা জানেন। ভর্তি হবার পরে প্রথমেই সেটা জিজ্ঞাসা করে নিয়েছেন। সুতরাং তার মনে না থাকলেও মনোরমার ভুল হয় না। ফিরতে দেরি হলে কথা শোনান, তাড়াতাড়ি গেলে রাগারাগি করেন। অবশ্য তাড়াতাড়ি যাওয়া বা দেরি করে ফেরা দুটোর একটাও করে না অঞ্জলি। দরকার হয় না। তার জীবনের বৃত্ত হয়ত বা অস্বাস্থ্যকরভাবেই মাত্র তিনটি মানুষের মধ্যে সুসম্পূর্ণ ছিল। এক, তার সীতেশদা, দুই, মাস্টারমশায়, তিন, সুদর্শন।

খুব আলাপি বা মিশুক না হবার দরুন, এখানে এসে তেমন গাঢ় বন্ধুতা কারো সঙ্গেই গড়ে ওঠেনি। যখন সুধাগঞ্জে ছিল আবাল্য স্কুলে পড়ে সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে সে সহজ ছিল, সমকক্ষ ছিল, অসংকোচ ছিল, তাই একাত্ম ছিল।

কিন্তু একটু বেশি বয়সে কলকাতা এসে মফস্বলের শ্যাওলা তুলে ফেলে শহরের হালচালের সঙ্গে সমগোত্র হতে বড় বেশি সময় অতিবাহিত হলো। আসলে সীতেশদাকে পেয়ে গিয়ে অভাববোধটা কমে গিয়েছিল। যে দুঃখ নিয়ে সে বড়ো হয়ে উঠেছে, তাতে বন্ধুতার চেয়ে সহানুভূতির প্রয়োজন ছিল বেশি। সখ্যের চেয়ে সান্ত্বনার, সান্নিধ্যের চেয়ে সাহায্যের। তার পারিপার্শ্বিক তাকে যে অবরোধের কূপে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল, তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সীতেশদাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। যে তার একাধারে বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় এবং স্বজন।

আর সীতেশদাকে পাবার পরে সে যখন আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো, পারিবারিক রণক্ষেত্র থেকে বাইরের ঠাণ্ডা মাটিতে পা রেখে সামান্য শীতল হল, তক্ষুনি তো দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে, মুহূর্তে যে তার ধ্যানজ্ঞান এক করে বিরাজমান হলো হৃদয়ে, অক্ষুধা অতৃপ্তি নিঃশেষে মুছে দিল জীবনের।

।। ২৬ ।।

কিন্তু তোমার কাছে আমি কী পেয়েছিলাম তা তোমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, সুদর্শন। যে আমি 'গোস্পদে বিম্বিত' আকাশ দেখেই আকাশের পরিমাপ জেনেছিলাম, তাকে তুমি সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলে।

আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমার দুঃসাহস দেখে প্রথম দিনই আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমি

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে অন্ধকারে ডেকেছিলাম, 'সুদর্শন, সুদর্শন।' তারপর নিজেই নিজের মুখ চেপে ধরেছিলাম।

কিন্তু তুমি কী দেখেছিলে, সুদর্শন? সেই কিছু-না-জানা কিছু-না-বোঝা মফস্বলের এক দুঃখিত বঞ্চিত মেয়েটির মধ্যে তোমাকে ভোলাবার মতো কী সম্পদ ছিল?

সে কথা কিন্তু আজও ভেবে পান না অঞ্জলি দেবী। এতদিন পরেও না। রূপ? যৌবন? রূপ যৌবন কি সে আর দ্যাখেনি? দেখেছে, অনেক দেখেছে। তথাকথিত সমাজের উঁচু স্তরের মানুষ সে, উঁচুদরেরও মানুষ, দর নিরূপণ করতে কলকাতা শহরের রুই-কাৎলা মেয়েদের পিতামাতারা কে না অগ্রবর্তী ছিল?

সুদর্শন বলেছিল, 'দেখব আবার কী? আমি কি পাত্রী খুঁজছিলাম যে দেখার প্রশ্ন ওঠে। বলতে পারো দেখা হয়ে গেল। যার সঙ্গে যে বিদ্যুতের সংঘর্ষে আলো জ্বলে, সব সময় তো তারা পরস্পরকে খুঁজে পায় না? জীবন মোটামুটি একটা জোড়াতালির উপরই চলতে থাকে। তারই মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ কোনো ভাগ্যবান তার দুর্লভ পরশমণিটি পেয়েও যায়। আমি পেয়েছি, ব্যস, আর কোনো ব্যাখ্যা আমার জানা নেই।'

সীতেশদার চিঠিটা যেদিন পেল অঞ্জলি, সেই বিকেলে দেখা হতেই সুদর্শন বলল, 'জানো অঞ্জু, বরাবরই দেখে আসছি যা ভাবা যায় ঠিক তার উল্টোটি ঘটে জীবনে।'

'বর্তমানে কিছু উল্টো হয়েছে নাকি?'

'সীতেশের চিঠি পেয়ে থেকেই—'

'ও, তুমিও পেয়েছ?'

'তুমিও পেয়েছ?'

'আমি তো সকাল থেকেই ছটফট করছি, কখন দেখা হবে, কখন তোমাকে সুখবরটা দেব।'

'আমিও ঠিক তাই। আর তারপর থেকেই মনে পড়েছে, ছেলেবেলায় যখনই কোনো দেরি-টেরি করে ভয়ে চোর হয়ে বাড়ি ফিরেছি, মা দেখতাম কক্ষনো বকতেন না। আবার যখন ভেবেছি এজন্য আবার বকবেন কেন, তক্ষুনি বকার ধুম পড়ে যেতো। তোমার হয়নি?'

'আমার!' একটু হাসল অঞ্জলি। বকা ছাড়া আর কি কিছু জানত নাকি অঞ্জলি, যে তা ব্যতীতও অন্য কিছু ঘটবে জীবনে?

'না, তুমি ভেবে দ্যাখো, এ নিয়ে কত ভয় ছিল সীতেশের, কত সংকোচ ছিল, কিন্তু কত সহজে সব সমাধান হয়ে গেল। আর আমি? আমি তো ভাবতেই পারিনি, অন্তত আমার বাবা এই ধরনের একটা বিরোধিতা করতে পারেন। অথচ তিনি উচ্চশিক্ষিত, কত দেশবিদেশে ঘুরেছেন, উপরন্তু নিজে বিয়ে করেছিলেন প্রেম করে, তিনি তাঁর ছেলের বিষয়ে কী উদ্ভট রক্ষণশীল।'

বোঝা গেল, চিঠিটা পেয়ে একদিকে যত আনন্দ হয়েছে, নিজের বাবার জেদের কথা ভেবে ততই দুঃখ বেড়েছে।

অঞ্জলি বলল, 'তুমি ভেবো না, তোমার বাবাও একদিন সব মেনে নেবেন।'

'কখনো নিতে পারেন কিন্তু এখন তো নেননি।'

'কী আর করা যাবে। আমার জন্যই তোমাকে এ কষ্টটা সহ্য করতে হচ্ছে, নিজের উপর আমার রাগ হয়।'

'নিজের উপর রাগ হয়, না? যা অন্যায় তা নিয়ে দেখছি তোমার কোনো মাথা-ব্যাথা নেই।'

'অন্যায় কিসের?'

'এর চেয়ে অন্যায় আর কী ভাবা যায়? নিজের ইচ্ছে অপরের উপর এভাবে চাপানো চেষ্টা রীতিমতো অসৌজন্য। আমার ভাবতে লজ্জা করে, সেই ব্যারিস্টার ভদ্রলোক আমাকে তাঁর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স দেখাতে চান। কী অডাসিটি। বাবার সামনে বসে বললেন, তুমি রেজিস্ট্রি করে ইরাকে নিয়ে চলে যাও, তোমাদের দু'জনের প্লেন-ভাড়া, গিয়ে অন্তত ছ'মাস থাকার খরচ সব আমি এখানে জমা দিয়ে দিচ্ছি।'

অঞ্জলি ভাবছিলো ব্যারিস্টার ভদ্রলোক কে? এখন বোঝা গেল তিনি ইরার বাবা। ইতস্তত করে বললো, 'ইরা কী বলছে?'

'আমি কী করে জানবো, আমার সঙ্গে কি ইরার দেখা হয়, নাকি?'

'এমন তো হতে পারে ইরার ইচ্ছেতেই ইরার বাবার এতো আগ্রহ।'

'কিন্তু ইরাকে যে বিয়ে করবে সে যখন সরবে ঘোষণা করেছে সে আর-একজনকে পছন্দ করেছে, তখনও কি এ-সব কথা ওঠে?'

'ওঠে। যদি ইরা তোমাকে ভালোবেসে থাকে।'

'না, অত ভালোবাসা-টালোবাসা কারো নেই আমার উপর।'

'কী করে জানো?'

'কেন জানবো না? কেউ আমাকে প্রেম করবে আর আমি তা টের পাবো না, বা রে!'

অঞ্জলি চুপ করে রইলো।

সুদর্শন বললো, 'আমাকে বাবা ডেকে পাঠালেন কাল তাঁর শোবার ঘরে। বললেন, তুমি তা হলে যাচ্ছ?'

'আমি বললাম, হ্যাঁ।'

'বাবা বললেন, তা হলে আমার কথা তুমি রাখছো না?'

'আমি বললাম, কী কথা?'

'শুনলে তো নিশীথ কী বলে গেল। নিশীথের মেয়েই নিশীথের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী।'

'তাতে আমার কী?'

'তাকে বিয়ে করলে, তুমিই তার মালিক হবে।'

'অন্যের উপার্জন ভোগ করার কোনো সাধ নেই আমার।'

'আমার কথারও কোনো দাম নেই, না?'

'কী তোমার কথা?'

'আমি চাই তুমি ইরাকে বিয়ে করো।'

'আমি তো তোমাকে সব বলেছি।'

'আমিও বলেছি, এতে আমার মত নেই।'

'আমি যখন যা করতে চেয়েছি, সব সময়েই তুমি তার বিরোধিতা করেছ—'

'এবং তুমিও করেছ। আমার কথা মান্য করা তুমি কখনোই কর্তব্য বলে বোধ করনি।' আমি অধৈর্য হয়ে বললাম—

'শিশু বয়সে মানুষের নিজস্ব বুদ্ধি বিদ্যা থাকে না, গুরুজনরাই তাদের মঙ্গল অমঙ্গলের নিয়ন্ত্রণকারী হয়ে রক্ষা করেন, আমি সাবালক, নির্বোধ নই, একটা প্রতিষ্ঠানে, উপার্জন যাই হোক, সসম্মানে কাজ করছি, ন্যায়-অন্যায় বোধ জন্মেছে, এখানে কী করে তুমি আশা করো তোমার সব ইচ্ছে এবং আদেশ আমি নির্দ্বিধায় মেনে নেবো। তা হয় না।'

'খেপে গিয়ে বাবা বললেন, যদি তা নাই হয়, তোমার সঙ্গে আমি কোনো সম্পর্ক রাখবো না।'

'বললাম, সেটা তোমার অভিরুচি।'

'একটি পয়সা আমি তোমাকে দেব না।'

'দিয়ো না।'

'এ বাড়িতে আমি তোমাকে থাকতে দেব না।'

'দিয়ো না।'

'ঠিক আছে, আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। এই বলে পাশ ফিরে শুলেন। আমার কেমন কষ্ট হলো, বললাম, তুমি শুয়ে আছ কেন? তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে?'

'বললেন, সে-কথা তোমার কাছে বলতে আমি বাধ্য নই।'

'আমার তখন মনে হল, আমার জন্য খুব মন খারাপ হয়েছে, বাবার, কদিন যাবৎ এতো বেশি রাগারাগির কারণ হয়তো সেটাই, হয়তো সেজন্যই কেবল ডাকাডাকি করে এলোমেলো কথা বলেন, অকারণে অসম্মান করে আঘাত দেন, কী করেন না করেন— আসলে ছেড়ে তো আর কখনো থাকেননি? বকলে কী হবে, একদিন একটু মাথা ধরলেও তো তিনি বাড়িতে হুলুস্থুল বাধিয়ে দেন। আমি যে যাবো এটাই বাবাকে ক্ষিপ্ত করেছে। ঐ বিয়ে-টিয়ে কিছু না, একটা ছুতো ধরে কেবল গালাগালি। কী করি বলো? এরকম ছেলেমানুষি করলে পারা যায়?'

সুদর্শন হাসল, কিন্তু কান্নার মতো। যাবার আগে বাবার জন্য সেও বিচলিত হয়েছে।

একটু পরে অঞ্জলি বলল, 'একটা কথা রাখবে?'

'বলো।'

'ঠাট্টা করবে না?'

'না।'

'আমাকে নিয়ে চলো একবার।'

'অসম্ভব।'

'অসম্ভব কেন?'

'তোমাকে আমি অপমানিত হতে দিতে পারি না।'

'অপমান কিসের? তিনি গুরুজন, আমার কোনো অপমান হবে না।'

'যদি কোনো অন্যায় কথা বলেন?'

'কী হবে?'

সুদর্শন চুপচাপ ভাবল খানিকক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, যাব, আমাব কর্তব্য আমি করি।'

'কী কর্তব্য?'

'চলে যাচ্ছি, তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাই।'

'হয়তো রেগে যাবেন।' সত্যের মুখোমুখি এসে অঞ্জলির এতক্ষণের সাহস উবে যাচ্ছিল। সুদর্শন হাতে ধরে তাকে তুলে নিল, বলল, 'কত আর রাগবেন, বড়োজোর বলবেন, বেরিয়ে যাও। সইতে পারবে না?'

'পারবো।'

'তবে চলো।'

পাশাপাশি হেঁটে তারা বড়ো রাস্তায় এল।

।। ২৭ ।।

শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা, পুর্ণিমার চাঁদ প্রায় গোল হয়ে এসেছে, বাতাসে তখনো শীতের আমেজ আরামদায়ক।

সুদর্শনের বাবা দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় একটি এলানো চেয়ারে বসেছিলেন। পাশে বেতের টেবিলে ইতস্তত ছড়ানো মাসিক ষান্মাসিক ইংরিজি বাংলা মিলিয়ে কিছু কাগজপত্র পড়ে ছিল। একটি দাঁড়ানো আলোর তলায় তাকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একখানা বই পড়তে দেখা যাচ্ছিল।

সুদর্শন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে নিচুগলায় বলল, 'ফ্লু হয়েছে, বেরোননি।'

অঞ্জলিকে নিয়ে এলো সেখানে। কোনো ভূমিকা করল না, ডাকল, 'বাবা।'

মুখ না তুলেই তিনি নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিলেন, 'কেন?'

'ওকে নিয়ে এসেছি।'

'কাকে?' চকিতে বইয়ের ভাঁজে আঙুল রেখে ঘুরে তাকালেন। তারপব অবাক হয়ে তাকিয়েই রইলেন।

বোধ হয় ছেলের এই দুঃসাহসে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

বেপরোয়াভাবে সুদর্শন বলল, 'ওর কথাই আমি তোমাকে বলেছি। ইচ্ছে হলে আলাপ কবে দেখতে পারো, নয়ত তাড়িয়ে দাও, যা তোমার খুশি। আমি নিচে যাচ্ছি।'

'শোনো, শোনো—'

সুদর্শন শুনল না। অঞ্জলিকে বিপন্ন করে যেমন এসেছিল, তেমনি নেমে গেল।

বিপন্ন সে শুধু অঞ্জলিকেই করল না, তার বাবাকেও করল। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থমকে থেকে, কী যে করবেন ভেবে পেলেন না।

অঞ্জলির বুকের মধ্যে ধকধক করছিল। সে ভিতরে ভিতরে সাহস সঞ্চয় করতে চেষ্টা করছিল। ভীরু পায়ে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল।

তিনি কোনো সম্ভাষণ করলেন না, পা নাচাচ্ছিলেন, সেটা থেমে গেল, পরিবর্তে চুল টানতে লাগলেন। বোঝা গেল উত্তেজিত হয়েছেন। দেখতে অনেকটাই সুদর্শনের মতো মুদ্রাদোষগুলো হুবহু এক রকম।

এ অবস্থায় অঞ্জলি যে কী করবে, দাঁড়িয়ে থাকবে, না চলে যাবে, কিছু বুঝতে পারছিল না।

হঠাৎ গলা-খাঁকারি দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বোসো।'

কয়েকখানা হালকা বেতের চেয়ার ছড়ানো-ছিটোনো ছিল, তারই একটাতে সে সন্তর্পণে বসল।

আবার পা নাচালেন ভদ্রলোক, বেশ কড়া গলায় বললেন, 'তুমি তো আমার মতামত নিশ্চয়ই শুনেছ।'

অঞ্জলি মাথা নোওয়ালো 'শুনেছি।'

'তবে এলে কেন?'

অঞ্জলি নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় বলল, 'আপনাকে দেখতে।'

এক পলক দৃষ্টিক্ষেপ করলেন তিনি, ফস করে একটা সিগারেট ধরালেন, 'আমাকে দেখতে?'

'আমিও যে একজন মানুষ সে কথাটাও জানাতে চাই।'

তিনি তাকিয়ে থেকে বললেন, 'জানো বোধ হয়, আমি একজন চিকিৎসক। মানুষের জীবন নিয়েই আমার কারবার, মানুষকে অমানুষ বলে ভাবি এ খবর তোমাকে কে দিলো?'

'আপনার ছেলে।'

'আমার ছেলে? সে কী বলেছে তোমাকে?'

'আমার বাবা অর্থবান নন, সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা নেই, সে কারণেই আপনার কাছে আমি নগণ্য, পরিত্যাজ্য এবং আপনার বিবেচনায় আমরা দু-পেয়ে কোনো এক ধরনের জীবমাত্র। অসুখ করলে, মরে বেঁচে ভিজিট দিতে পারলে আপনি নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণরক্ষা করবেন, কিন্তু মেলামেশার যোগ্য বলে ভাববেন না।'

তিনি তাঁর হাতের সিগারেট অ্যাশট্রেতে ঘষলেন। চড়া গলায় বললেন, 'বেশ! তাহলে তাই। তারপরে আর তোমার কী বলবার থাকতে পারে?'

'আপনার মতো একজন প্রতিভাবান ডাক্তার, শুনেছি লোকেরা আপনাকে বিধাতার সম্মান দেয়, রোগীরা ঈশ্বর জ্ঞান করে, আমি বলছিলাম, সেইরকম একজন উঁচুদরের মানুষের কাছে আমরা এটাই আশা কবব, তিনি আর যাই করুন মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিয়েই বিচার করবেন, তার অর্থ বিত্ত জাত গোত্র দিয়ে নয়।'

ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে তিনি হাত বুলোলেন।

এবার অঞ্জলি উঠে দাঁড়ালো, 'কিন্তু আমি এভাবে, একটা খবর বার্তা না দিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে সম্মত ছিলাম না, সুদর্শন শুনলো না।

'সুদর্শনের কারো কথা শোনাই অভ্যেস নয়।'

'তা ছাড়া আমি জানতাম না আপনি অসুস্থ। আপনার কি জ্বর হয়েছে?'

'হ্যাঁ ডাক্তারদেরও অসুখ-বিসুখ করে।' কী যেন খুঁজলেন তিনি।

স্বভাবগতভাবেই অঞ্জলি মনোযোগী হয়ে উঠে বলল,'কিছু চাইছেন?'

'এখানে জলের গ্লাস ছিল একটা—'

তিনি এদিক-ওদিক তাকালেন।

হাতের কাছেই জলচৌকিতে রাখা ঢাকা গ্লাসটি অঞ্জলি তুলে দিল হাতে। আস্তে বললো, 'জ্বর হলে কিন্তু বারান্দায় বসা উচিত নয়।'

জল খেয়ে গ্লাসটা অঞ্জলির হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তাই নাকি?'

'এখনো তো তেমন গরম পড়েনি, রাত্তিরে হিম হয়, বাতাস ভেজা থাকে—'

'হুঁ।'

'বরং পায়ের উপর একটা চাদর চাপা দিয়ে—'

'নন্দু,' আচমকা প্রচণ্ড গলায় ডেকে উঠলেন তিনি। অঞ্জলি প্রায় কেঁপে উঠেছিলো।

কোথা থেকে ছুটে একটি লোক এসে পিছনে দাঁড়ালো।

বললেন, 'ভালো-ভালো খাবার নিয়ে এসো, চা আনো, যাও।'

নন্দু চলে গেলে অঞ্জলি বিদায় নিল, 'আমি তাহলে আজ যাই?' সে আবার প্রণাম করতে গিয়েছিলো, ধমকে উঠলেন, 'যাবে মানে? আমি কি এতোই অভদ্র যে একজন অতিথি এলে এ-ভাবে তাকে বিদায় দেব? বোসো।'

ভয়ে-ভয়ে বসলো অঞ্জলি।

এবার একটু হাসলেন, 'হ্যাঁ, কী বলছিলে? বাতাসে হিম থাকে, না? চাদর চাপা দেয়া উচিত, না? আর কী কী করা উচিত?'

অঞ্জলি লজ্জা পেলো।

'কী খাবো বলো দেখি? সেটাও শুনে রাখি। সাধারণত আমিই তো সকলকে বিধান দিয়ে থাকি, আমাকেও বিধান দিতে পারে এমন লোকের দেখা তো সচরাচর পাই না।'

এই মানুষের কাছে এই সহাস্য পরিহাস অঞ্জলি আশা করেনি। একটু পরে বললো, 'ঠাট্টা কী? নিজের চিকিৎসা কেউ নিজে করতে পারে না।'

'আমিও তো তা অস্বীকার করছি না। আমার টেম্পারেচারটাও তো আমি দেখিনি।'

অঞ্জলি সাগ্রহে বললো, 'আমি দেখবো?'

'দেখবে? দ্যাখো।'

'থারমোমিটার?'

'নিয়েসো, ঘরে আছে। কর্নার টেবিলে।'

ঘরে গিয়ে অঞ্জলি কর্নার টেবিল খুঁজে থারমোমিটার আনলো, খাটের উপর ছড়ানো একটা বালাপোষ দেখতে পেয়ে সেটাও নিয়ে এলো। পায়ের উপর ছড়িয়ে দিল এনে।

টেম্পারেচার দেখে চোখ কুঁচকে বললো, 'ভাত নয়, রুটি।'

'ওষুধ বিষুধ?'

'আপাতত দরকার নেই, যদি ডাকেন তো কাল এসে বলবো।'

পরিহাসের বদলে পরিহাস করে হাসলো সে।

'ডাকবো কেন?' তিনিও হাসলেন, 'তোমার নিজের দায়িত্ব নেই?'

'আমার দায়িত্ব?'

'অবশ্যই তোমার দায়িত্ব। নিজে থেকেই তুমি নিয়েছ সেটা।'

'আমি নিলেই কি আপনি দেবেন?'

'এতো বড়ো একজন ডাক্তার, ডক্টর সুরঞ্জন রায়চৌধুরীকেও যে প্রেসকৃপশন দিতে পারে, তাকে একবার পেলে কি আর ছাড়া যায়?'

নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে খুব জোরে জোরে হাসলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, 'বেশ, ঠিক আছে, দেখা যাবে তোমার হাতযশ, কেমন তুমি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারো।'

চোখে মুখে আনন্দ বিচ্ছুরিত হলো অঞ্জলির। চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললো, 'আপনার কাছে না-এলে চিরকাল আমি একটা ভীষণ ভুলের মধ্যে বাস করতাম।'

'কী ভুল?'

'ভয়ানক ভয় পেতাম আপনাকে। ভাবতাম কী না কী—'

'এখন বুঝি ভাবছো না?'

'এখন? না।'

'এখন কী মনে হচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে মায়ের মৃত্যুর পরে যে অভাববোধে আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম, তা আর আমার ফিরে পাওয়া হতো না।' আবেগের মুখে কথাটা ফেলেই খুব সংকুচিত হয়ে বললো, 'মানে, আমি বলছিলাম যে আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে।'

ডক্টর চৌধুরী এ-কথার পরে চুপ করে দূরে তাকিয়ে থাকলেন খানিকক্ষণ, বললেন, 'ও তোমারও বুঝি মা নেই?' গলার স্বর কোমল শোনালো।

মুখ নিচু করে অঞ্জলি বললো, 'না।'

আবহাওয়াটা সহসা একটু করুণ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ঝেড়ে ফেললেন সুদর্শনের বাবা, হাসিমুখে বললেন, 'শোনো আমি যে একটা রাক্ষস খোক্কশ নই, আমাকেও যে কারো ভালো লাগতে পারে সে কথাটা আমার ছেলেকে একবার বলে দিয়ো। সে তো ভাবে তার বাবার মতো খারাপ মানুষ বুঝি দিন-দুনিয়ায় নেই।'

'নিশ্চয়ই বলবো।' অঞ্জলিও গলার স্বর সহাস্য করলো।

'এবার বুঝছ তো কে কেমন লোক।'

'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ?'

'আপনি খুব ভালো।'

'আর ঐ অপদার্থটা?'

'সেই, আপনি যা বললেন?'

'কী বললাম?'

'অপদার্থ না কী যেন?'

'আরে, এ দেখছি মহা চালাক মেয়ে, অ্যাঁ— খোকা, খোকা—' খোকা এলো না, চা নিয়ে নন্দু বেয়ারা এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে চটে গেলেন তিনি। মিষ্টি কথা মুহূর্তে অন্তর্হিত। লোকটিকে এই মারেন কি সেই মারেন 'তুই এলি কেন? আমি কি তোকে ডেকেছি? বেরোও, বেরোও এখান থেকে। গেট আউট। আমি তোমাকে স্যাক করলাম। যাও, এক্ষুনি চলে যাও তোমার কাপড়-জামা নিয়ে।'

অঞ্জলি প্রায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, তারপরেই বুঝে নিয়ে শান্ত গলায় বললো, 'আপনি বসুন, সব আমি ঠিক করে দিচ্ছি, এরা কেউ কিছু বোঝে না, তাই এ-রকম করে। আর এর তো কোন দোষ নেই, ওকে আমরাই চা আনতে বলেছি, আসল দোষ যার সে এখানে নেই, তাকে বরং ডেকে দিক।'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ। যাও, দাদাবাবুকে ডেকে আনো।' যেভাবে চটে উঠেছিলেন, সেভাবেই ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন তিনি, সহর্ষ দৃষ্টিতে পর্বত-প্রমাণ খাদ্যের দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ অন্য গলায় বললেন, 'বাঃ, নন্দু দেখছি বেশ এক্সপার্ট হয়ে উঠেছে। পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলাম তোমার।'

ডাকতে হলো না। সুদর্শন নিজেই উঠে এসেছিলো বাবার চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে। এসেই দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তখন হেসে-হেসে বলছিলেন, 'বুঝলে, আসলে ছেলেটা একটু খ্যাপা, ওর মা না থাকাতে কিছুই ওর মনোমতো হয় না কিনা, তাই চ্যাঁচামেচি করে। আমাকে দ্যাখো, আমি তো সব মেনে নিয়েছি, চ্যাঁচামেচি করে কী লাভ বলো? তা ও বুঝবে না। এবার তুমি যদি একটু মেজাজ-মর্জি ঠাণ্ডা করতে পারো।'

অঞ্জলিও হাসছিলো, হেসে বলছিলো, 'আপনার মতো শান্ত মেজাজ কি সকলের হয় নাকি? চায়ে চিনি দেব তো? আপনি এই সঙ্গেই রাত্তিরের খাবারটা খেয়ে নিন। প্লেটে করে সাজিয়ে দিচ্ছি। সব কিছু কিন্তু দেব না। জ্বরের মধ্যে সব খেলে গুরুপাক হবে। রাধাবল্লভী দু'খানা দিচ্ছি, একটু ছোলার ডাল, দুটো কাঁচাগোল্লা সন্দেশ আর একটা পান্তুয়া —এই দিলাম, কেমন?'

'দাও, যা খুশি দাও। কড়া ডাক্তারের হাতে পড়েছি যখন।' প্লেট টেনে নিয়ে ভোজনপটু বাবাকে সুদর্শন পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে দেখে দাঁড়িয়ে থেকেই মুচকি হাসলে সিঁড়ির মুখোমুখি বসে থাকা অঞ্জলির দিকে চোখ ফেলে। তার পরেই গলা-খাঁকারি দিয়ে সামনে এসে হন্তদন্ত হয়ে বলল, 'চলো, চলো এবার দিয়ে আসব তোমাকে।'

'এই যে এসেছেন শ্রীমান।' ছেলের দিকে তাকালেন তিনি, খুব প্রসন্ন মুখ। চায়ের পেয়ালা মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, 'জীবনে তো একটাও ভালো কাজ করতে দেখলাম না, তবু যা হোক এই

াপারে একটু বুদ্ধিসুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ। এসো, দয়া করে বসে কিছু খাও, দ্যাখো পরিবেশন
ছন্দ হয় কি না, সবটা নিয়েই তো তোমার সারাদিন কেবল খচখচি।'

বাবার চাইতে দ্বিগুণ প্রসন্ন মুখে চেয়ার টেনে বসে গেল সুদর্শন, অঞ্জলি তাকেও চা দিল, খাবার ল, ছেলে আর বাবা দেখতে-দেখতে বন্ধু হয়ে উঠে ভুলে গেলেন অতিথি তাঁরা নন, াতিথেয়তাটা আজ তাঁদেরই কর্তব্য ছিল। আর অঞ্জলিও দুটি পুরুষকে যত্ন করতে-করতে মাতৃস্নেহ নুভব করল হৃদয়ে, বুঝতে পারল দুটি শিশু যে কারণে একত্র হলেই মারামারি বাধায় এঁরা নও ঠিক তাই। সুদর্শনের ভাষায় এই দুটি উৎকৃষ্ট বৃক্ষ উন্মুল হয়েছে মাটি থেকে। 'আমিই এঁদের টি হবো, ভক্তিতে ভালোবাসায় সেবায় স্নেহে এঁদের আমি আবার সিক্ত করবো।' মনে মনে যেন ন্ত্রের মতো এই কটি কথা উচ্চারণ করল অঞ্জলি। এই প্রথম সে তার নারী-জীবনকে সার্থক মনে রল।

এর পরে কয়েকটা দিন বড়ো সুখে কেটেছিল, বড়ো শান্তিতে কেটেছিল। বাবার সঙ্গে বিরোধ টাতে পেরে সুদর্শনও যেমন আনন্দে ভাসছিল, তার নিজের বুক থেকেও একটা পাথর নেমে য়েছিল।

শেষে একদিন চোখ ভরা জল নিয়ে চলে গেল সুদর্শন। পথে পথে চিঠি লিখতে লিখতে গেল। য়ে সান্ত্বনা দিল, 'সোনামণি, মন খারাপ করো না। আমি এখানে কলকাতার দিকেই জানলা খুলে সে আছি সারাক্ষণ, সারাক্ষণ তোমাকে ভাবছি, সারাক্ষণ আমার প্রিয়তমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে দিন টাচ্ছি। যেদিন যে-মুহূর্তে কাজ শেষ হবে সেদিন সেই মুহূর্তেই জাহাজ ধরব। সম্ভব হলে উড়বো। মি আমাকে ততোদিনে ভুলে যাবে না তো? সীতেশের সঙ্গে দেখা হয়েছে। খুব ফুর্তিতে আছে, নলা তার সখীটিরও আগামী বছর আসবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ড়বে এই রকম পরিকল্পনা আছে তার, আপাতত টাকা জমাচ্ছে প্রাণপণে।

'বাবার সঙ্গে দেখা হয় কি ? যেয়ো মাঝে-মাঝে। তুমিই তো আমাদের সেতু, নইলে দুজনেই বো। পড়াশুনো কেমন চলছে? তোমার মাস্টারমশায়ের খবর কী? সীতেশ বলছিল, স্টারমশায় আছেন বলেই তোমার জন্য তার ভাবনা কম। তোমার শরীর কেমন আছে?'

এই সব চিঠি সম্বল করেই সুখে-দুঃখে কেটে গিয়েছিল বারো মাস। কিন্তু বারো মাসে কাজ ষ হলো না তার, এখানকার অসমাপ্ত কাজ নিয়েই চলে গিয়েছিল, সমাপ্ত হলো ষোলো মাসে। রপর পকেটে ডিগ্রি নিয়ে, হাতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা নিয়োগপত্র নিয়ে চলে এলো ফাতে-লাফাতে।

কিন্তু তার আগেই আই-এ পাস করল অঞ্জলি, বি-এতে ভর্তি হলো। মাস্টারমশায়ই সব লেন। নিজের বিষয়ে অনার্স নেওয়ালেন।

তাঁর আশা সফল করে অঞ্জলি সত্যিই দশজনের একজন হলো না, কোনোরকমে ফার্স্ট ভিশনে গিয়ে মুখরক্ষা করল।

কিন্তু একটু খটাখটি হলো সেই স্টাইপেন্ডের ব্যাপার নিয়ে। এবারেও মাস্টারমশায় বললেন, ানো খরচ লাগবে না তোমার।'

অঞ্জলি বলল, 'আমি খুব একটা ভালো ছাত্রী নই, যারা বৃত্তি পায় তারাই এ-রকম সাহায্য পেতে পারে, তাও চেষ্টাচরিত্র করে। কিন্তু আমি—'

মোটা কাচের চশমার ফাঁকে মাস্টারমশায় এমনভাবে তাকালেন, চুপ হয়ে গেল সে।

অনেক পরে জলদগম্ভীর গলায় বললেন, 'এ-সব ব্যাপার নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও সেটা আমি চাই না। আমি চাই তুমি তোমার কাজে মনোযোগী হও।'

অঞ্জলি তখন সীতেশকে স্মরণ করল। সীতেশ থাকতে তাকে কী পরামর্শ দিত সেটা ভাবলো, তারপর আর তা নিয়ে কথা বলল না।

মাঝে-মাঝে মাস্টারমশায় সীতেশদার খবরও নিতেন। জিজ্ঞেস করতেন, 'চিঠি-টিঠি পাও?'

'পাই।'

'কী লেখে?'

'এই পড়াশুনোর কথা—'

'আর?'

'ওখানে কেমন লাগছে, কী করছে—'

'আর?'

'আর কী লিখবে?'

'কবে ফিরে আসবে, কী করবে—'

'হ্যাঁ তা-ও লেখেন।'

'আর তারপরে সব ব্যক্তিগত কথা, কী বলো?'

অঞ্জলি চোখ তুলে তাকায়। কেমন এক রকম হাসেন তিনি, হেসে-হেসে বললেন, 'সে স[illegible] গোপন কথা বলা যায় না, না?'

কী অদ্ভুত। অঞ্জলি গুম হয়ে যায়। ভীষণ রাগ হয় তার। এমনিতে মাস্টারমশায় কত শা[illegible] সংযত একজন ভদ্রলোক, বাজে ব্যাপারে কখনো কোনো কৌতূহল নেই, অথচ সীতেশের ক[illegible] উঠলেই তিনি কেমন হয়ে যান।

এতো খারাপ লাগে! তখন যেন ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা সব উবে যেতে চায়। তা ব[illegible] সীতেশকে যে তিনি ভালোবাসেন না তাও নয়। কত সময় কত প্রশংসা করেন, উদ্বিগ্ন হন খবরে[illegible] জন্য।

মাস্টারমশায়ের নিষ্ঠা অধ্যবসায়, ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি তাঁর মমতা, মনোযোগ, অধ্যাপক হিসে[illegible] সাফল্য সবই উল্লেখযোগ্য। কলেজে সবাই মান্য করে তাঁকে, সবাই নিঃসংশয়ে জানে তাঁর ম[illegible] আদর্শবাদী সৎ মানুষ খুব বিরল।

কিন্তু এই একটা ব্যাপারে তিনি তাঁর আসন থেকে অনেকখানি নেমে যান অঞ্জলির চো[illegible] অঞ্জলি ভেবে পায় না বয়স্ক মানুষটির এই ধরনের ছেলেমানুষির অর্থটা কী?

তারও রাগও হয়, দুঃখও হয়।

একদিন বললেন, 'সীতেশের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কী রকম আমি যেন মাঝে-মাঝে ঠি[illegible] বুঝে উঠতে পারি না।'

সেই একই প্রশ্ন।

অঞ্জলি পেনসিল দিয়ে মনোযোগ সহকারে কী লিখতে লাগলো খাতার উপরে। এই প্রসঙ্গে সে ...র সময়েই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

মাস্টারমশায়ও বইয়ের পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করে একটা কিছু বোঝালেন। তারপরে আবার বই ...ন্ধ করে দিয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি কী বলো?'

'কী বিষয়ে?'

'তোমাদের সম্পর্কটা কি খুব সরল?'

এক পলক চোখ তুলে থমথমে গলায় অঞ্জলি বলল, 'সরল বা বাঁকার কথা নয়, আপনি জানেন ...তেশ আমার দাদা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাদা তো বটেই, তবে দাদাটি বস্তুতই দাদা আছে কি না সেটাই প্রশ্ন।'

'আপনার কী মনে হয়?'

'স্পষ্ট করে বললে কি সইতে পারবে?'

'আপনি স্পষ্ট করেই বলুন না।'

'না।'

'দেখুন, আমি আপনার ছাত্রী, আপনাকে আমি ভক্তি করি, কিন্তু এ-সব আলোচনা আমার ...মণ খারাপ লাগে।'

চুপ করে থেকে বললেন, 'তুমি কি আমার শুধুই ছাত্রী?'

'না, তা আমি বলছি না।'

'তা হলে কী বলছ?'

'আমি জানি, আপনি আমাকে কত স্নেহ করেন, ভালোবাসেন, কিন্তু—'

'না, এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই অঞ্জলি, আমরা যে এতদিন আর শুধুমাত্র মাস্টার আর ...ত্রীর মধ্যেই আবদ্ধ নেই তা অবশ্যই তুমি বুঝতে পেরেছ?'

'আমি বলছিলাম—'

'আমি কি আমার ব্যবহার খুব অস্পষ্ট রেখেছি?'

'আমি বলছিলাম—'

'তোমাকে কিছুই বলতে হবে না, বরং বাড়ি গিয়ে ভেবো একটু। পড়ো, কী পড়বে আজ। ...নবাবু কাল তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন, বলছিলেন মনোযোগ দিলে যত্ন নিলে তুমি হয়তো ...ই ভালো ফল পাবে। যত্ন নিতে আমার তো কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু মনোনিবেশ করাটা ...মারই হাতে। বই খোলো—'

।। ২৮ ।।

সুদর্শন এসে পৌঁছবার দিন কুড়ি আগে একদিন ভয়ানক উত্তেজিত মনে হলো মাস্টারমশায়কে। মাঝে কয়েকদিন আসতে পারেনি অঞ্জলি। সে-ও সুদর্শনের একটা চিঠি পেয়ে যথেষ্টই উত্তেজিত হয়েছিল। ফিরতি পথের জাহাজ ধরেছে সে, জানিয়ে দিয়েছে, কলকাতা পৌঁছবার তিন সপ্তাহের মধ্যেই বিবাহের ব্যবস্থা পাকা করা দরকার। কেননা তাকে সেই সময়ের মধ্যেই কাজে যোগ দিতে হবে দিল্লি গিয়ে। সুতরাং তার চেয়ে বেশি সময় সে কাটাতে পারবে না কলকাতায়। সে সেই মর্মে বাবাকেও লিখে দিয়েছে, যদি সম্ভব হয় অঞ্জলি যেন তার বাবা-মাকেও খবরটা জানিয়ে রাখে। আর যদি এমন হয় যে এর মধ্যে হিন্দু মতে পাঁজিপুঁথি মিলিয়ে দিনক্ষণ পাওয়া গেলনা, তা হলে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হবে। অঞ্জলি যেন তার জন্যও প্রস্তুত থাকে।

সেই প্রস্তুতি পর্বটাই চলছিল অঞ্জলির ভিতরে ভিতরে। যদিও বাবা-মাকে বলি-বলি করে বলতে পারেনি কিছু, তবুও প্রত্যেক মুহূর্তেই চেষ্টাটা করে যাচ্ছিল। তার কেবলই ভয় হচ্ছিল বলামাত্রই না জানি কী একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

সুদর্শনের বাবার কাছে ঠিক সেই একই কারণে সে গিয়ে উঠতে পারছিল না। শুধু ভয় নয় তাঁর কাছে লজ্জাও করছিল। মনে হচ্ছিল, এখন যাওয়া মানেই নিজের বিয়ের তদারক। ভাবছিল তার চেয়ে যার আসবার সে আসুক, যার বলবার সে-ই বলুক।

এই রকম একটা বিশ্রী পরিস্থিতির জন্য মাস্টারমশায়ের কাছেও যাওয়া হচ্ছিল না।

কিন্তু যেতেই তিনি বললেন, 'তা হলে সুদিন সমাগত? অ্যাঁ?'

এই প্রশ্নে অঞ্জলি চমকে উঠেছিলো। সে ভেবেছিলো, যে করে হোক তার আসন্ন বিবাহের প্রস্তাবটা বোধ হয় কানে গেছে মাস্টারমশায়ের।

লাল হয়ে উঠে সে তো-তো করে বলেছিলো 'কার কাছে শুনলেন?'

'কিছুই কি আর জানতে বাকি থাকে?'

অঞ্জলি অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত ভঙ্গিতে চুপ করে রইলো।

তিনি বললেন, 'যাক, তবু ভালো সীতেশ তার মনের ঢাকনাটা একটু খুলেছে।'

'সীতেশদা!'

'তাহলে আমি এতোদিন যা বলেছি এখন আব তুমি তা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবে না।'

'কী বলছেন আপনি? আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তা তো কোনোদিনই পারো না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও পারবে না। কিন্তু তোমার এই ভান আমি আর সহ্য কবতে পাবছি না।'

'ভান? কিসের ভান?'

'আমাকে লুকিয়ে তোমার দ্বিতীয জীবনেব ভান।'

'দ্বিতীয় জীবনের ভান?'

'আমাকে তুমি মান্য করো কি না?'

'নিশ্চয়ই করি, কিন্তু —'

'যদি মান্য করে থাক তা হলে একথাটাও মান্য করতে হবে, তোমার চলাফেরা মেলামেশা ইত্যাদি বিষয়ে আমি আমার বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী যা বলবো, তাই তুমি করবে।'

অঞ্জলির মুখ শক্ত হলো, বললো, 'আপনি আমার গুরুজন, শ্রদ্ধেয়, আপনি প্রয়োজন বোধ করলে নিশ্চয়ই শাসন করবেন, সুবুদ্ধি দেবেন, কিন্তু তারপরেও প্রত্যেক মানুষের কিছু কিছু ব্যক্তিগত বিষয় থাকে যেখানে কোনো মানুষেরই হস্তক্ষেপ শোভন নয়।'

'তোমার বিষয়ে আমার সব ব্যবহারই শোভন, সমস্ত অধিকাবই গ্রহণযোগ্য।'

'এটা আপনি ঠিক বলছেন না।'

মাস্টারমশায় ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে ভেজানো দরজার ছিটকিনিটা নিঃশব্দে তুলে দিয়ে ফিরে আসতে আসতে বললেন, 'আজ সাত দিন আমার কাজের লোক নেই, মরে গেলেও এক গ্লাস জল দেবার কেউ নেই, তুমি আসোনি কেন?'

এবার মাস্টারমশায়ের রাগের কারণটা বুঝে নম্র হলো অঞ্জলি। ক্ষমাপ্রার্থীর গলায় বললো, 'বাড়িতে সকলেরই অসুখ-বিসুখ, আমার কলেজ থেকে ফিরে গিয়ে আর বেরুনো হয়নি।'

'তোমার বাড়ির অসুখ-বিসুখ নিয়ে তুমি এত বিব্রত হতে পার, আর আমার অসুখ নিয়ে তোমার চিন্তা হয় না কেন?'

'আমি জানতাম না।' অঞ্জলি ব্যস্ত হয়ে উঠলো, 'কী অসুখ করেছে আপনাব? কলেজে যাননি?'

'ও, তাও তুমি লক্ষ্য করোনি?'

'বিষ্যুৎবার আমার অফ-ডে ছিলো, শুক্রবার আপনার ক্লাস ছিলো না — আর শনিবার—'

'থাক, কৈফিয়ত দিতে হবে না।' ঘন-ঘন পা ফেলে ঘরের ঐটুকু পবিসরে ঢোলা ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে তিনি ক্ষুব্ধ বিরক্ত হায়েনার মতো হাঁটছিলেন।

অঞ্জলি বললো, 'নকুল এখনো দেশ থেকে আসেনি?'

নকুল মাস্টারমশায়ের ছোকরা ভৃত্য।

গম্ভীরভাবে মাস্টারমশায বললেন 'না'।

'আপনি কী খাবেন বলুন, আমি করে রেখে যাবো। চা করে দেব?'

'না।'

'এ কয়দিন—'

'সে সব কথা থাক। মাস্টারমশায় দূরে একটা চেয়ারে বসলেন, তুমি কী জানো এই মুহূর্তে সীতেশই আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী?'

'কী!'

'এবং আমার সমস্ত অভিপ্রায়ের অন্তরায়?'

'কী অভিপ্রায়?'

'এবং সীতেশের চিঠি পেয়ে আমি রীতিমতো বিচলিত?'

'কী লিখেছে সীতেশদা?'

'সে আমার জীবনের মূলসুদ্ধ টেনে ধরেছে আজ।'

'সীতেশদা আপনাকে নিজের পিতার মতো ভালোবাসেন, আমি জানি, জ্ঞানত সে আপনা কোনো ক্ষতি করবে না।'

'এসব ক্ষেত্রে পিতা-পুত্রেও বিরোধ ঘটে।'

অঞ্জলি থমকে রইলো।

মাস্টারমশায় বললেন, 'আর কিছুদিনের মধ্যেই সে ফিরে আসছে, তার আগেই আমার জানাবার তা আমি তোমাকে জানাবো।'

এতোক্ষণ পরে চুরুটের কথা মনে পড়লো তাঁর। — 'এখন দেহমনের এই উত্তেজ অবস্থাতেই হয়তো বলা সহজ হবে।'

চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'শোনো, বিছানায় শুয়ে তিন দিন ধরে আমি সব ক সাজিয়েছি। নিজের মনের ছায়া আমি সম্পূর্ণ ধরতে পেরেছি, সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করেছি নিজে এবং এ-কথাও বুঝতে পেরেছি, অধিক অপেক্ষায় আর কোনো ফললাভের আশা নেই আমা অথচ প্রহসনটা দ্যাখো, প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাকে আমি সুখী করতে পারবো, সৌভাগ্য করতে পারবো, তোমার সব আঘাত, সব দুঃখ আমি আমার ত্যাগের দ্বারা নিবসন করে তোম কাছে মানুষ থেকে দেবতার আসনে উত্তীর্ণ হবো।'

একটা বোঝা না-বোঝার তরঙ্গের মধ্যে দোল খাচ্ছিলো অঞ্জলি, সে নির্বাক বিস্ময়ে ক শুনছিলো মাস্টারমশায়ের কথা। সহসা ভীতস্বরে বললো, 'আমি বরং আপনার খাবার ব্যবস্থ করে দিয়ে যাই—'

সে উঠেছিলো, ডক্টর সরকার বাতাসে হস্তসঞ্চালন করে তাকে বসতে বললেন। বললেন, 'কি দরকার নেই। ওটা তো সারাজীবনই আছে। কিন্তু উপযুক্ত মুহূর্ত সর্বদা আসে না।'

অঞ্জলি আবার বসলো।

চুরুটটা কামড়ালেন তিনি, 'বয়সে তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোটো। কিন্তু এটা নিশ্চয় জানো, একটা বয়েস পেরিয়ে গেলে, অন্তত মেয়েরা তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞ হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে ও সব বয়সের পুরুষের সমকক্ষ হয়ে যায়? স্বীকার করো কি না?

অঞ্জলি মাথা হেলালো।

'আমি তোমাকে সেই বয়েসটাতে পৌঁছতে দেবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'অপেক্ষা?'

'হ্যাঁ, অপেক্ষা। আমি তোমাকে আমার সঙ্গ দিয়ে, সান্নিধ্য দিয়ে, আর্থিক পরমার্থিক সমস্ত বক সাহায্য দিয়ে আমার বন্ধু হবার, সঙ্গী হবার যোগ্য করে তুলে নিতে চেয়েছিলাম, কেননা, তোমা মধ্যে আমি শুধু দেহের সৌন্দর্যই নয়, মানসিক সম্ভাবনাও দেখেছিলাম। তুমি যে পরিবেশ থে এসেছিলে, সেই পরিবেশের কোনো চিহ্ন তোমার মধ্যে ছিলো না। তুমি ছিলে ঠিক হাঁসের মতো

তোমার শাদা শরীরে কোনো ময়লাই ধরবার নয়। প্রথম দর্শনেই আমি সোনাকে সোনা বলে চিনতে পেরেছিলাম।'

কাঁদো-কাঁদো হয়ে অঞ্জলি বললো, 'সীতেশদা আপনাকে কী লিখেছে? কেন আপনি আমাকে এ-সব কথা বলছেন?'

'সেই সোনা ঘষে-মেজে তুলতে তুলতেই আমি বুঝে ফেলেছিলাম, আমার আগেই তুমি আর এক জহুরির হাতে পড়ে গেছ। এবং সে সীতেশ।'

'মাস্টারমশায়,' চোখ মুখ লাল করলো অঞ্জলি, 'আজ আমারও তাহলে কয়েকটা কথা আপনাকে জানানো দরকার। আমি বোকা নই, হয়তো বা কিছুটা সাংসারিক জ্ঞানের অভাবে অনেক কথা বুঝতে আমার দেরি হয়। কিন্তু আপনি যে আমার সীতেশদার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন, সেটা আমি অনেক আগেই বুঝেছিলাম। বুঝেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। বিশ্বাস না-করবার দরুন, সেই বোঝাটাকে গুরুত্ব দিইনি কোনো, তাছাড়া একথা আমি যতোবার সীতেশদাকে বলতে গেছি —'

'ও, এনিয়ে সীতেশের সঙ্গে তোমার কথাবার্তাও হয়েছে?'

'সীতেশদাকে না জানিয়ে আমি একটি পা ফেলিনি কোনোদিন।'

'উঃ,' মাথা ঝেঁকে কপাল টিপলেন তিনি, 'অঞ্জলি, আমি এমনিতেই অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি, আমার মধ্যে আর তুমি আগুন জ্বালিয়ো না। আমার ভালোবাসা অত্যন্ত প্রবল, সেখানে আমার কোনো ক্ষমা নেই, বিচার নেই, বিবেচনা নেই— একটি চুলপরিমাণ বাধাও সেখানে গণ্য করতে পারবো না।'

'মাস্টারমশায়!'

'তুমি সত্যি করে বলো, তুমি কি সীতেশকে ভালোবাসো? তুমি কি তাকেই বিবাহ করতে উৎসুক নও?'

প্রায় বজ্রপতনের মতো চমকে উঠলো অঞ্জলি। মাস্টারমশায়ের কথাবার্তা অবোধ্য মনে হচ্ছিলো, সন্দেহটা স্পষ্ট ছিলো, কিন্তু তিনি তাঁর চিন্তাটাকে অতদূরে নিয়ে গেছেন এটাই অঞ্জলি কল্পনা করতে পারেনি।

চুপ করে থেকে অনেক পরে বললো, 'আমি এবার যাই।'

'না।' মাস্টারমশায় বড়ো-বড়ো নিশ্বাস নিলেন, 'আমার কথা এখনো শেষ হয়নি।'

'আমি পরে আসবো।'

'হয়তো তখন বলতে পারবো না। মানুষ তার ভদ্রতা সভ্যতার খোলসে অভ্যস্ত, আজ যখন সেটা আমাকে মুক্তি দিয়েছে, আজই আমার দিন। কিন্তু তার আগে তুমি আমার কথার জবাব দাও।'

'কী কথার?'

পকেট থেকে বিলিতি ডাক টিকিটের ছাপমারা একটা নীল খাম তিনি ছুঁড়ে দিলেন অঞ্জলির কোলের উপর।

অঞ্জলি প্রথমে ভাবলো, এ চিঠি সে পড়বে না, মাস্টারমশায়ের কোনো কথার জবাবও সে

দেবে না এবং চলে যাবে এই মুহূর্তে।

কিন্তু চিঠি পড়ার কৌতূহল সে সামলাতে পারলো না। যে চিঠি পড়ে মাস্টারমশায় আজ এমন উন্মাদের মতো ব্যবহার করছেন সে কথাগুলো কী, সেটা জানার জন্য অদম্য ইচ্ছে হলো তার। সে চিঠিটা খুলে ধরলো চোখের তলায়।

অনেক কথার পরে শেষের দিকে লিখেছে, 'আমার একটা পরীক্ষা আছে সামনে, সেটা শেষ করে মাস কয়েকের মধ্যেই চলে আসছি। একটা কথা আপনাকে আমার জানানো হয়নি, আমি আসার আগেই আমার বিয়ে ঠিক করে এসেছিলাম, ফিরে গিয়ে সেটা সম্পন্ন হবে। আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনীয়। আপনার কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। অঞ্জলিকে আমি সব সময়ে লিখি তোমার আমার জীবন মাস্টারমশায়ের দানেই উজ্জ্বল। আমরা যেন কখনো তা ভুলে না যাই।'

চিঠি পড়ে অঞ্জলি হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারলো না। ঘরটা নিশ্চুপ ছিলো। কোনো দিক থেকে কোনো আওয়াজ আসছিলো না, মস্ত ছাদের এক কোণে এই একফোঁটা ফ্ল্যাটটাকে একটা নির্জন দ্বীপের মতো মনে হচ্ছিলো। মাস্টারমশায় উগ্র চোখে তাকিয়েছিলেন তার দিকে।

নিশ্বাস নিয়ে অঞ্জলি বললো, 'সীতেশদার যার সঙ্গে বিয়ে হবে, সে তার সহকর্মিণী।'

'কী!'

'দিল্লির আপিসে কাজ করছে।'

'আর তুমি?'

'আমি কোথায় তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন।' চিঠিটা ভাঁজ করলো সে। দৃঢ় পায়ে উঠে দাঁড়ালো।

'ও।' গলা নরম হলো তৎক্ষণাৎ, 'তাহলে একটা ভীষণ ভুল হয়েছিলো আমার। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো।'

অঞ্জলি দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, তিনি সেদিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন, 'তাহলে বলে যাও, আর কোনো বাধা নেই?'

অঞ্জলি জানলা দিয়ে মস্ত ছাদের একা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'কিসের বাধা?'

মাস্টারমশায় বললেন, 'মিলনের।'

'মিলনের!'

'অবাক হচ্ছো কেন? এতোক্ষণ ধরে তাহলে কী শুনলে তুমি?'

'এসব কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'না পারবার কারণ নেই কোনো।'

এতোদিনের এতো ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পরেও শান্ত শক্ত বয়স্ক এই বিদ্বান প্রফেসারটিকে ভীষণ ভয় পেলো অঞ্জলি। আর্তস্বরে বললো, 'আমাকে যেতে দিন।'

'না।'

'আপনি সরুন, আমি যাবো।'

'না।'

'রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'যাক।'

'আপনি জানেন, বাড়িতে আমাকে বকুনি খেতে হবে।'

'কে বকবে আমি ছাড়া—অত স্পর্ধা আর কাব আছে?'

'মাস্টারমশায়—'

'শোনো।'

'বলুন।' গলা কেঁপে গেল।

'কোথায় তুমি যেতে চাও?'

'আমি বাড়ি যাব না?'

'এটাও কি তোমার বাড়ি নয়?'

অঞ্জলি ভীত দৃষ্টিতে ছিটকিনি আঁটা দরজাটার দিকে তাকালো, মাস্টাবমশায়কে তার পাগল বলে মনে হচ্ছিল!

মাস্টারমশায় হাসলেন, দরজাটা সম্পূর্ণ আড়াল করে দাঁড়িয়ে নির্ঘোষের মতো বলে উঠলেন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'খ্যী!'

'আমি তোমাকে চ্চাই।'

'ডক্টর সরকার—'

'এবং আমি তোমাকে বিয়ে করবো। তুমি হবে আমার সহধর্মিণী, আমার সখী, আমার সর্বস্ব। তুমি এখন সেই বয়সে পৌঁছেছো যে বয়সের জন্য এতদিন ধৈর্য ধরে এত অপেক্ষা আমার।'

'না, না, না!'

'আমি অনুপযুক্ত নই।'

'আপনি আমার বাবার মতো। আমি আপনাকে —'

'স্বামীও মেয়েদের পক্ষে এক ধরনের বাবা, দু'জনই প্রোটেকশন দেয়—'

'না, না—'

'আমি দু'বছর ধরে মনস্থির করেছি।'

'কিন্তু—'

'না অঞ্জলি, আর কোনো কিন্তুরই স্থান নেই এখানে।'

'হয় না, হয় না—' ভয়ে দুঃখে দুই চোখে সে ঝাপসা দেখছিল।

মাস্টারমশায়ের চোয়াল শক্ত হল, বললেন, 'আমি আটশো টাকা মাইনে পাই, আমি সক্ষম, আমি—'

'আপনার অনেক গুণ, আপনি কৃতী, দাতা, আপনার করুণার সীমা নেই, আমাকে দয়া করুন, আমাকে যেতে দিন।'

'হ্যাঁ যাবে, কিন্তু বলে যাও কোথায় তোমার আপত্তি।'

দুর্ভোগ্যরও যেমন সীমা ছিল না, এখন ভাগ্যেও কোনো মাত্রাজ্ঞান দেখতে পেল না অঞ্জলি। এই স্বল্পবাক ধৃতিমান ব্যক্তিটি তাব পাণিপ্রার্থী— এ কি ভাগ্য নয়? ভালোবাসার এই প্রাবল্য— এ

কি ভাগ্য নয়? অথচ যে হতভাগিনী গ্রহণ করবে, সেই যে এ ক্ষেত্রে কত অসহায় তারও তে
কোনো সীমা নেই।

অঞ্জলি ঢোঁক গিলল। ভেবে পেল না কী জবাব দেবে এই প্রশ্নের।

মাস্টারমশাই নিজেই বললেন, 'বয়েস?' স্থির চোখে তাকিয়ে সামান্য হাসলেন, 'মানুষের বয়ে বছর গণনা করে নির্ণয় করো না, বয়েস মানুষের স্বাস্থ্যে স্বভাবে প্রাণপ্রাচুর্যে। আমার শক্তি একজন পঁচিশ থেকে তিরিশ বছরের যুবকের মতো। আমি উনিশ বছর বয়সে আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড় এক আত্মীয় মেয়েকে বিবাহ করেছিলাম, পাঁচ বছর তিনি বেঁচেছিলেন, আমি যখন চব্বিশে পৌঁছলাম, তিনি তখন অনন্তধামে পৌঁছলেন। একটি কন্যাসন্তান জন্মেছিল, বেঁচে থাকলে হয়তো তোমারই বয়সী হতো কেননা আমার সন্তানের সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান মাত্রই কুড়ি বছরের ছিল। তারপর সেই চব্বিশ বছর বয়েস থেকে এই বিয়াল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত আমি একজন সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেছি। আমি কখনো দ্বিতীয় মেয়ে বিবাহ করবার কথা চিন্তা করিনি কখনো কোনো স্ত্রীলোকের দ্বারা শরাহত হইনি। সুতরাং আমার বয়েস নিয়ে তুমি ভেবো না। আর তোমার কিসের দ্বিধা?'

অনেক নিপীড়ন সহ্য করে অঞ্জলি বড়ো হয়েছে, অনেক নিঃশব্দ যুদ্ধে সে জয়ী হয়েছে, সে ভিতু নয়, স্তিমিত নয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার সব শক্তিই যেন পরিত্যাগ করল তাকে, সে বড়ো বড়ো নিশ্বাস নিতে-নিতে ভাবল, পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি ছিটকিনিটা খুলে দৌড়ে পালিয়ে যাবে কি না। এবং পালাবার দ্রুততম উপায়টা কী?

শুধু তো ঘরের ছিটকিনিই নয়, ছাদ পেরিয়ে বেরুবার মুখের দরজাটাও তো বন্ধ। তারপরে খাড়া-খাড়া অন্ধকার সিঁড়ি। তেতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে একতলা, এতদূর পর্যন্ত একই রকম নীরব নির্জন। যাব যাব ফ্ল্যাট সে সে বন্ধ করে রাখে বেরুবার সময় শুধু ফাঁক হয়, তারপর আবার বন্ধ। যেহেতু সিঁড়িটা রাস্তা থেকে উঠেছে, সকলেই ভাবে চোর বুঝি সর্বদাই সমাগত। সবাই নিরাপত্তার ভয়ে সাবধান।

'বলো,' মাস্টারমশায় হাত ধরে তাকে সবেগে বসিয়ে দিলেন, 'বলো, তোমার আপত্তিটা তবে কোথায়?

ঝাঁকানি খেয়ে নিজেকে ফিরে পেল অঞ্জলি, স্পষ্ট গলায় বলল, 'বিবাহের শুধু সেইটাই একমাত্র শর্ত নয় অথবা সেটাই সবচেয়ে গৌণ। আমি আপনাকে অন্যভাবে দেখেছি, অন্যভাবে ভেবেছি আমার পক্ষে সেই সম্পর্কের তারতম্য ঘটানো অসম্ভব। আপনি আমার গুরুজন, পিতৃতুল্য—'

'ন্‌না!' গর্জন করে উঠলেন তিনি, 'তোমার অবস্থার মেয়ের পক্ষে আমাকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ শুধুমাত্র এটাই হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি না। তুমি আমার কাছে সত্য কথা বলছ না কেন?'

'সত্য কথা?'

'হ্যাঁ। আমি তোমার কাছে সেটাই আশা করি।'

'আমি—আমি—'

মাস্টারমশায় সনিশ্বাসে বললেন, 'তুমি কী? তুমি কী?'

'আমি আর একজনের কাছে প্রতিশ্রুত।'

মাস্টারমশায়ের গলায় হাহাকার উঠল, 'প্রতিশ্রুত! সে কে?'

'আপনি তাকে চিনবেন না।'

'সীতেশ?'

'না।'

'তবে?'

'সে অন্য একজন।'

'সে প্রতিশ্রুতি তুমি ভেঙে দাও।' গলা মুহূর্তে পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল!

অঞ্জলি দু'হাতে মুখ ঢেকে বলল, 'সে হয় না।'

'হয়। হয়। হতেই হবে।' মাস্টারমশায় ছটফট করলেন।

'আমি তাকে ভালোবাসি।' মুখ থেকে হাত সরালো অঞ্জলি, নত হয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

'ক্ষমা?' অসহ্য ঘামতে লাগলেন তিনি। 'আমি তো তোমাকে বলেছি, আমার ভালোবাসায় কোনো ক্ষমা নেই। যা আমি চাই তা আমি চাই।'

'আমাকে যেতে দিন।'

'যেখানে আমি হাত রাখি, ভেঙে গেলেও আমি হাত তুলে নিই না।'

'মাস্টারমশায়, আমি আপনার পায়ে পড়ি—'

'আমার ভালোবাসা ভীষণ, সর্বগ্রাসী। আমার সমস্ত বৃত্তিপ্রবৃত্তি আমি শুধু সেখানেই নিবদ্ধ রাখি। আমি তোমাকে প্রথম দিন থেকেই মনোনীত করেছিলাম, আমার স্ত্রী অনুরাধার পরে সেই প্রথম আমি ঠিক সেই দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম তোমার দিকে যে দৃষ্টি শুধু অনুরাধাই চিনতো। আমি অনুরাধাকে মনে রেখেছিলাম, তুমি তাকে ভুলিয়ে দিলে। আমাকে তুমিই শূন্য করেছ, এখন তুমি আমাকে কোথায় ফেলে রেখে যাবে।'

অঞ্জলি ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, আমরা দুজনেই দু'জনের কাছে প্রতিশ্রুত। আমাকেআপনি দয়া করুন।'

মাস্টারমশায় চোয়াল চেপে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলেন, তারপর দরজার সামনে থেকে সরে গিয়ে জানলার শিকে হাত রেখে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, 'তবে যাও।'

দরজা পর্যন্ত এসেছিল অঞ্জলি, হাতও রেখেছিল ছিটকিনিতে।

'অসম্ভব। অসম্ভব!' বিদ্যুতের মতো ছিটকে এসে তিনি ছিনিয়ে নিলেন তাকে।

অঞ্জলির গলা থেকে একটা ভয়ার্ত চীৎকার বেরিয়ে এসেছিল, হাতের পাতায় চাপা দিয়ে তিনি তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে বিছানায় ফেললেন, গুমগুমে গলায় বললেন, 'আমি পুরুষ, আমি কেন পরাজিত হবো? যা আমার, অবধারিতভাবে আমার, তাকে গ্রহণ করতে আমার কিসের লজ্জা? কিসের ভয়? কিসের বিবেক? চেঁচিয়ো না, হাত-পা ছুঁড়ো না, শুধু দ্যাখো, কাকে ভালোবাসা বলে, কাকে যৌবন বলে, এবং সেই যৌবন আমি কীভাবে রক্ষা করেছি।

তাঁর ঘামের স্রোত তাঁর সারা গা ভাসিয়ে অঞ্জলিকেও সিক্ত করছিল। হয়তো বা শুধু ঘামের স্রোতই নয়, রক্তের স্রোতও ছিল, অঞ্জলি তাকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছিল।

তিনি ঘন-ঘন নিশ্বাসে বলছিলেন, 'আমাকে মারো, আরো মারো, আমাকে তুমি মেরে ফ্যালো। কিন্তু তুমি দ্যাখো, আমার ভালোবাসা কী ভয়ানক, যার প্রচণ্ড ক্ষুধা থেকে আমিও মুক্তি পেলাম না, তুমি আমার সব-বিকিয়ে-দেযা প্রেম দ্যাখো একবার, যা আমাকে পশুত্বে পরিণত করেছে। তা নইলে কে কবে আমাকে এমন উত্তাল হতে দেখেছে? আমিও তো আমাকে কখনো এই আয়নায দেখিনি। আমার স্ত্রীও দ্যাখেনি। এমন রাক্ষসের হৃদয় নিয়ে আমি তাকেও ভালোবাসিনি। অঞ্জলি, অঞ্জলি, অঞ্জলি—'

।। ২৯ ।।

সেই রাত্রে বাড়ি ফিরে অঞ্জলি অজ্ঞান অচৈতন্যের মতো পড়ে ছিল সারারাত। মনোরমা কুৎসিত কথা বলে বকাবকি করছিলেন, দেরি করে বাড়ি ফেরার দরুন বাবাও বকাবকি করছিলেন, সে সব কথা কোথাও তার বিঁধছিল না, এ-সবের কোনো চেতনাই ছিল না। সকালে উঠতে গিয়ে দেখল মাথা তুলতে পারছে না।

সে বুঝতে পাবছিল, ভীষণ জ্বর হয়েছে, গায়ে অসম্ভব ব্যথা, চোখ দুটো পুড়ে যাচ্ছে, মাথা ছিঁড়ে পড়েছে, আগুনের মতো জ্বলছে, হাত পা, জিব একেবারে শুকনো, মুখ নোনতা, বিস্বাদ।

'জল। টুকু, এক গ্লাস জল।'

ঘরের সামনে দিয়ে যেতে-যেতে বাবা থমকে দাঁড়ালেন, ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেখে বললেন, 'কী হয়েছে? শুয়ে আছিস কেন? শরীর ভালো নেই?'

'জল।'

বাবা এগিয়ে এসে হাত রাখলেন কপালে, চমকে উঠে বললেন, 'ঈশ! এ যে পুড়ে যাচ্ছে। কী কাণ্ড।'

এর পরে ঘরে হয়তো আরো কেউ এসে থাকবে, হয়তো মনোরমাও এসেছিলেন, মাথার কাছে বসেছিলেন, হাওয়া করেছিলেন, বাবা সামনের ডাক্তারখানা থেকে দৌড়ে ওষুধ এনেছিলেন— সবই অঞ্জলির কাছে ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশার মতো অস্পষ্ট মনে হচ্ছিল। তারপর পুরো সাতদিন একই ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থেকে আট দিনেব দিন জ্বর ছাড়লো। এবং তার পরের দিন একটি চিঠি পেলো।

লেফাফার উপর হাতের লেখা দেখে বুক হিম হয়ে গিয়েছিল।

মাস্টারমশায়ের চিঠি।

অঞ্জলি,

'সূর্য কুন্তীকে ভোগ করে তার কুমারীত্ব ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, পরাশর সত্যবতীকে। এটা ধর্মের কথা, তখনকার সমাজের কথা, মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর কর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী দ্বৈপায়নের জন্মকথা। যদিও সেটাই সত্য হয় তবে এটাও সত্য হোক, আমিও আমার প্রিয়তমাকে তার কুমারীত্ব ফিরিয়ে দিলাম। প্রার্থনা করি, সে সুখী হোক, মনে কোনো গ্লানি না থাক। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেভাবেই ঘটুক না কেন, এটা এমন মারাত্মক অপরাধ বলেও আমি গণ্য করি না। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে মানুষের এই ধরনের পতন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অনৃতভাষী নীচমনা কূটপ্রকৃতি ঔদরিক এবং স্বার্থপর মানুষ সর্বদাই ক্ষমার অযোগ্য।

'তবুও শারীরিক প্রমাদবশত আমি আমাকে ছাড়িয়ে আমার স্বভাব এবং আদর্শ ছাড়িয়ে আমার সর্বাধিক প্রিয়কে যে কষ্ট দিয়েছি, সেই কষ্ট বহু কোটি গুণ হয়ে এ কয়দিন আমাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করে রেখেছে, মনে হচ্ছে একটা প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। তার আগে তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

তলায় কোনো নাম সই নেই। অঞ্জলি চিঠিটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে ছিঁড়ে ফেলল টুকরো টুকরো করে। বাইরে থেকে মনোরমা বললেন, 'কে চিঠি লিখেছে? সীতেশ বুঝি?'

মনোরমা বললেন, 'আসবে কবে?'

অঞ্জলি বলল, 'ঠিক নেই।'

পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলেই বাবা দরজার কাছে এসে বললেন, 'ডক্টর যোগেশ্বর সরকারই তো তোর স্টাইপেন্ডের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, না?'

'কেঁপে গিয়ে অঞ্জলি বলল, 'হ্যাঁ।'

'তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

'কী!'

'এই দ্যাখ, কাগজে লিখেছে, 'ডক্টর যোগেশ্বর সরকার একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ। তিনি একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া গুণীসমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁহাকে ভালোবাসিত, তিনিও তাঁহাদেব জন্য প্রাণ দিতেন। গতকাল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ তাঁহার গৃহভৃত্য নকুলচন্দ্র জানা দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডাকাডাকি এবং ধাক্কাধাক্কি করিয়া ভিতর হইতে বন্ধ দরজা খোলাইতে না পারিয়া ঘরের এ-পাশের জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখে যে তিনি তাঁর শয়নকক্ষের সিলিংয়ে পাখার আংটার সঙ্গে দড়ি লাগাইয়া ফাঁসিতে ঝুলিয়া আছেন, এবং দুর্গন্ধে জায়গাটা ভরিয়া গিয়াছে। লোকটি ভয় পাইয়া ছুটিয়া নীচে যায় এবং চিৎকার চেঁচামেচি করিয়া লোক জমাইয়া ফেলে। দোতলার ঠিকে ঝিটি নাকি দুইদিন আগে দুপুর বারোটা নাগাদ তাঁহাকে সামনের ডাক-বাক্সে একটি চিঠি ফেলিতে দেখিয়াছিল, চিঠি ফেলিয়াই তিনি চলিয়া আসেন এবং উপরে উঠিয়া যান। তাহাদের ধারণা, তাহার পর আর তিনি নামেন নাই। পুলিশ আসিয়া তাঁহার ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙিয়া ঘরে ঢোকে

এবং লাশ নামাইয়া মর্গে লইয়া যায়। মৃতের বিছানার উপর একটি খাতার পৃষ্ঠায় লেখা ছিলো, "আমার মৃত্যুর জন্য আমার পাপই দায়ী, আর কেউ নয়।"

মরা মাছের মতো পলকহীন নিষ্প্রাণ চোখে অঞ্জলি বাবার দিকে খবর পড়া শুনছিলো, পড়া শেষ হয়ে গেলেও তেমনিই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ, তারপর আস্তে-আস্তে বুক ভারি হয়ে কান্না এলো তার।

তার মাস্টারমশায়ের জন্য কষ্ট হচ্ছিলো, সে মনে-মনে বলছিলো, 'আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম। মৃত্যুর পরেও যদি সত্যিই মানুষের আত্মা বলে কিছু থাকে তার যেন সদ্‌গতি হয়।'

তারপর কয়েকটা দিন যে কী ভয়ংকরভাবে কেটেছিলো, তা শুধু অঞ্জলিই জানে। একবার মনে হচ্ছিলো সীতেশদা থাকলে হয়তো সে জুড়োতে পারতো একটু। তারপরেই মনে হলো, একথা কি বলা যেতো তাকে? একজন পুরুষকে? অসম্ভব। অসম্ভব। আর সুদর্শন? সুদর্শনকে বলা যেতো কি?

নিশ্চয়ই। একমাত্র মানুষ তো সুদর্শনই যার কাছে সে তার সমস্ত দুঃখ সমস্ত বেদনা সমস্ত লজ্জা অকপটে উদঘাটন করতে পারে। 'সুদর্শন, আমাকে তুমি বাঁচাও। এই গ্লানি থেকে আমাকে তুমি উদ্ধার করো।' এই আরম্ভ দিয়ে একটা চিঠিও লিখেছিলো সে। তারপরই ছিঁড়ে ফেললো কুটিকুটি করে। না, এ-কথা সে চিঠিতে লিখতে পারে না। লেখা উচিত নয়। এটা সুদর্শনের পক্ষে কিছু সুখের খবর নয়। যদি কাছে থাকতো, বলা যেতো, সব বলে হালকা হওয়া যেতো। কিন্তু চিঠিতে অসম্ভব। কী লিখবে সে? কেমন করে লিখবে? এই লজ্জার ভাষা কী? আর তাছাড়া এখন সে জাহাজে।

অসুখ এবং এই ব্যাপার মিলে তাকে খুব দুর্বল করে দিয়েছিলো, মানসিকভাবেও, শারীরিকভাবেও। তার মধ্যেই একদিন জ্যোতির্ময় পুরুষের মতো সুদর্শন প্রত্যাবৃত হলো কলকাতা শহরে। তার দিকে তাকিয়ে অঞ্জলির বিহ্বল হৃদয় তৎক্ষণাৎ ভুলে গেল সব দুঃখ, সব দৈন্য, ভাগ্যের সব নিষ্ঠুরতার কথা। কোনো যন্ত্রণা আর যেন অবশিষ্ট রইলো না। তারপরের কয়েকটা দিনের দ্রুততার তো কোনো তুলনাই নেই। বিবাহের প্রস্তাব, দিনক্ষণের হিসেব, ঠাকুর পুরুত, নিয়মকানুন—

সুদর্শনের বাবার কোনো আপত্তি ছিলো না রেজিস্ট্রেশনে, কিন্তু আপত্তি করলেন অঞ্জলির বাবা। আর মনোরমাও ঈর্ষা রাগ সব ভুলে মেতে উঠলেন বিয়েতে। বোধহয় বড়োলোক দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। জামাইয়ের চাল-চলন চেহারা দেখে সাহস পাননি কথা বলতে। আর মিষ্টিস্বভাবের সুদর্শনও বাচ্চাদের উপহার দিয়ে, গাড়ি চড়িয়ে বেড়িয়ে, মনোরমার মন জুগিয়ে, বাবাকে সম্ভ্রম করে একেবারে মোহিত করে দিল।

বিয়ের চতুর্থ দিনেই চলে এলো দিল্লিতে। পেঁজা তুলোর মতো নির্ভার হয়ে উড়ে যেতে লাগলো দিন। আদরে সোহাগে প্রেমে ভালোবাসায় মূর্ছার মতো কাটতে লাগলো যুগল-জীবন।

বাড়িটা বড়ো সুন্দর ছিলো। শহর থেকে একটু দূরে, নিরিবিলিতে, বলা যায় একটি নিকুঞ্জ। সেই নিকুঞ্জের দুটি পাখি, সে আর সুদর্শন। সুদর্শনের বাবাও এসে ঘুরে গেলেন; মহা খুশি। সবই ভালো। সবই সুন্দর। সবই সম্পূর্ণ।

কিন্তু তবু কি কখনো মন-খারাপ হতো না? হতো। কোনো কোনো ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে একটা সুতীক্ষ্ণ কণ্টক বিদ্ধ হতো হৃদয়ে, গোপনতার কণ্টক। অথচ তখন আর বলতে পারতো না, অনুভব করতো, কোথায় একটা লজ্জা আর সংকোচ মুখ চেপে ধরেছে। সেই সঙ্গে ভয় এবং বেদনা। অথচ সেই সময়ে, সেই সাংঘাতিক দুঃখের সময়ে সে আকুলিবিকুলি হয়ে সুদর্শনকেই চেয়েছিলো সব জানাবার জন্য। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেছে, উত্তাল তরঙ্গ এখন শান্ত। কাজেই গর্ত খুঁড়ে আর অশান্তির সাপকে টেনে বার করে কী লাভ?

তবু, যে তার অভিন্নহৃদয়, যার জন্য সে সব কিছু বিনিময় করতে পারে তার কাছে এই ভীষণ সত্যটি উন্মোচন করতে না-পেরে রক্তক্ষরণ হতো।

শুধু তো নিজের লজ্জাই নয়, মাস্টারমশায়কে হেয় করতেও আঘাত লাগতো তার। একটা মুহূর্তের স্খলনে মানুষটা যে অন্যায় করে মৃত্যু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে চলে গেছেন আর তাঁকে ঘৃণা দিয়ে দ্বিতীয় বার হত্যা করতে মন চাইতো না।

'কার ছবি, মা?'

পুরন্দর পিছনে এসে দাঁড়ালো। তারপর খাটের উপর পড়ে থাকা পোস্টকার্ড সাইজ পোকায় কাটা সুদর্শনের প্রতিকৃতিখানা হাতে নিয়ে ঘুরে মায়ের সামনে এসে বসলো, হাত থেকে পোর্টফোলিওটা ছুঁড়ে ফেললো ওপাশে।

ভীষণভাবে চমকে অঞ্জলি দেবী কেঁপে উঠেছিলেন, তারপরেই সচেষ্ট সংযমে উঠে গিয়ে আলমারি খুলে এটা-ওটা নাড়তে লাগলেন।

পুরন্দর চুপচাপ ছবির যুবকটিকে দেখতে দেখতে খাদের গলায় বললো, 'এই বুঝি?'

মুখ না-ফিরিয়ে অঞ্জলি দেবী অস্ফুটে বললেন, 'হ্যাঁ'।

'কোনোদিন তো দেখাওনি!'

'মনে ছিলো না।'

'ছিলো।'

'দেখে কী হতো?'

'হাজার হোক, বাপকে তো আর মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। মূর্তিটা চিনে রাখতুম।'

'তোর কাজকর্ম সব হলো? আর তো ছুটোছুটি করতে হবে না?'

'লোকটি দেখছি চেহারার দিক থেকে বেশ ভদ্রলোকেরই মতো, প্রথম বিভাগে পাশ করানো চলে।'

'তোর গরম কাপড়চোপড় বলতে গেলে তো নেই-ই দেখছি, তার মধ্যে পোকায় কেটেছে আবার। শুধু ওভারকোটটাই নতুন।'

'প্রায় আমার বয়সেরই ছবি।'

'আমাদের স্কুলের বিভাদি বলছিলেন বম্বেতে পান্থনিবাস বলে একটা অল্পদামের নতুন হোটেল হয়েছে—'

'আচ্ছা মা, তুমি যখন চলে এলে—'

এবার মুখ ফেরালেন অঞ্জলি দেবী, অস্থির গলায় বললেন, 'আঃ, ওসব কথা এখন থাক, রুদ্র—'

পুরন্দরও অস্থির গলায় বললো, 'থাকবে কেন?' আমার সব জানা দরকার।'

'জেনে কী হবে?'

'কী আবার হবে? নিজের জীবন নিজে জানবো না, এ কেমন কথা!'

'সবই তো জানিস।'

'না, জানি না। তুমি আমাকে যে অন্ধকারে ঢেকে বড়ো করে তুলেছ, কখনো কখনো আমার এমন সন্দেহও হয়েছে, পিতৃপরিচয়হীন এক অনাথ বালককে মানুষ করেই তুমি মা হয়েছ, আমি হয়তো তোমার গর্ভজাত সন্তান নই।'

অঞ্জলি ছেলের দিকে তাকালেন, বোঝা গেল বুকে তাঁর তীর বিদ্ধ হয়েছে।

হোক। মায়ের এই চিরাচরিত চাপা স্বভাব পুরন্দরকেও এক সময়ে কম তীর বেঁধায়নি। যে কবছর একটা শিশু অচেতন থাকে সে সময়টুকু বাদ দিলে পরবর্তী অনেক বছর, মানসিকভাবে সত্যি সে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছে। এই জন্যই ভোগ করেছে, তার মা তার বাবার বিষয়ে অস্বাভাবিকভাবে নিঃশব্দ ছিলেন। ছেলেমানুষি কৌতূহলবশত অনেক সময় সে জিজ্ঞাসা করেছে, 'মা, আমার বাবা কোথায়? মা জবাব দেননি, অন্য কাজে ব্যাপৃত রেখেছেন নিজেকে। বাবার নাম পর্যন্ত কতোদিন জানতো কি না তার ঠিক নেই।

অবশ্য বড়ো হয়ে সেই নৈঃশব্দ্যের সমস্ত অর্থই খুঁজে পেয়েছে, বাবার বিষয়ে মায়ের অভিমানকে সে সংগত বলেও মনে করেছে, তবু তার মন প্রবোধ মানেনি। তবু যেন কোথায় একটা সন্দেহের কাঁটা খচখচ করেছে।

মায়ের অভিমান যে শুধু তাঁর নৈঃশব্দেই সীমিত ছিলো তা নয়। মা নিজের বলতে কিছুই রাখেননি জীবনে। মা কখনো হসেননি, বেড়াননি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বসনভূষণ কিছুই তাঁর ছিলো না। হঠাৎ দেখলে তাঁকে সন্ন্যাসিনী বলে মনে হতো। মায়ের এই বৈরাগ্যের বেদনা সে বুঝেছিলো, বুঝেছিলো বাবা নামের ব্যক্তিটি একজন অতি বড়ো পাষণ্ড ছাড়া আর-কিছু নয়, এবং আত্মীয়-অনাত্মীয় মিলিয়ে এব ওর তার কথা জোড়া দিয়ে এও বুঝেছিলো, বাড়োলোকের পুত্রটি তার লাবণ্যময়ী মাকে দেখে একদা মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করলেও বাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না। তারপর শখ ফুরোতে ক'দিন লাগে? বিয়ের আগেই এক মেমসাহেবের সঙ্গে ভাব করে এসেছিলো বিলেতে, সেই মেম এসে একদিন হামলা করতেই তাড়িয়ে দিলেন স্ত্রীকে।

তবু—তবু যে কেন বাবাকে মন্দ ভাবতে তার কষ্ট হয় তা সে বুঝে উঠতে পারে না। বাবার বিষয়ে তার অদম্য কৌতূহল তাকে সেই অদেখা মানুষটির প্রতি আরো আকৃষ্ট করে। তাঁর সান্নিধ্যলাভের আশঙ্কায় সে অধীর হয়, চুপে-চুপে অতি নিভৃত হৃদয়ে বাবাকে সে ভালোবাসতে থাকে। আর তারপরেই মায়ের সব কথা বুঝেও অবুঝের মতো রাগ করে। অথচ বাবা নামটা তার

কাছে একটা সংজ্ঞা বা ধারণা ছাড়া আর কী?

তা হলে এই তার পিতৃদেব? ছবিটাকে পুরন্দর উলটে-পালটে দেখতে লাগলো। চমৎকার ফ্যাশনেবল যুবক। বাঁ হাতে সিগারেটটি ধরে, কোটের বাটনহোলে ফুলটি গুঁজে, কেমন সাহেব-সাহেব চেহারা করে হাসছে তাকিয়ে-তাকিয়ে। ঠিক তার দিকেই তাকিয়ে আছে, যেন এখুনি কথা বলে উঠবে। দেখতে খুব ভালো লাগছিলো পুরন্দরের, বুকটা কেমন ভরা-ভরা লাগছিলো।

ছেলের জন্য তাড়াতাড়ি চা তৈরি করে নিয়ে এলেন অঞ্জলি দেবী, জলখাবার নিয়ে এলেন। বললেন, 'সামান্য একটা ব্যাপারে কী হয়রানিই হচ্ছে। স্বাধীনতার আগে এ-সব ঝামেলা ছিলো না। আমরা রওনা হচ্ছি কবে?'

পুরন্দর চায়ে চুমুক দিতে-দিতে মাকে দেখলো, নিশ্বাস ফেলে বললো, 'শোনো মা, তুমি বম্বে পর্যন্ত যেয়ো না। মিছিমিছি যাবে কেন? সেই তো একা-একা ফিরতে হবে আবার?'

অঞ্জলি দেবী নিজেও এক কাপ চা ঢেলে নিলেন, বললেন, 'আমি ছুটি নিয়ে নিয়েছি ইস্কুল থেকে। আমার জন্য ভাবিস না।'

'না, তা ভাববো কেন? আমার তো তোমার জন্য কোনোই ভাবনা নেই কিনা।' পুরন্দর অভিমান করলো।

'রাগ করছিস?' অঞ্জলি দেবী সস্নেহ হাস্যে হাত রাখলেন পিঠে।

পুরন্দর বললো, 'জানি তোমার দুঃখকষ্টকে তুমি একাই আঁকড়ে রাখতে চাও, কিন্তু এখন যে তুমি একা নেই, সে কথাটা ভুলে যাও কেন বারে বারে?'

'ভুলে যাই?' হঠাৎ চোখে জল এসে যায় অঞ্জলি দেবীর। আজ বড়ো বিচলিত হয়েছেন, ছাইচাপা আগুন একটু উস্কানিতেই কেমন গনগনে হয়ে উঠছে। বিদ্যুতের মতো কতো কথা যে চমকে উঠছে বুকের মধ্যে! ভুলে-যাওয়া কত শত স্মৃতি ঘুমন্ত স্মরণশক্তিকে সতেজ করে তুলছে।

স্মৃতির চমক এই মুহূর্তে পুরন্দরকেও অভিভূত করলো। এবং এই ছবিটিই তার উপলক্ষ হয়ে মনে পড়িয়ে দিল তার শৈশব। পিতৃহীন শৈশব। যে সময় মা তাকে আদর করতেন, চুমু খেতেন, খাইয়ে-দাইয়ে পোশাক পরিয়ে আঙুল ধরে নিয়ে যেতেন তাঁর ইস্কুলে। নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখতেন নিচু ক্লাসের বাচ্চাদের সঙ্গে। বসে থেকে সে ঘুমে ঢুলে পড়তো, বুড়ো দারোয়ান মনবাহাদুর এসে কোলে করে নিয়ে যেতো।

মার কাছে শুনেছে, যখন আরো ছোটো ছিলো, হাঁটতে পারতো না, ইস্কুলে নিয়ে যাবার মতো বড়ো হয়নি, মা তখন একা ঘরে একটা কাঠের রেলিংয়ের মধ্যে (সেটাকে প্লে-পেনের অপভ্রংশ বলা যেতে পারে) বিছানা পেতে রাজ্যের খেলনা আর খাবার দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে বাইরে তালা ঝুলিয়ে চলে যেতেন। ইস্কুলের অল্প নিচেই ছিলো তাদের বাসস্থান, ছুটে ছুটে লাল হয়ে দেখে যেতেন এসে, টিফিনে এসে খাইয়ে যেতেন।

এ সময়গুলোর বিশেষ কোনো স্মৃতি নেই তার, বলা যায় তখনো সে অচেতন শিশুমাত্র। সে শুনেছে, প্রতিবেশীদের কাছে শুনেছে, শুনে-শুনে গেঁথে গেছে মনের মধ্যে। ভুলে গেছে শোনা না

ভাগ্য।

আর যতোদিনে তার জ্ঞান হলো, মনে রাখার শক্তি হলো, স্মৃতি হলো, ততোদিন থেকেই তো মায়ের কপালে রেখা দেখে অভ্যস্ত। দুঃখের রেখা, অপরিসীম দুঃখের রেখা। ধৈর্যের রেখা, সহ্যের রেখা। যে কষ্টে, যে যত্নে, যে নিষ্ঠায় তিনি তাঁর শিশুকে লালন করেছেন পালন করেছেন, তিলে তিলে বড়ো করে তুলেছেন, সেই রেখা।

কোনো কিছু নিয়েই মার বিলাস করা অভ্যাস ছিলো না, দুঃখের আগুনে একাই পুড়েছেন তিনি, তার তাপটুকু পর্যন্ত কোনোদিন টের পায়নি পুরন্দর। পুরন্দরও পায়নি, আশেপাশের কোনো লোকও পায়নি। তাঁর ঠোঁটের কোণে বিষণ্ণ হাসিটি সব সময়েই লেগে থেকেছে, সব সময়েই মিষ্টি করে কথা বলেছেন, সহিষ্ণুতার সঙ্গে অন্যের কথা শুনেছেন। বালক বয়সে বোঝা না-বোঝার দোলায় দুলতে-দুলতে এই লোকটির উপর, ছবির এই সুন্দর যুবকটির উপর, বাবা নামের একজন অদেখা অজানা অস্তিত্বের উপর ভীষণ আক্রোশে জ্বলেছে সে। যতো জ্বলেছে ততোই মায়ের প্রতি করুণায় বিগলিত হয়েছে, ভালোবাসায় আপ্লুত হয়েছে। মনে মনে সে বাবার সঙ্গে তর্ক করেছে, যুদ্ধ করে হারিয়ে দিয়েছে, তারপর কখন যেন ক্ষমা করে বন্ধু হয়ে সেই জন্মদাতা পাষণ্ড পুরুষটিকে অসম্ভব দেখতে ইচ্ছে করেছে তার। যে বয়সে ছেলেরা দুরন্ত হয়ে ওঠে অবাধ্য হয়ে ঘুড়ি ওড়ায়, লাট্টু খেলে, পাকা বন্ধুদের সঙ্গে নিষিদ্ধ কথা বলে এবং শেখে, গুরুজনের সঙ্গে চালাকি করে নানা দুষ্কর্মের সারথি হয়, সেই বয়সে সে কোনো নিভৃত কোণে বসে কল্পিত বাবার সঙ্গে একাত্ম হয়েছে, ফিসফিস করে বলেছে, 'বাবা, তোমাকে আমি ভালোবাসি।'

অনেক বড়ো হয়েও এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। যুক্তি দিয়ে মনে হয়েছে, বিশুদ্ধ কৌতূহল ছাড়া আর কী!

এখন এই মুহূর্তে মায়ের জন্য বুকের ভিতরটা তার টনটনিয়ে উঠলো। মাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতে কান্না উঠে আসতে চাইলো। তিন চার বছর তো কম সময় নয়, ফিরে এসে যদি দেখা না হয়!

ছি, এ সব কেন ভাবছে সে। এ-ভাবনা মোটেই একজন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের মতো নয়। কিন্তু তার মা-ও তো অন্য পাঁচজনের মতো মা নয় যে সে-ও সকলের মতো মন নিয়ে মা বিষয়ে ভাববে? মার প্রতি তার শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ভালোবাসাই নয়, মার জন্য তার কর্তব্য কৃতজ্ঞতা করুণা স্নেহ সব একসঙ্গে জট পাকিয়ে গেছে।

তাছাড়া মাকে সে পছন্দও করে। সাংঘাতিক কোনো মতবিরোধের প্রশ্ন এখনো ওঠেনি। সেটা কম কথা নয়, দুই জেনারেশনের পক্ষে। এবং সেইজন্যেই মা তার শুধুই মা নন, মা তার বন্ধু। মার সঙ্গে সময় কাটানো যায় গল্প করে।

কিন্তু এই ছবিটা মা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন এতোদিন ধরে? কেন তাকে দেখতে দেননি কখনো? এও কি একটা আত্মনির্যাতনের উপায়? যেমন তিনি শক্ত শয্যায় ঘুমোন, স্বেচ্ছাকৃতভাবে গরমে ঘামেন, শীতে ফাটেন, রোদে পোড়েন? প্রতিশোধের কী অদ্ভুত পদ্ধতি, অস্বীকারের কী

অভিনব উপায়। কিন্তু কী মনের জোর! অ্যাডমায়ার না করে পারে না পুরন্দর।

কিন্তু যার জন্য এ-ভাবে প্রতিনিয়ত পিষ্ট করছেন নিজেকে, সে কি দেখছে তাঁকে? তবে কার জন্য এই ত্যাগ? কার জন্য?

॥ ৩০ ॥

চায়ের বাসন কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন অঞ্জলিদেবী; তাকিয়ে সেই সব দিনগুলো সে দেখতে পেলো, ছবি হয়ে ভেসে উঠলো চোখে। পাহাড়ি দেশের সেই হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যে মা শুধুই একটা হাতে বোনা স্কার্ফ গায়ে দিয়ে স্কুলে যাচ্ছেন, পরনে হালকা পাড়ের শস্তা দামের শাড়ি, গায়ে মোটা ব্লাউজ, পায়ে কেডস। দিনের পর দিন সেই একই ছবি। হেঁটে-হেঁটে অনেক দূর পর্যন্ত আসতো সে মায়ের সঙ্গে, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামতো, বিদায় নিত 'বাই বাই' বলে। তার নিজের পরনে কিন্তু দামী সার্ট প্যান্ট কোট ওভার কোট মোজা জুতো সব থাকতো। তাও কতো সময় বলতো 'শীত করছে, মা।' মা বলতেন 'আহা, ষাট ষাট, কাল তোমাকে আরও গরম উলের সোয়েটার এনে দেব একটা।'

ভোরে উঠে মা নিজেই তাকে পোশাক পরিয়ে দিতেন, রুটি মাখন দুধ কলা ডিম দিয়ে তার প্রাতঃকালীন আহার সমাপ্ত হড়তো, মা শুধু এক বাটি চা।

বড়ো হয়ে খেয়াল করে সে বলতো, 'আর-কিছু খেলে না মা?'

'না সোনা, আমার তো অনেক কাজ করতে হয়, খেলে বেশি কাজ করা যায় না।' মা এমন করে বলতেন যে, তার শিশু হৃদয় কোনো সন্দেহের অবকাশ পেতো না।

স্কুল ছিল সকালে। রোদ ফুটতো না তখনো, দিকদিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো কুয়াশায়. মা কাকঝোরার রাস্তায় মিলিয়ে যেতেন এক সময়ে, সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তারপর ফিরে এসে পড়তে বসতো। সে বুঝতে পারতো, যতোই দুধ ডিম রুটি মাখন খাক না কেন, যতো ভালো পোশাকই পরুক না কেন, এর মধ্যে মস্ত একটা ফাঁকি লুকিয়ে আছে, যেখান থেকে নিস্তার পেতে হলে তাকে ঠিকমতো পড়াশুনো করতে হবে, স্কুলে যেতে হবে, এ বাড়ি ছাড়তে হবে। মাও অবশ্য নানাভাবে নানা গল্পের মধ্যে দিয়ে নানা কথা বোঝাতেন তাকে। সেই গল্পের সারাংশও তাই ছিল এবং সেই সারাংশ তার মাথার মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল।

যে-স্কুলটায় মা কাজ করতেন, নেহাতই বাচ্চাদের স্কুল। মাইনে যৎসামান্য। কিন্তু বাড়িতে-বাড়িতে টিউশনি করতেন তিনি, তাছাড়া আরো যে কতো কাজ করতেন মনেও নেই সব। জীবিকার জন্য সেই চূড়ান্ত কষ্টের কথা চিন্তা করলে এখন বুঝতে পারে আত্মত্যাগ কাকে বলে। তাঁর নিজের তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। সবই তো পুরন্দরের জন্য। পুরন্দরের জামা জুতো ছাতা ওয়াটারপ্রুফ, নামী স্কুলের মাইনে. দামী টিফিন ইত্যাদির জন্য। কোনো অভাবের কথা জানতোই

না সে। ববং প্রাচুর্যের মধ্যেই তাকে মা ডুবিয়ে বেখেছিলেন।

শুধু কি প্রাতঃকালীন আহারেরই ডিম দুধ? মাছ মাংস ফল, কী না? তাকে বাঁচিয়ে রাখতে, সুখে রাখতে, ভালো রাখতে কী না করেছেন এই মহিলাটি। মা নামের যে এতো মহিমা সেটা অন্তত বোঝা গেছে এই মাকে দেখে।

শুধু বাসস্থানটাই যা খারাপ ছিল, শস্তা ছিল। সেটা আর কিছু করতে পারেননি। তারই দাম ছিল পনেরো টাকা।

আসলে ওটা একটা বাড়িই না। কোনো কাঠগুদামের অংশ মাত্র। পাথরের দেয়াল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জলবেরুতো সারাদিন। সারাদিন হিম হয়ে থাকতো ঘরটা। শুধু বিকেলে রোদ পড়তো জানালা দিয়ে, বাকি সময় অন্ধকার। এতো স্যাঁৎসেঁতে ছিল যে জামা কাপড়ে প্রত্যেকদিন ছাতা ধরতো। মা কেবল ঝাড়তেন আর রোদে দিতেন। উঠোনে খুব রোদ ছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে একটা গলি পার হয়ে মস্ত আঙিনা, মিস্ত্রিরা কাজ কবতো বসে-বসে, ঘষর ঘষর আওয়াজ উঠতো কাঠ কাটবার, ঠুকঠাক পেরেক লাগাতো, ধুপধাপ জিনিসপত্র ফেলতো, রোদে ঝকঝক করতো সেই সমতল জায়গাটা।

ঘরটাও বেশ বড়ো ছিল। পিছনে তাকালে অতল সবুজ খাদ, পাশে আকাশ ঢেকে খাড়াই পাহাড়। মা মেঝেতে পুরু করে খড় বিছিয়ে তার উপর সতরঞ্জি পেতে রাখতেন, নইলে মাটিতে পা পড়লে হাঁটু পর্যন্ত কনকন করে উঠতো।

মিস্ত্রিদের কাছ থেকেই ফেলে ছড়িয়ে দেয়া সব টুকরো কাঠ এনে ইটের পায়া দিয়ে তাকে টেবিল চেয়ার করে দিয়েছিলেন, বইয়ের তাক করে দিয়েছিলেন, খাবার লম্বা আসন করে দিয়েছিলেন। ছুটির দিনে মাসে অন্তত একবার রঙিন কাগজ আর ছবি ইত্যাদি সেঁটে দিতেন পাথরের দেয়ালে, ঠাণ্ডাও কিছুটা আটকাতো, অন্ধকার ঘরে কিছুটা উজ্জ্বলতাও পাওয়া যেতো। ভিজে গেলেই ফেলে দিয়ে আবার সাঁটতেন। যেদিন নতুন করে সাঁটা হত, খুব সুন্দর দেখাতো। ফুলদানিতে বুনো ফুল সাজিয়ে, জানলায় পর্দা দিয়ে, রঙিন চাদরে বিছানা ঢেকে বেশ লাগতো তখন।

স্পষ্ট মনে আছে একটা চাকাওলা বাক্স ছিল, লম্বা হাতল ছিল, আগে বোধ হয় ওটা তার পিবাম্বুলেটার হিসেবেই ব্যবহৃত হতো, শুনেছে ওটায় করে ঠেলে মা তাকে উঠোনে এনে বসিয়ে রাখতেন স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে, রোদ লাগতো গায়ে। বড়ো হ'য়েও চার পাঁচ বছর বয়সেও ওটার মধ্যে বসে থেকেছে সে উঠোনে। কাঠগুদোমের মিস্ত্রিরা কাজ করতো, বাক্সটার চাকা লাগিয়ে হাতল দিয়ে তাদের দিয়েই মা তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন, তারাই দেখাশুনো করতো তাকে, বলতো 'খোখা, তুম তো রাজাবাবু হ।' মিস্তিরি ভাইয়াদের সেও খুব ভালোবাসতো।

তবে আসল দেখাশুনোর লোক ছিল, বুড়ো মনবাহাদুর আর তার বউ। তারা তাকে প্রাণতুল্য ভালোবাসতো। মনবাহাদুর ছিল তার নানা, আর তার বউ মায়লি ছিল তাব নানিমা।

খুব গয়না পরতো নানিমা। কানে এতো বড়ো বড়ো ফুটোর মধ্যে এতো বড়ো সোনার ফুল, গলায় পুঁতি আর সোনা দিয়ে গাঁথা মস্ত মোটা মুণ্ডমালার মতো একটা জিনিস। তোবড়ানো গালের রং একদম গোলাপী। একটা মখমলের ব্লাউজ পরতো, কবেকার পুরোনো জিরজিরে, বুকে চেপে

চেপে আদর করতো তাকে। পুরো দশ-দশটা বছর সেই একই বাড়িতে একই সংস্রবে দিন কেটে গেছে, পুরন্দর জানতো না ঐ সব নেপালী স্ত্রীপুরুষ ছাড়া আর কোনো পরিজন আছে তাদের। শুধু একজন বাঙালি বুড়ো নেপাল ডাক্তার ছাড়া। মা বলেছিলেন, এই ডাক্তার তাব অনেকদিনের পরিচিত। মাঝে-মাঝে আসতেন তিনি, খুব ভালো লাগতো তাঁকে। ভদ্রলোক বিপত্নীক ছিলেন, একা থাকতেন, ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছিলেন কলকাতা থেকে। এটা তাঁর শ্বশুরবাড়ির দেশ, এখানেই আবার নতুন করে প্র্যাকটিস জমিয়ে নিয়েছিলেন।

পুরন্দর জানতো মা তাকে পেটে নিয়ে স্বামীর গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। বড়ো হয়ে আস্তে-আস্তে আরও অনেক খবরই সংগৃহীত হয়েছিল। মায়ের বিবাহ-পূর্ব বৃত্তান্ত অনেক সময় দার্জিলিংয়ের নেপাল ডাক্তারই বলতেন কথাপ্রসঙ্গে। পরে কলকাতা এসে বিবাহিত মায়ের বৃত্তান্ত কর্ণগোচর হয়েছে এর ওর তার মাধ্যমে। আত্মীয়-পরিজন বলতে মার যে খুব অন্তরঙ্গ কেউ ছিল না সেটা বুঝে নিয়েছিল এবং এটাও বুঝে নিয়েছিল যে দার্জিলিং পাহাড়ের এই কাকঝোরা অঞ্চলের নিচু রাস্তায় কাঠগুদোমের স্বেচ্ছানির্বাসন শুধুমাত্র সেই অভাবের জন্যই নয়, তার কারণ আরও গভীর। আসলে স্বামীব নিন্দা ঢাকতেই তিনি এ-রকম বিচ্ছিন্ন এবং গোপন জীবন যাপন করছিলেন। পাঁচজন জটলা করে পাঁচ রকম প্রশ্ন করবে এটা সহনীয় নয়, তাঁর মতো চরিত্রের মানুষেব পক্ষে। পরিত্যক্তা স্ত্রী সকলেরই কৃপার পাত্র, কৌতূহলের বস্তু। সেটাই বা মা সহ্য করবেন কেমন করে?

মনে শক্তি ছিল, সাহস ছিল, জেদ ছিল, ছেলেকেও সসম্মানে বড়ো করে তুলেছিলেন।

ভালোই করেছিলেন। খুব ভালো করেছিলেন। নিজের দুঃখ নিজেব মধ্যেই আবদ্ধ রেখে অনেক অহেতুক অসম্মান থেকেই রেহাই পেয়েছিলেন। আব লজ্জা! লজ্জাই কি কম? সেই লজ্জা তিনি বাখতেন কোথায়, যদি এই নির্বান্ধব নিঃসঙ্গ জীবনেব অন্ধকাব তাঁকে আবৃত করে না বাখতো?

দশ বছর বয়সে প্রথম ঠাঁই নড়ালো তারা, মা কলকাতায় এলেন।

একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে দেখলো, তিনি ট্রাঙ্ক গুছোচ্ছেন। বই টই ফেলে বসে পড়লো পাশে। ট্রাঙ্ক খুললেই কী সুন্দর ন্যাপথলিনেব গন্ধ বেরুতো, কতো ছোটোখাটো জিনিস, কতো না-দেখা শাড়ি ব্লাউজ, কতো স্মৃতির সমুদ্র।

মা পাশে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আমবা কাল কলকাতা যাবো, জানিস?'

'কলকাতা!' চোখের তারা ছিটকে এলো তাব।

'তোর কী ইচ্ছে?'

এর আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে নাকি? কলকাতা যাবে কি যাবে না, এব আবার কোনো জিজ্ঞাসা আছে নাকি? এই সব প্রশ্নের অতীত কথা বলার কোনো অর্থ হয় নাকি? মর্ত্যের স্বর্গ কলকাতার নাম শুনে সে তো অবশ হয়ে গেছে।

'সত্যি, মা? সত্যি যাবো?' গলা ধবে ঝুলে পড়লো।

মা বললেন, 'কলকাতায় না গেলে ভালো বাংলা শিখবি কী করে? ভালো স্কুল-কলেজ কোথায়

পাবি? দেখবি কতো বড়ো একটা জগৎ।'

সে কথা জানে পুরন্দর। কলকাতা তো তখন তার কাছে একটা স্বপ্নরাজ্য মাত্র। কলকাতার গল্প কতো শুনেছে সে। শৈশবে মনবাহাদুর তার মন ভোলাবার জন্য কতো কেলকাত্তাই কসরৎ দেখিয়েছে ডিগবাজি খেয়ে, মনবাহাদুরের বউ কেলকাত্তার ছড়া গেয়ে ঘুম পাড়িয়েছে, বাঁদর নাচ ভালুক নাচ সব খেলা কলকাত্তার গল্প বানিয়ে। গাঁইয়া বাঁদর কেমন করে কেলকাত্তার বুড়হিকে বিহা করলো, কেলকাত্তার বুড়হি কেমন করে তাকে ছেড়ে চলে গেল, গোদা ভালুকটা কেলকাত্তা গিয়ে কী দেখলো, কেমন করে মিস্টার কেলকাত্তা হলো, এ সব শুনতে-শুনতে কতোদিন সে উড়ে-উড়ে কলকাত্তা চলে গিয়েছে তার কি ঠিক আছে নাকি কিছু? সমানবয়সী নেপালি ছেলেমেয়েদের জীবনেও ঐ একটাই উচ্চাদর্শ ছিল যে কোনো-না কোনোদিন তারা কেলকাত্তা যাবে, পালিয়ে গেলেও যাবে। কোনো ভালো জিনিস দেখলেই তারা বলতো, 'ই তো কলকাত্তাকা চীজ।'

যখন বসন্ত শরতের সিজনে কলকাতার কেষ্টবিষ্টুরা সব পাহাড়ে বেড়াতে এসে সেজেগুজে ম্যাল রাউন্ড দিত, বাচ্চারা মেয়েরা খচ্চরের পিঠে চড়ে দূরে চলে যেতো, পুরুষেরা যোধপুরী ব্রীচেস পরে কেঁপে কেঁপে ঘোড়ার পিঠে উঠতো, ওরা ছুটে-ছুটে দেখতে আসতো। মা কিন্তু আটকে দিতেন তাকে, বলতেন 'ছি, ওরকম যেতে হয় না, লোকেরা হ্যাংলা বলে।'

সেই কলকাতায় মা যাচ্ছেন? সেও যাচ্ছে? এও কি সম্ভব?

কিন্তু সেই অসম্ভবকে মা কেমন করে সম্ভব করেছিলেন, কে জানে। একদিন তারা সত্যি কলকাতা এসে পৌঁছলো। অবশ্য ঠিক কলকাতা নয়, হাওড়া। পুরোনো পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যে চিরদিনের জন্য চলে আসছে তা অবশ্য জানতো না পুরন্দর। সে ভেবেছিলো বেড়িয়ে ফিরে যাবে। বন্ধুদের অনেক গল্প করবে তখন। সাদর উপহারের অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েও এসেছিলো। বিদায় দিতে সাশ্রুনয়নে দাঁড়িয়েছিল তারা, মনবাহাদুর আর তার স্ত্রী স্টেশনে এসে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল, মা-ও চোখ মুছছিলেন, তার কিন্তু কিচ্ছু দুঃখ হচ্ছিল না, চোখ কুঁচকে মনে-মনে বলছিল সব ছেলেমানুষ। একটু বেড়াতে যাচ্ছে তাই কান্নাকাটি।

এখন সেই সব মুখ কোথায় হারিয়ে গেছে! দেখলেই কি চেনা যাবে? আজও পর্যন্ত ভাবলে নস্টালজিয়া হয়।

যখন জেনেছিল আর ফেরা হবে না, কান্না পেয়েছিল। কিছুতেই মন বসাতে পারছিল না। সেটাই তো তার দেশ, তারাই তো তার আত্মীয়, এখানে এই শহরের ঘিঞ্জিতে নোংরায় ইটকাঠের শুষ্কতায় প্রতিবেশীদের ঔদাসীন্যে পাহাড়ি বালক পুরন্দরের দম আটকে আসতো। সেই ঘন সবুজের জন্য, আকাশ-ছাপানো পাহাড়ের জন্য, কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার-চূড়ার জন্য চোখ তৃষিত হয়ে উঠতো। সরল নেপালি বালক-বালিকাদের বন্ধুতার অভাবে হাহাকার করতো প্রাণ। মনবাহাদুরকে সে কেঁদে-কেটে একটা চিঠিও লিখেছিল বাংলা ভাষায়, তার বউকেও লিখেছিল, তোমরা চলে এসো, আমি আর থাকতে পারছি না তোমাদের ছেড়ে।

॥৩১॥

মা হাওড়ার কোনো একটি স্কুলেই কাজ জোগাড় করে চলে এসেছিলেন। আসল কথা চেষ্টাচরিত্র করে কোনোরকমে বি এ পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলতে চাইছিলেন তিনি; বি এ পাস করলে অন্তত একটু উঁচুতে উঠতে পারেন। বি টি-টা দিতে পারেন। পুরন্দর বড়ো হয়ে উঠলে তার শিক্ষাব খাতে আরো বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে, সে-কথা ভেবে নিজেকে তখন থেকেই যোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করছিলেন। তারপর আসবার বেশ কিছুদিন বাদে, সে তখন আবার ভর্তি হয়ে গেছে স্কুলে, হঠাৎ মার সঙ্গে বাসে যেতে-যেতে এক বুড়ো ভদ্রলোকের দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোকটি মাকে অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছিলেন, মা খেয়াল করেননি। হঠাৎ নিজের আসন থেকে উঠে এসে বললেন, 'অঞ্জু না?'

চমকে ফিরে তাকালেন মা, তারপর শান্তভাবে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'তুই? তুই কোত্থেকে?'

'আমি হাওড়ায় থাকি।'

'হাওড়া? আমিও তো হাওড়ায় থাকি।

'ও।' মা তেমনি নিস্তাপ।

'ছোটো একটা বাড়ি কিনেছি সস্তায়, কিন্তু তোকে তো কখনো দেখিনি। আমি শুনেছিলাম—'

'আমি দার্জিলিংয়ে ছিলাম। অল্পদিন এসেছি।'

'এটি কে ? ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ সুন্দর ছেলে তো।' দুঃখিত স্বরে বললেন, 'আমি সব শুনেছি। এমন চাঁদের মতো ছেলে? যাকগে, ঠিকানা বল দেখি তাড়াতাড়ি ?'

'তুমি কি এখানেই নেমে যাবে?' একটু যেন নড়ে-চড়ে উঠলেন মা।

'এই তো আমার স্টপ। আসবি? আয় না। বাড়িটা চিনে যাবি।'

চুপ করে থেকে মা বললেন, 'তুমি বরং চলো না।' গলায় আগ্রহ ফুটলো। 'চলো আমার বাড়িতে নিয়ে যাই তোমাকে।'

'যাবো?' ভদ্রলোক একটু দ্বিধা করলেন, তারপরেই বললেন, 'আচ্ছা চল। কতোদিন পরে দেখছি। কী কাণ্ড ! কোথায় যে চলে গেলি।'

সেই বুড়ো ভদ্রলোক মায়ের বাবা।

'বাবা? তোমার বাবা? শুনে পুরন্দর একেবারে বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো। 'সত্যিকার বাবা?'

অঞ্জলি করুণ রেখায় হাসলেন, 'বাবা কি কারো মিথ্যে হয় নাকি বোকা ছেলে?'

'তবে এতোদিন বাবা কেন আসেননি তোমার কাছে?'

'আমি তো অনেক দূরে ছিলাম।'

'তুমি কেন যাওনি বাবার কাছে?'

'দূর থেকে যাওয়া কষ্ট বলে।'

'এসেও কেন বাবাকে ডাকোনি?'

'ঠিকানা জানতাম না।'

'তবে তোমার বাবাও বুঝি আমার বাবার মতো? নিজের মেয়ের ঠিকানা জানে না, এ আবার হয় নাকি?'

মা চুপ করলেন। পুরন্দর ভাবতে লাগলো। মায়ের বাবার কথা নয়। তার নিজের বাবার কথা। মনে হলো এমনি করে একদিন সেও দেখতে পেয়ে যাবে তার বাবাকে। কী করে চিনবে সে কথাটা তখন তার মনে হয়নি। কিন্তু আজ, এই এখন হলো। এই বড়ো বয়সের পুরন্দরের। অবাক হয়ে ভাবলো, এই ছবিটা না দেখলে আমি কেমন করে চিনতাম তাঁকে? ছেলেবেলায় মানুষ কী বোকাই না থাকে।

দাদুর সঙ্গে সেদিন লজ্জার বেড়া ডিঙিয়ে খুব বেশি আলাপ জমলো না। তার উপরে দাদু ভয়ানক দুঃখের কথা বললেন। এতো দুঃখের কথা যে মা এবং দাদু তারপর দুজনেই বসে থাকলেন চুপ করে।

একটা দুঃখের কথা বললেন 'তোমার মা আজ দুবছর হলো আমাদের মায়া কাটিয়েছেন।'

মায়ের মা-ও ছিলেন তবে? কী আশ্চর্য!

মা অবিচলিতভাবে বললেন, 'ও। কী হয়েছিলো?'

নিজের মা মরে গেছেন তবু মা কাঁদছেন না? কী আশ্চর্য।

দাদু বললেন, 'ক্যানসার। প্রায় বছরখানেক ভুগলেন। খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন।'

মা মাথা নিচু করলেন। নিশ্বাস ফেলে দাদু বললেন, 'ছোটো মেয়েটাও গেছে।'

'অ্যাঁ? খুকু নেই?'

'তবু ভালো তোমার মায়ের মৃত্যুর আগে যায়নি। ছিলো টুকুর কাছে ভাগলপুরে। নিউমোনিয়া হয়েছিলো।'

মা বললেন, 'টুকুর কবে বিয়ে হলো?'

'সে তো অনেক দিন। বাচ্চাও হয়েছে দুটি। বকুরও বিয়ে হয়েছে গেল বছর।'

'আর নন্টু?'

'নন্টু ম্যাট্রিক পাস করে ইছাপুর গান ফ্যাকটরিতে ঢুকেছে। পড়াশুনোয় তো কারোরই মন ছিলো না। সীতেশের সংবাদ জানো তো?'

চমকে উঠে মা বললেন, 'কী?'

'খবরের কাগজে দ্যাখোনি? সেই যে রেল কলিশন হলো, তাতে তো সীতেশ আর তার বউ

দুজনেই ছিলো।'

মা গলায় একটা আর্তনাদের মতো শব্দ বার করে মুখ ঢাকলেন দু'হাতে।

পুরন্দর ভেবে পেলো না, যার মা মরে গেলেও তেমন কষ্ট হয় না, তার একজন সীতেশ মারা গেলে এতো কষ্ট কেন?

পরে অবশ্য সবই জেনেছে, সবই শুনেছে, সীতেশদার কথা মা শোকের মুখে নিজেই বলেছেন সবিস্তারে, বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছেন। মাকে কাঁদতে দেখাও একটা দেখাই। সেই সঙ্গে বালক পুরন্দরও সিক্ত হয়ে উঠেছে তার আবাল্যদুঃখিনী মার কথা ভেবে।

আরো পরে যুবক হয়ে উঠতে-উঠতে মায়ের বঞ্চিত জীবনের সব তথ্যই জেনেছে সে, একদিন গিয়ে দেখেও এসেছে এলগিন রোডে নিজেদের বাড়ি। শুনেছে বৃদ্ধ ডাক্তার সব ছেড়ে কাশী চলে গিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে বেদ-বেদান্তে মনোনিবেশ করেছিলেন, সেখানেই তাঁর পরম গতি লাভ হয়েছে। আর ডাক্তারের ছেলে চিরপ্রবাসী। বাড়িটা একটা ভূতের বাড়ির মতো পড়ে আছে তালাবন্ধ অবস্থায়।

এ-সব অভিযান মা জানেন না। জানিয়ে কী বা হবে।

লুকিয়ে-লুকিয়ে সে তার বাবার ঠিকানা সংগ্রহেরও চেষ্টা করেছিলো, পায়নি। পেলে কী করতো তা অবশ্য জানে না। কিন্তু না-পেয়ে সে হতাশ হয়েছে, রাগ নয়, দ্বেষ নয়, প্রতিশোধস্পৃহা নয় শুধু অভিমান আরো গাঢ় হয়েছে। কী অদ্ভুত।

বাবা শব্দটার মধ্যেই যেন একটা জাদু ছিলো। বাবা তার গোপন জগতের নাম।

হাওড়া এসে প্রথম দিকে ভীষণ কষ্টে পড়েছিলো তারা। এখানে বাড়ির দাম বেশি, জিনিসের দাম বেশি, চলতে-ফিরতে পর্যন্ত খরচ লাগে। দার্জিলিংয়ে সবই ছিল হাঁটাহাঁটির মধ্যে, যানবাহনের ব্যাপারই নেই কোনো। তাছাড়া সেখানে কোনো অসম্মান ছিল না, কাঠগুদোমের স্বতন্ত্র আবাসে, আশেপাশে নেপালি বস্তির মানুষদের সঙ্গে ছোটো-বড়োর প্রভেদ ছিল না, সর্বোপরি ভালোবাসা ছিল। তারা সরল প্রকৃতির কাছাকাছি মানুষ, রেগে গেলে কেটে ফেলে বটে, তলায়-তলায় বিষ ঢালে না। গান করে, প্রেম করে, বাগান ঝুলিয়ে দেয় জানালায়, বাঁশি বাজায় পাহাড় থেকে পাহাড়ে। খোলামেলা উদাত্ত জীবন।

কিন্তু হাওড়া এসেই বোঝা গেল এখানে সে-ভাবে থাকা অসম্ভব। এখানকার ঐ জাতীয় লোকেরা সম্পূর্ণ অন্য রকম। এখানকার বস্তির জীবন বড়ো দুঃসহ, বড়ো নোংরা, তারই মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলিতে বিধ্বস্ত। দার্জিলিংয়ে বসে বোঝাই যায়নি বাংলা ভাগ হয়ে কী কাণ্ড ঘটেছে, হাওড়া এসে প্রথম অনুভূতি হলো, গান্ধীজী আর এখন নেই।

দার্জিলিংয়ে কাঠগুদোমের ঘরটা মনবাহাদুরই গুদোমের বড়োকর্তাকে বলে ঠিক করে দিয়েছিল, আশেপাশের নেপালি বাসিন্দারা তাদের সহায় ছিল, মিস্তিরিরা বলেছিল 'তুমি থাকো মাইজি, আমরা পাহারা দেব।' যে কথা সেই কাজ। কারখানার মধ্যেই থাকতো তারা, পাহারাও সত্যিই দিত।

হাওড়াতে পাহারাব উল্টো কিছু ঘটেছিল কি না বালক পুরন্দরের জানা নেই, এখন মনে হয় মা যে সারারাত বসে থাকতেন, টুক করে শব্দ হলেই থরথরিয়ে কেঁপে উঠতেন, তার একটা নিগূঢ় অর্থ ছিল। এক মাসের মধ্যেই শেষে বস্তির ঘর ছেড়ে একটু ভদ্রপাড়ায়, ভদ্র সংস্রবে বেশি ভাড়ায় মরিয়া হয়ে একটা ঘর নিয়ে ফেললেন। আবার খুঁজে পেতে টিউশনি জোগাড় করলেন, স্কুলের বাচ্চাদের জন্য টিফিনের বন্দোবস্ত নিলেন কর্তৃপক্ষকে বলে কয়ে। আবার সেই চিরাচরিত বিরতিহীন পরিশ্রম। এই ইস্কুলে যাচ্ছেন, এই টিউশনিতে যাচ্ছেন। এদিকে রান্না করছেন ছেলের জন্য, তাকে পৌঁছে দিয়ে আসছেন স্কুলে, কোন ফাঁকে মোটা-মোটা বারকোষ ভর্তি নারকোল জ্বাল দিয়ে রেখেছেন নাড়ুর জন্য, গজা তৈরি করেছেন, নিমকি তৈরি করেছেন, রুটি লুচি ঘুগনি, আরো কত কী। আবার সেইসব হাতে করে নিয়ে গিয়ে জমা দিচ্ছেন ইস্কুল ক্যানটিনে। সব শেষে রাত্তিরের ঘুম কেড়ে নিজের পরীক্ষার পড়ার জন্য তৈরি হওয়া। কী জীবন! মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। মনের জোরে যে মানুষ সব কিছু পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ তার মা। পরিকল্পনা-মতো সত্যি একদিন বি এ পাস করলেন তিনি, বি টিও পাস করলেন। আর পুরন্দর উঁচু ক্লাসের ছাত্র হতে-হতে অবস্থাটা সত্যি আয়ত্তে এনে ফেললেন।

সেই সময়েই খবর এলো মনবাহাদুর মারা গেছে। চিঠিপত্রের আদান-প্রদান রেখেছিলেন মা তক্ষুনি তার স্ত্রীকে টাকা পাঠিয়ে দিলেন কিছু, লিখলেন, যখন যা দরকার সব যেন মাকে সে নিঃসংকোচে জানায়। সে কিছুই জানালো না, টাকা পেয়ে সেই টাকায় একখানা টিকিট কেটে চলে এলো কলকাতায়। ঠিকানা দেখিয়ে-দেখিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে ঠিক এসে পৌঁছল বাড়িতে। কেঁদে লুটিয়ে পড়ে বলল, 'তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নেই মা, তুমিই আমার লেড়কি। আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না।'

মা সেই নিঃসন্তান মানুষটিকে আদর করে হাতে ধরে ঘরে তুললেন, সসম্মানে থাকতে দিলেন বললেন, 'তোমরা ছাড়াই বা কে ছিল আমার সেই দুর্দিনে? এখনো তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।'

নানিমা আসায় খুব সুবিধেও হয়ে গেল। মা অনেক নিশ্চিন্ত হলেন ছেলেকে নিয়ে, বিশ্রামও পেলেন একটু। সেই বিশ্রামকে তিনি ধীরে-ধীরে অন্য উপায়ে কাজে লাগালেন। ভেবে-চিন্তে এক ঘরের বাড়ি ছেড়ে হঠাৎ দুঘরের ফ্ল্যাটে উঠে এলেন অবস্থার অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে, তার মধ্যে একটি ঘরে কোচিং ক্লাস খুললেন। সন্ধে থেকে রাত দশটা অবধি পড়াতেন। প্রথম দিকে জন তিনেক নিয়ে খুলেছিলেন, তারপরে আস্তে-আস্তে ভরে উঠল। উপার্জন দ্বিগুণ হলো, পুরন্দর স্কুল ফাইনাল পাস করল।

একবার ইস্কুলের দরজা পেরুতে পারলে অন্য দরজা পার হতে আর কতক্ষণ লাগে? তাছাড়া মনের মধ্যে সততই মায়ের জন্য একটা বেদনাবোধ থাকার দরুন কোথাও কোনো শৈথিল্য ছিল না। আশৈশব সে মনে-মনে মাকে সুখ দিত, স্বাচ্ছন্দ্য দিত, বিশ্রাম দিত। হয়তো সেই মনই তাকে ক্লাসের পর ক্লাস অমন মসৃণভাবে পার হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, ইস্কুল পেরিয়ে নিয়ে গেছে কলেজের দরজায়, সেই দরজাও পার হয়ে এসেছে সসম্মানে। চাকরি পেয়েছে কলেজে, দিন আর তখন খুঁড়িয়ে চলেনি, দু ঘরের ফ্ল্যাট ছেড়ে তিন ঘরের ফ্ল্যাটে এসেও খুঁতখুঁত করেছে যথেষ্ট আলো

হাওয়া নেই বলে।

এমনকি ইদানীং মা একটি পুত্রবধূর আগমনও কামনা করছিলেন। বলতে গেলে প্রায় অপ্রত্যাশিত ভাবেই জুটে গেল বৃত্তিটা।

'মা।' তাকিয়ে থেকে ডাকলো সে।

'কী রে?' যেতে-যেতে ফিরে তাকালেন অঞ্জলি দেবী।

'আমি চলে গেলে তোমার কি খুব কষ্ট হবে?'

'কষ্ট কিসের? পড়াশুনো করতে যাচ্ছিস, কৃতকার্য হয়ে ফিরে আসবি, আমার কত আনন্দ, কত গর্ব।'

'কিন্তু আমি আবার বলছি, তোমার বম্বে পর্যন্ত গিয়ে কোনো দরকার নেই।'

'যাই না, তুলে দিয়ে আসি তোকে!'

'থার্ড ক্লাসে যাবো, কী ভীষণ ভিড়, তোমার খুব কষ্ট হবে।'

'কষ্ট কী! কিছু কষ্ট না।' দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন তিনি। তারপরেই হাসলেন। বিদ্যুতের মতো চমকে উঠলো কোনো এক শিশিরভেজা ভোর রাত্তিরের ছবি। একটু-একটু শীত করছিল, একটা পাতলা চাদর ছিল গায়ে, হাতে বড়ো একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। সুদর্শন বিলেত থেকে এনে দিয়েছিল। অনেকগুলো খোপ ছিল তাতে, চেন দিয়ে আটকানো। ব্যাগের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় টুকিটাকির সঙ্গে এই পোস্টকার্ড সাইজের ছবিখানা-সহ কিছু টাকা ছিলো অবশ্য। কী ছিলো আর ছিলো না তা তখন জানতেন না, নেহাত অভ্যাসবশতই হাতে নিয়ে সব পিছনে ফেলে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। কী কববেন, কোথায় যাবেন, তাও কিছুই জানা ছিলো না। ছায়ার মতো কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে ধাঁ-ধাঁ করে হাঁটছিলেন যে-কোনো একদিকে। জনবিরল পথ, কিন্তু একফোঁটা ভয় ছিল না মনে, শুধু একটা ভীষণ তুফান বয়ে যাচ্ছিলো বুকের মধ্যে, এবং সেই অনুভূতি ছাড়া অন্য সব অনুভূতিই ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল।

খানিকটা হেঁটে একটা টাঙ্গা পেয়ে উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি, বললেন স্টেশনে চলো। আর স্টেশনে এসে নেমেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ভাবলেন আমি কোথায় যাচ্ছি? তারপরেই মনে হলো 'একমাত্র জায়গা আমার পরপারে।' ঠিক! উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। মাথার মধ্যে পরপার শব্দটা ক্রমাগত কানামাছির মতো ভনভন করতে লাগলো, ট্রেনের তলায় গলা দেবার অপেক্ষায় তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব অস্থিব আক্ষেপে ছটফট করতে লাগলো। কিন্তু কোথায় ট্রেন? ফাঁকা স্টেশন, লাইনগুলো পড়ে আছে অজগরের মতো, এ-মাথা ও-মাথা হাঁটতে লাগলেন জোরে-জোরে। হঠাৎ মনে হলো যদি কোনো পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজেকে লুকোতে। হয়তো লুকোবার প্রয়োজনেই একখানা খবরের কাগজ কিনে, বেঞ্চিতে বসে, মেলে ধবলেন মুখের উপর। পৃষ্ঠা উল্টোতেই একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো দার্জিলিংয়ে একটি বাচ্চাদের স্কুলের জন্য শিক্ষিকার প্রয়োজন। শিক্ষাগত যোগ্যতার সীমা আই-এ পাস হলেই চলবে।

কিন্তু বয়েস যেন পঁচিশের উর্ধ্বে না হয়। বুকটা ছলাৎ করে উঠলো। এ তার কিসের ইঙ্গিত? নিজের প্রাণ নেওয়াও যেখানে মহাপাপ বলে বর্ণিত সেখানে সে অভ্যন্তরস্থ আর একটা প্রাণকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে বলেই কি এই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে গেল? তাই কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ঈশ্বর?

এই পুরন্দরই তখন তাঁর জঠরে সাতমাস ধরে লালিত হচ্ছিল। স্নেহে ভালোবাসায় হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠলো। একটা প্রাণের জন্ম কম কথা নয়। একে ভগবানের দান ছাড়া আর কী বলা যায়? বন্ধ্যা রমণীর গর্ভে কোন বীজ অঙ্কুর গজাতে পারে? সুদর্শন একদিন বলেছিল, মেয়েরা মাটি, খুব সত্য কথা। মেয়েরা মানেই তো মা, সর্বংসহা বসুন্ধরা। বীজকে যত্নের দ্বারা মহীরুহে পরিণত করাই তো তাঁদের ধর্ম। তবে তিনিই বা সেই ধর্ম থেকে চ্যুত হবেন কেন? কিসের বিনিময়ে? অবিচার সুবিচার যে যাই করে থাকুক না কেন, তাঁর নিজের কর্তব্য হচ্ছে আসন্ন সন্তানটিকে রক্ষা করা।

মনের মধ্যে আবার তিনি জোর খুঁজে পেলেন। উঠে দাঁড়ালেন সোজা হয়ে, টিকিট-ঘরের দিকে যেতে-যেতে ভাবলেন পরপার নয়, এপারেই আমার অসমাপ্ত কাজ সাঙ্গ করতে আরো কিছুদিন বাকি আছে।

কিন্তু না, যে চাকরির আশায় তিনি ট্রেনের তলায় গলা না দিয়ে উঠে বসেছিলেন মহিলা কামরার তৃতীয় শ্রেণীর বেঞ্চিতে, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার শারীরিক এবং মানসিক ধকল সহ্য করে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছেছিলেন, সেই স্টেশনেই অনাহারে অনিদ্রায় আরো একটা বেলা কাটিয়ে সন্ধেবেলা শেয়ালদায় এসে দার্জিলিং মেল ধরেছিলেন, সেই চাকরি তাঁর হয়নি। তিনি গিয়ে পৌঁছবার আগেই কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্থানীয় লোক নিয়োগ করে ফেলেছিলেন।

বিহ্বলভাবে বেরিয়ে এসে তিনি কাকঝোরার নিচু রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন, এর পর তাঁর ভবিষ্যৎ কী? তাঁর দেহ ভেঙে আসছিল, পা আর চলছিল না, মনে হচ্ছিল তিনি এখনি পড়ে যাবেন। এই বুড়ো মনবাহাদুর এসে থমকে দাঁড়ালো। ঐ স্কুল থেকেই সে বেরিয়ে এসেছিলো পিছনে পিছনে। দরদভরা গলায় বলল, 'মাইজি, তুমহার কি তবিয়ৎ ঠিক নেই?'

ঢোঁক গিলে উদগত চোখের জল ফিরিয়ে দিয়ে অঞ্জলি দেবী বললেন, 'না, বাবা, আমি আর পারছি না।'

'তুম কি বাঙালি ছ?'

অঞ্জলি বললো, 'হ্যাঁ।'

'হামারভি ওই মালুম থা। হামি তো দশ বরষ বাঙলা মুলুকে ঘুরিয়েছি। হামি বাংলা ভি ভালো জানে।'

'এখানে কোনো শস্তা হোটেল আছে?'

'সোব আছে, সোব হামি ঠিক করিয়ে দিব। কিন্তু তুমি কি এখানে নক্‌রির জন্য এসেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'নক্‌রি তোমার হলো না?'

'না বাবা, খালি নেই।' তিনি ধুঁকছিলেন।

'নক্‌রি তোমার চাই?'

'আছে?' আগ্রহে অধীর হয়ে তাকালেন তিনি।

মনবাহাদুর বলল, 'আছে।'

'কোথায়?'

'এই তো আর একটু নামিয়ে কার্ট বোডে একঠো নার্সারি করেছে এক সাহেববাবু, নতুন ভি হয়েছে স্কুলটা, ঐখানে লোক মাঙছে, হামি জানি।'

'আমি সেখানেই যাবো, আমাকে তুমি নিয়ে যাও—'

'তুমি কি একা এসেছ মাইজি?'

'আমার কেউ নেই।'

'কিন্তু তোমার পেটে তো বাচ্চা আছে, তুমি হামার ঘরে চলো, খাবে, থোড়া বিশ্রাম ভি হোবে, হামার বউ তোমাকে লিয়ে যাবে সেখানে।'

অঞ্জলির শ্রান্ত-ক্লান্ত সর্বহারা চেহারা দেখে মায়ায় পড়ে গিয়েছিলো বুড়ো মনবাহাদুর, পরে সে বলেছে যৌবনে কলকাতায় এক বাঙালি সাহেবের লেড়কিকে সে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলো, তেরো বছর বয়সে সে মেয়ে মারা গেল। মনের দুঃখে চাকরি ছেড়ে দিয়ে একেবারে দেশে চলে এলো। সেই মেয়েকেই কেন জানি হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিলো অঞ্জলিকে দেখে।

আসলে ওই রকম সব জুটেই যায় বিপদের সময়। নইলে ভগবানের নাম আর বিপদতারণ হবে কেন?

প্রথম জীবনে যেমন সীতেশদা এসে দাঁড়িয়েছিলো সব নিরাপত্তা নিয়ে, ওই অসহায় অবস্থায় তেমনি মনবাহাদুর এসে দাঁড়ালো ঈশ্বরপ্রেরিত হয়ে। মানুষ দুঃখ পায় তার কর্মদোষে, তারই মধ্যে যতোটুকু সান্ত্বনা তার ভাগ্যে জোটে, তার নামই ঈশ্বর।

মনবাহাদুরের সাহায্যেই শেষে চাকরিটা হলো, গুদোম ঘরে বাসস্থান জুটলো, তারপর নির্দিষ্ট সময়ে নেপালি ডাক্তারের সাহায্যে মনবাহাদুরের স্ত্রীর হাতেই জন্মালো এই শিশু, এই পুরন্দর। কী আশ্চর্য! আজ সেই পুরন্দর তার মায়ের কষ্টের কথা ভেবে আকুল হচ্ছে।

একটা সুখ-দুঃখ মেশানো ঘন নিশ্বাস আবার উদগত হলো বুক থেকে। বললেন, 'কষ্ট বলতে গেলে তোরই হবে থার্ড ক্লাসে। ভিড়ের মধ্যে বসে-বসে ঘুম হবে না, আবার বম্বেতে নেমেই কতো কাজ। তারপর জাহাজের কষ্ট তো আছেই। কতো লোকের কতো শরীর খারাপ হয়, বমি হয়— আমি বলি কি তুই সেকেন্ড ক্লাসে যা—'

'আর তুমি থার্ড ক্লাসে, না?'

'আমার ঘুম কম বসে থাকতে আমি খুব ভালোবাসি। লোকজন দেখবো, সময় কেটে যাবে।'

'তুমি আর কী কী ভালোবাসো মা?' হাসতে-হাসতে পুরন্দর মার হাত ধরলো, কম খাওয়া, কম ঘুম, আর কী? ও, ভালো কথা, তোমার জন্য দুটো শাড়ি এনেছি আমি।'

পোর্টফোলিওটা টেনে এনে একটা প্যাকেট বার করলো, 'দ্যাখো, পছন্দ হয় নাকি?'

'শাড়ি! আবার শাড়ি আনলি কেন?' অঞ্জলিদেবী বিব্রত বোধ করলেন। তারপর প্যাকেট খুলে

একেবারে হতবাক। একখানা টকটকে লাল পাড়ের নিচে জরি-দেয়া টাঙ্গাইলশাড়ি, আর একখানা গাঢ় সবুজপাড়ের সিল্‌ক।

পুরন্দর মায়ের বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে মজাপেলো, খুশি গলায় বললো, 'রঙিন আনিনি সেজন্যেই আমাকে ধন্যবাদ দাও, বুঝলে? যদি বম্বেতে যেতে হয় এই শাড়ি পরে যেতে হবে। ব্যস্। আর যদি কথা না শোনো, দুই ধমক দিয়ে রেখে যাবো।'

উঠে সে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়ালো, দুই কাঁধে হাত রেখে বললো, 'মানুষটাকে যদি অস্বীকারই করতে পারতে তা হলে আর এই আত্মনির্যাতনের দরকার হতো না, বুঝলে? আর এই ছবিটাও—', ছবিটা সে পকেটে ভরলো, 'এমন করে লুকিয়ে রাখতে না।'

ছেলের কথা শুনে অঞ্জলি দেবী আরক্ত মুখে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ ১ ॥

বৃষ্টি। বৃষ্টি। ক'দিন কী কাণ্ড গেল এই শহরে। মনে হচ্ছিলো, এব বুঝি আর নিবৃত্তি হবে না। এমনিতে এখানে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু নামে যদি তা হলে আর রক্ষে নেই। আট দিনও থাকতে পারে, আঠারো দিনও চলতে পারে। তবু মন্দের ভালো, সাত দিন বাদে আজ রোদ উঠেছে, কিন্তু কী কড়া রোদ, যেন ঝলসে যায় চোখ। সেই বিশ্রী একটা ভাপা-ভাপা গরম।

ডক্টর রায় কাজের ফাইল দেরাজে ঢুকিয়ে পাশের টেবিলে ঢেকে রাখা গ্লাস থেকে জল খেলেন দুই চুমুক, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। ঘড়ি দেখলেন, ভুরু কুঁচকে, অস্ফুটে বললেন, 'চারটে বাজতে চার? তা হলে?'

তা হলে সময় আছে খানিকটা। অন্তত তিরিশ মিনিট তিনি তাঁর নিজের জন্য খরচ করতে পারেন। একবার গেস্টহাউসে যাওয়া দরকার, যৎসামান্য ভোজ্যবস্তুর প্রয়োজন এখন। এক মগ কফি নইলে তো চলছেই না। মাথাটা যেন জাম হয়ে আছে। এই বর্ষার কৃপায় বেশ ভারি হয়েছে শরীর, সর্দিভাব, জ্বরভাব, গায়ে ব্যথা-- সারিডন সব সময়েই পকেটে আছে। কফির সঙ্গে সেটাও গিলবেন দু'একটা, স্যান্ডুইচ বা কেক হ্যাম্বার্গার বা যা-হয় কিছু খেতেও হবে।

ভেবেছিলেন উপোস দিয়ে শরীর সারাবেন, তাই লাঞ্চ খাননি, এখন দেখছেন, শরীরও যেমন তেমনি আছে, মাঝখান থেকে না-খেয়ে আরো বিশ্রী লাগছে।

দাঁড়িয়ে কোমরের প্যান্টটা একটু টাইট করলেন, শাদা ধবধবে বকের পালকের মতো দামী বিলিতি শার্টের স্টিফ কলারের ফাঁকে টাইয়ের নটটা ডাইনে-বাঁয়ে হেলালেন, পকেট থেকে চিরুনি বার করে ফসফস করে মাথা আঁচড়ে দু'পা এগিয়ে এসেছিলেন বাইরে যাবার দরজার কাছে, ঝনঝন করে ফোন ভেজে উঠলো।

'প্চা!' বিরক্তিসূচক এই শব্দটি মুখ থেকে বেরিয়ে এলো তৎক্ষণাৎ।

এয়ার-কন্ডিশন করা কাচ-ঢাকা নিঃশব্দ ঘরে ফোনের আওয়াজটা বড়ো বেশি কড়া শোনাচ্ছিল। ডক্টর রায় এক সেকেন্ড ভাবলেন ফোনটা ধরবেন কি ধরবেন না। কেননা, এখন বেরুবার মুখে ফোন ধরা মানেই আরো কয়েক মিনিট অপচয়, যার মূল্য এই মুহূর্তে তাঁর কাছে যথেষ্ট ম্যাটার করছে; তাছাড়া ভালোও লাগছে না কারো সঙ্গে কথা বলতে।

তিনি তাঁর কোটের জন্য ক্লসেটে হাত দিলেন, ফোনটা বেজেই চললো।

বাজুক, বললেন মনে-মনে, আমি বাধ্য নই ধরতে। আমার এখানে থাকবার মেয়াদ ছাব্বিশ মিনিট আগে শেষ হয়েছে। আমার বেরুবার কথা ছিলো সাড়ে-তিনটেতে, কেরানি কানেকশান দিল কেন? দেখছি কঠিন না-হলে এখানে কেউ কারো কথা শোনে না।

এমনিতে ডক্টর রায় মানুষটি সহিষ্ণু, শান্ত, মিষ্টভাষী, অমায়িক এবং অধৈর্যহীন। কিন্তু আজ তাঁর শরীর ভালো নেই, তাই মেজাজও ভালো নেই। এক কাপ চা বা কফির জন্যে সমস্ত অন্তরাত্মা এখন তৃষিত।

তিনি কোট গায়ে দিলেন। তাঁর লম্বা বলিষ্ঠ চেহারায় কোটটা খাপে-খাপে ফিট করলো। হঠাৎ দেখলে বিদেশী বলে ভ্রম হতে পারে। প্রায় চব্বিশ বছর একাদিক্রমে বিদেশে থেকে হাবভাব চাল-চলনও অনেকটা তাদেরই মতো হয়ে গেছে। গায়ের রং টকটকে, মুখের দিকে তাকালে আর্যবংশোদ্ভূত বলে মনে হয়। আসলে ভদ্রলোক সুপুরষ। বয়েস ঠিক কতো অনুমান করা শক্ত, কেননা চুল এখনো ব্রাউন, চামড়া এখনো টান, চশমাহীন চোখ। তারা কুচকুচে কালো এবং চঞ্চল চুল নয়, চামড়া নয়, বোধহয় চোখের সেই চাঞ্চল্যই যৌবনকে স্থির করে রেখেছে। বম্বের এই বিখ্যাত নিকসন অ্যান্ড নিকসন কোম্পানির তিনি ডিরেক্টার। এই বিলাসবহুল আপিসটি একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠান। লন্ডন থেকে সোজা তাঁকে এখানে পাঠানো হয়েছে, অথবা দেশে ফেরার বাসনায় তিনি স্বেচ্ছায়ই চেষ্টাকৃতভাবে প্রত্যাগত হয়েছেন। এসেছেন মাত্রই ছ'মাস আগে। শীতের দেশের পালিশ এখনো সারা শরীরে বিদ্যমান। স্বভাবেও তিনি তাদেরই মতো নিষ্ঠাবান। কাজে অনীহা নেই, সময়জ্ঞান প্রবল, কর্তব্যে অবিচল। কিন্তু এখানে এসে পদে-পদে হোঁচট খাচ্ছেন। এখানকার মানুষেরা সময়ের মূল্য দেয় না, কাজেব মূল্যও বোঝে কম। কর্তব্যজ্ঞান বোধহয় একেবারেই শূন্যের অঙ্কে।

সাড়ে-চারটেয় একটা জরুরি মিটিং আছে অন্য বিল্ডিংয়ে। যদি গেস্টহাউসে গিয়ে চা বা কফি খেতে হয়, তা হলে এখুনি বেরুনো দরকার, নইলে মিটিংয়ে তিনি কাঁটায়-কাঁটায় উপস্থিত হতে পারবেন না।

কোট গায়ে দিয়ে ফোনের ডাক অগ্রাহ্য করে বাইরের দরজার কাছে এসেছিলেন, ভাবতে চেষ্টা করছিলেন, সাড়ে-তিনটেতেই তিনি বেরিয়ে গেছেন ঘর থেকে, এই ফোনের ডাক তাঁর কর্ণগোচর হয়নি, সুতরাং সাড়া দেবারও কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু স্বভাবদোষে ফিরলেন। এ-ভাবে শুনতে পেয়েও ফোনটাকে বাজতে দিয়ে চলে যাওয়া তাঁর সমীচীন মনে হলো না। কোনো কিছুই উপেক্ষা করার অভ্যেস নেই তাঁর। সব সময়ে সকলেব কাছেই তিনি অধিগম্য, সকলের কথাই মন দিয়ে শোনা তাঁর স্বভাব, ফোনও তিনি বাজলেই ধরেন, নিজের হাতে ধরেন। এটাও তাঁর বিবেচনায় উচিত কাজ।

সুতরাং ফিরে টেবিলের কাছে এসে রিসিভারটা কানে তুলে বললেন, 'হ্যালো।'

'আমি—মানে আমি--' একটি ইতস্তত তরুণ গলা থতোমতো খেলো।

'বলুন।'

'আমি পুরন্দর।' ঝপ করে ডুব দিল গলা।

'পুরন্দর?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পুরন্দর রায়চৌধুরী।'

'পুরন্দর রায়চৌধুরী?'

'এটা নিকসন অ্যান্ড নিকসন কোম্পানি তো?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে ডক্টর সুদর্শন রায়চৌধুরী বলে কাউকে কি পাওয়া যেতে পারে?'

'আমিই বলছি।'

'ও, আপনি? আপনিই–' গলাটা কাঁপলো।

'হ্যাঁ, আমার নামই সুদর্শন রায়।

'তা হলে আমি ঠিক মানুষটিকেই ধরতে পেরেছি?'

'আশা করি।'

'জানেন, আজ সকাল থেকে এই বিকেল চারটে পর্যন্ত আপনার জন্য, শুধু আপনার ঠিকানার জন্য আমি কী গলদঘর্ম হয়েছি।'

'কী প্রয়োজন বলুন?'

'আর তারপর এই ফোন-নম্বর। কতো কষ্ট করে যে ফোনটা করলাম–'

'কিন্তু কেন এতো কষ্ট করলেন সেটা না জানলে–'

'কেন কষ্ট করলাম?' একফোঁটা হাসি ভেসে এলো, 'এক ধরনের মানসিক বিকৃতিও বলতে পারেন।'

'কী?'

'মানুষের অনেক পাগলামি থাকে। তাদের মন যে কতো অপ্রয়োজনেও কতো কিছুর জন্য ব্যাকুল হয় এই মুহূর্তে আমি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।'

'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনার পক্ষে অবশ্য না-পারাই সুবিধের।'

'তা হলে আর সময় নষ্ট করা কেন?' গলা গরম হলো ডক্টর রায়ের।

'একটু ধৈর্য করুন।' উল্টো পিঠের গলা বেশ বক্র।

ডক্টর রায় বললেন, 'দেখুন, আমি খুব ব্যস্ত, বৃথা আলাপের সময় নেই এখন।'

'অত সময় সময় করছেন কেন? সময় কি শুধু আপনারই কম, আর আমার হাতে অঢেল!

'তা হলে আসল বক্তব্যটা আপনার কি সেটা তো বলে ফেললেই পারেন।

উত্তরে একটি গাঢ় স্বর ভেসে এলো, 'আমি আপনাকে একবার দেখতে চাই।'

'আমাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কেন তা আমি জানি না।'

'কী? বলছেন কী আপনি?'

'আপনাকে অন্তত একবার জীবনে চোখে দেখবো, এ আমার আবাল্যের আকাঙ্ক্ষা।'

'কিন্তু আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।'

'আমিই কি আপনাকে চিনি?'

'তবে?'

'তবে যে কী তাও আমার জানা নেই।'

'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্যের কী আছে? একজনের কি আর একজনকে দেখতে ইচ্ছে করতে পারে না?'

'পারে যদি চেনা-জানা থাকে, অথবা বিখ্যাত ব্যক্তি হয়। এ ক্ষেত্রে তো দেখছি কোনোটাই নয়।'

'আপনি আমার কাছে চেনা-জানা বা খ্যাতি-অখ্যাতির অনেক উর্ধ্বে।'

'আমি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি। আপনার মতো একজন বিচার-বিবেকহীন নিষ্ঠুরতম ব্যক্তি।'

'কী বললেন?'

'বললাম আপনার মতো একর্জন—' ওপিঠ থেকে কাটা-কাটা স্পষ্ট অক্ষরে উচ্চারিত হলো, 'বিচার-বিবেকহীন নিষ্ঠুরতম ব্যক্তিকে দেখে চোখ সার্থক করবার আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল থেকে আমাকে তাড়না করেছে।'

ডক্টর রায় গম্ভীর হলেন, গলা মৃদু এবং দৃঢ় হলো, বললেন, 'বিবেকের সঙ্গে কোনোদিনই আমার কোনো বিরোধের কারণ ঘটেনি, হৃদয়হীন বলেও দুর্নাম নেই।'

ওপিঠ হাসলো, 'আর পাঁচজনের কাছে না থাকতে পারে, আমার এবং আমার মার কাছে নিশ্চযই আপনি একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন অপদার্থ মানুষ ছাড়া আর কিছু নন।'

'কেন? কখনো কি কোনো উপকার করেছিলাম?' ফোনটা রাখতে গিয়েও একটু কড়া সুরে জবাব দিলেন।

'উপকার নয়,' ওপিঠের গলা বিদ্রূপে ভরা, 'উপকারের চেহারায় সর্বনাশ করেছিলেন।'

'সর্বনাশ?'

'মনের অগোচরে পাপ নেই, চিন্তা করে দেখুন তো, এতো উঁচুতে উঠেও, এতো মানুষের উপর প্রভুত্ব করেও কাদের কাছে আপনি ছোটো হয়ে আছেন?'

'না, আমি কারো কাছেই ছোটো হয়ে নেই।'

'অন্তত আমার কাছে নিশ্চয়ই।'

'আপনি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন?'

'না গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি করা আমার অভ্যাস নয়।'

'গুরুজন? আমি আপনার গুরুজন হতে যাবো কেন?'

'উত্তেজিত হবেন না। আপনার মতো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে তা শোভন নয়, শুনেছি পিতা হিসেবে নিকৃষ্ট হলেও মানুষ হিসেবে অন্তত লোকচক্ষে উৎকৃষ্টের পর্যায়ে আছেন।'

'পিতা!'

'নন?'

'ননসেন্স।' এবার ডক্টর রায়ের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো, বুঝতে পারলেন, একটি অতিমাত্রায় ফক্কড়ের পাল্লায় পড়ে এতোখানি সময় তাঁর মিথ্যেমিথ্যে নষ্ট হলো। আসলে লোকের সঙ্গে কর্কশ ব্যবহারে অনভ্যস্ত বলেই মাঝে-মাঝে ভারি বিপদে পড়ে যান। টেলিফোনটা তাঁব অনেক আগেই কেটে দেওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু এখানকার লোকেদের কি খেয়ে-দেয়ে কোনো কাজ নেই? রাগতভাবে ঠাস করে ফোনটা রেখে দিতে যাচ্ছিলেন, কানটা আটকে গেল। চকিত হয়ে বললেন, 'কী! কী বললেন?'

'বললাম, অঞ্জলি নামে কখনো কাউকে আপনি চিনতেন কি ?

'অঞ্জলি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা— তার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

'এই আপনার সঙ্গে যা।'

'মানে?'

'মানে আমি আপনারও পুত্র, তাঁরও পুত্র।'

'তুমি অঞ্জলির ছেলে?' হঠাৎ পিঠ বেয়ে একটা শিরশিরানি অনুভব করলেন ডক্টর রায়।

'এবং আপনারও ছেলে।'

'আমার ছেলে!'

'আশা করি আপনার কৃতকর্ম বিষয়ে আপনাকে এবার কিঞ্চিৎ অবহিত করতে পেরেছি।'

'আমার ছেলে!' ডক্টর রায় পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। ঐ এয়ার-কন্ডিশন করা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েও তাঁর কপাল বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে যাচ্ছিলো।

'নিজের বাবাকে দেখতে কোন ছেলের না কৌতূহল হয়, বলুন?'

ডক্টর রায় চুপ।

'শুনলাম আপনি বম্বেতে আছেন, প্রলোভন সামলাতে পারলাম না।'

'ও।'

'গলার আওয়াজ শুনে তৃপ্তি হচ্ছে না, একবার চোখেও দেখতে ইচ্ছে করছে। আপত্তি আছে আপনার?'

'আপত্তি! না—' থেমে, ভেবে, 'আপত্তি কেন।'

'অনুমতি করলে আপনি যেখানে বলবেন সেখানে গিয়েই—'

'তুমি—মানে তোমার নাম পুরন্দর?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পুরন্দর রায়চৌধুরী?'

'কী আর করা, সমাজের আইন অনুসারে পিতৃপদবী নিতেই হয। নইলে মাব পদবীই গ্রহণ করা উচিত ছিল আমার। আপনি আপন অভিলাষে জন্মদাতা হওয়া ছাড়া তো আব কোন কর্তব্যই করেননি।'

ডক্টর রায়ের ফর্সা মুখে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা গেল। তাঁর কান দুটো পুড়ে যাচ্ছিলো।

ওপার থেকে আবার বিদ্রূপবাণ ভেসে এলো, 'তবে ভয় পাবেন না, পুত্র হলেও কোনো পার্থিব দাবি নিয়ে উপস্থিত হবার সংকল্প আমার নেই। শুধুমাত্র একবার চোখের দেখা, এইটুকু।'

ডক্টর রায় ঢোঁক গিললেন।

'নিতান্ত ভাগ্যদোষেই আপনার মতো পিতার সন্তান হয়ে জন্মায় মানুষ। তবু কী কাণ্ড দেখুন আপনার উপর আমার যথোচিত রাগ নেই।'

ডক্টর রায় তেমনি নিঃশব্দ।

'কিছু বলছেন না কেন?'

'না—মানে—' জল খেলেন গ্লাস থেকে।

'তা হলে আপনি দেখা করতে নারাজ?'

'কী আশ্চর্য! নারাজ কেন? সে তো বেশ কথা, মানে যদি আসতে চাও—'

'যদি না, আমি আসতেই চাই, একবার আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখতে চাই আপনাকে।'

'ও।'

'বলুন, কোথায়।'

'তা হলে, তা হলে—' ডক্টর রায় তাঁর সমস্ত শক্তি সংহত করে বলে উঠলেন, 'আমার বাড়িতে আসবে?'

'বাড়িতে?'

'ঠিকানা তুমি গাইডেই পাবে। হিলটন হাউস ও-পাড়ায় সবাই চেনে, সাত নম্বর বাংলো।'

'বেশ। কখন?'

'কখন? তা রাত্তিরেই এসো না, আটটা নাগাদ, গলা পরিষ্কার করলেন, 'বলছিলাম, রাত্তিরে আমার ওখানেই খেয়ে যাবে।'

'খাওয়াটা গৌণ, কিন্তু যাবো।'

কেটে দিল ফোনটা। ডক্টর রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো তবু অনেকক্ষণ যন্ত্রটা কানের মধ্যে চেপে রেখে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অনুভব করলেন হাতটা কাঁপছে। কোটের তলায় পিঠের শার্টটা ভিজে শপশপ করছিলো।

॥ ২ ॥

ঘর থেকে বেরুলেই, লাল কার্পেট মোড়া মস্ত লম্বা করিডর। করিডরটাও ঠাণ্ডা। কিন্তু বাইরে এসেই ধাঁধিয়ে গেল চোখ। সাত দিন টানা বৃষ্টির পরে মেঘ-ছেঁড়া রোদের তাপ সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। ডক্টর রায় গাড়ির জন্য এদিক-ওদিক তাকালেন।

এটা সেপ্টেম্বর মাস না? হঠাৎই মনে হলো কথাটা। তারপরেই মনে হলো, বাংলা মাসটা যেন কী? খুব আশ্চর্য, বাংলা মাসগুলো কিছুতেই মনে থাকে না। কাজ কারবার তো সবই ইংরাজি মাসের সঙ্গে, তাই ভুলে যেতে হয়। কিন্তু কেন ভুলবো? ভাবি রাগ হলো কথাটা ভেবে। যা আমাদের তা আমরা হাজার চাপেও মনে রাখবো না কেন? বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন—সুন্দর সব নাম। হ্যাঁ, সুন্দর। খুব সুন্দর!

যেন ঝগড়া করতে লাগলেন কোনো অদৃশ্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে। আর ঋতুর নামগুলো? তাই কি কম সুন্দর? এতো সুন্দর যে মা-বাবারা নাম রাখে ছেলেদের। শরৎ হেমন্ত বসন্ত। আর মেয়ে হলে বর্ষা। বর্ষা! কী সুন্দর নাম! তা হলে? তা হলে এটা যদি ইংরিজি সেপ্টেম্বর হয়, বাংলা মাসের কোন নামটা এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়? আর কোন ঋতু? ঋতুটা সহজ। সেপ্টেম্বর মানেই অক্টোবর, অক্টোবর মানেই শরৎকাল। ঠিক। শরৎকাল হতে হলে ভাদ্র আশ্বিন ছাড়া আর কী মাস হতে পারে?

এই আবিষ্কারটি করে তিনি ঘড়ির দিকে চোখ ফেললেন। ঘড়ির মধ্যেই তাঁর ক্যালেন্ডার। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে-তাকিয়ে তারিখটা দেখলেন তিনি। তেরোই সেপ্টেম্বর। তেরো তারিখ? এর মধ্যে তেরো তারিখ হয়ে গেল! এই তো সেদিন অগাস্ট শেষ হলো, পাতা ছিঁড়লেন ক্যালেন্ডারের, আর এর মধ্যেই তেরো তারিখ? কী ভাবে বয়ে যাচ্ছে সময়।

কিন্তু সেটা ছিলো অক্টোবরের দুই তারিখ। গান্ধীজির জন্মদিন ছিলো। অদ্ভুত। অদ্ভুত। সকালবেলায় যখন ফিরে আসছিলেন তিনি, পথে পথে ছেলেমেয়েরা প্রভাতফেরি গাইছিলো। তারপর বাড়ি এসে শূন্য ঘরে তাকিয়ে—নাঃ। তারিখটা আর ভোলা গেল না।

আর তারপর কিনা আজ এই! এই টেলিফোন। ছেলেটি কতো তিরস্কারই না করলো! কী নাম? পুরন্দর। বেশ নাম। এই পুরন্দর নামটির জন্যে কাকে বাহবা দেওয়া যায়? নিশ্চয়ই ওর মা।

ওর মা? ডক্টর রায় অন্যমনস্ক হলেন। সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষিত সৈনিকের মতো স্মৃতির পিঁপড়েরা দাঁড়িয়ে গেল সারিবদ্ধ হয়ে, তরতর করে উঠে এলো মনের উপর তলায়, তিনি অস্বস্তি অনুভব করলেন। চিন্তাটাকে সবলে উপড়ে দিতে চেয়ে আবার তিনি ফিরে এলেন তাঁর বাংলা মাস আর বাংলা ঋতুর আনুগত্যে। হাতের কর গুনে তর্জমা করলেন, আজ যদি সেপ্টেম্বর মাসের তেরো

তারিখ হয় তবে ভাদ্রের কতো হতে পারে? সাতাশ? আঠাশ? আর তাই যদি হয় তবে দোসরা অক্টোবর আশ্বিন মাসের কতো তারিখ হবে? কতো? সেদিন তো পনেরো ছিল।

আচ্ছা, তা হলে দাঁড়ালোটা কী? যদি দোসরা অক্টোবর পনেরোই আশ্বিন হয়, তা হলে আজ এই সেপ্টেম্বর মাসের তেরো তারিখ ভাদ্র মাসের কতো তারিখ হতে পারে?

ভুরুতে ত্রিশূল এঁকে ডক্টর রায় গভীর মনোযোগ নিক্ষেপ করলেন এই হিসেবটার উপরে।

কতো? কতো হবে? সাতাশ? আঠাশ? উঁহু, পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নিশ্চয়ই নয়।

তা হলে পঁচিশ ছাব্বিশ? না, সাতাশ-আঠাশ? না কি তেইশ-চব্বিশ! তেইশ-চব্বিশ পঁচিশ-ছাব্বিশ— এই চারটের মধ্যে কোনটা? কোনটা? সহসা ভয়ংকরভাবে এই অঙ্কটা নিয়ে তিনি গলদঘর্ম হতে লাগলেন। এর চেয়ে কঠিন অঙ্ক জীবনে আর কখনো করেছেন বলে মনে পড়লো না তাঁর।

সূর্যের প্রখর তাপ বিদ্ধ করতে পারছিলো না তাঁকে, তিনি কালো চশমা পরতে ভুলে গিয়েছিলেন। এক ঝাপটা ধুলো উড়লো, অভ্যাস-মতো নাকে রুমাল চাপা দিতেও মনে থাকলো না। মনে থাকলো না ধুলোতে তাঁর ভীষণ অ্যালার্জি, বিশেষত এই সর্দির মধ্যে তাঁকে আরো নাজেহাল হতে হবে। অসম্ভব গাণিতিক গবেষণায় এতো নিমগ্ন রইলেন যে অদূরে গাছের ছায়া থেকে এগিয়ে এসে খসখস ঢাকা ক্যাডিলাক গাড়িখানা কখন তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়ালো, কখন তিনি তার নরম কালো গহ্বরে উঠে বসলেন, আর কখন সেই গাড়ি নিঃশব্দ মসৃণ গতিতে তাঁকে এক বিল্ডিং থেকে আর এক বিল্ডিংয়ের দরজায় পৌঁছে দিল কিছুই খেয়াল করতে পারলেন না। কেবল ভিতর থেকেই একই শব্দ উত্থিত হতে লাগলো— কতো? কতো? কতো?

মিটিং বসবে পাঁচতলার বড়ো হলে, সেখান থেকে জানালায় দাঁড়ালেই অবারিত সমুদ্র তৃপ্ত করে চোখ, হাওয়া উঠে আসে জোরে। এ-ঘরে ডক্টর রায় যতোবার মিটিং করতে এসেছেন, এমন কখনো হয়নি যে ঘুরে ঢুকেই তিনি সোজা চলে যাননি সেই দৃশ্য দেখতে। সেই দৃশ্য কখনোই তাঁর কাছে পুরনো লাগে না, প্রতিবার নতুন করে উপভোগ করেন। আজ তারও ব্যতিক্রম ঘটলো। তাড়াতাড়ি এসে নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়লেন। বসে বসে গ্রামোফোনের ফাটা রেকর্ডের মতো কেবলি ভাবতে লাগলেন, কতো? কতো? কতো? কানের কাছে নীল মাছির মতো ভনভন করে উড়তে লাগলো শব্দ, দোসরা অক্টোবর যদি পনেরোই আশ্বিন হয় তবে তেরোই সেপ্টেম্বর কতো তারিখ হতে পারে।

যেন একটা মস্ত বড়ো ধাঁধা। ধাঁধাটা এই রকম,

'দুই দিনে হয় যদি পনেরোই তবে,
তেরো দিনে ভাদ্রের কতোদিন হবে?

যতোক্ষণ সভা চলছিলো, কেবলই এই লাইন দুটো আওড়াচ্ছিলেন তিনি। এবং ঠিক বুঝতেও পারছিলেন না, লাইন দুটো কখন এমন মিলের আকৃতি নিয়ে ছেলেমানুষি ছড়া হয়ে জিবের মধ্যে

খেলা করছে। বারে-বারে তিনি মিটিংয়ের কথা ভুলে যাচ্ছিলেন, অনেক প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছিলো কান, অন্যেরা তাঁকে লক্ষ্য করে অবাক হচ্ছিলো, তবু তিনি সচেতন হচ্ছিলেন না। কারণ, কিছুই খেয়াল করবার মতো মনের গতি ছিল না তাঁর।

॥ ৩ ॥

সভা শেষ হল ঠিক সাতটায়।

ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে ঢুকেছিলেন, গাঢ় সন্ধ্যায় বেরিয়ে এলেন।

আপিসের মস্ত চৌহদ্দি তখন আলোয় আলোময়। তৈরি-করা সবুজ ঘাসের আস্তরণ ঢাকা মাঠের পাশ দিয়ে লম্বা-লম্বা পিচঢালা পথের দু'ধারে নিয়ন আলোর নীলচে দ্যুতি বিকীর্ণ হচ্ছিল। বাগানে জলের ফোয়ারা শতধারে উপচে পড়ছিল, মৌসুমী ফুলের রংয়ের বাহার বাতাসে দুলে-দুলে অন্য কোনো অলৌকিক জগতের ছবি আঁকছিল।

কিন্তু কোনো দিকে তাকাবার সময় ছিল না ডক্টর রায়ের। পাঁচতলা থেকে আলাদা লিফটে হুশ করে একতলায় নেমে, বারান্দা পেরিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন। মাঠ বাগানের শোভা সৌন্দর্য পিছনে ফেলে বেরিয়ে এলেন বাইরে। ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে নিজেই চালাচ্ছিলেন, ইচ্ছাসুখ স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। মনে হচ্ছিল, কোনো রকমে উড়ে গিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হতে পারলে বাঁচেন।

সেই সময়ে ছড়াটা যেন কখন ভুলে গেলেন তিনি। মাথার মধ্যে তখন অন্য একটি চিন্তা ঘুণপোকা হয়ে ঘুরছিল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো,' 'তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো।' কিন্তু কেন?

না, সেই কেনর কোনো সদুত্তরও ছিল না তাঁর কাছে।

শরীরটা থেকে-থেকে জানান দিচ্ছিল সে ভালো নেই। গা ব্যথা বেড়ে উঠছিল, মাথার টিপটিপ জোর হচ্ছিল, চোখ-মুখও জ্বালা-জ্বালা করছিল। বোঝা যাচ্ছিল সাতদিনের বৃষ্টি তাঁকে বেশ একখানা ভালো উপহার দিয়ে বিদায় নিয়েছে।

অবশ্য বৃষ্টির দোষ নেই কোনো। দোষ তাঁর নিজেরই। কাল মাথার দিকের জানালাটা সারারাত খোলা ছিল, ঘুমের মধ্যে গভীর রাত্রে ছাঁট এসে যখন তাঁকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল তিনি গাঢ় নিদ্রায় অচেতন ছিলেন। তারপর সকালে উঠে দেখেছেন, বালিশ বিছানার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর রাত পোশাকটিও ভেজা। সারিডন, কোসাবিন, ওরিসুল, আভিল, সব ওষুধ মজুত আছে ঘরে, চিন্তা

করে সারিডনই খেয়েছিলেন প্রথমে, গা ম্যাজম্যাজ করা আর মাথাধরা দুই-ই কমে গিয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে, শত্রু অজেয়। এত সহজে পরাস্ত হবার নয়। আরো কড়া ডোজে কিছু খেতে হবে বাড়ি গিয়ে, জ্বর-টর হয়ে পড়ে থাকলে তো বিপদ।

কী বিস্বাদ লাগছে সব। বিস্বাদ। বিস্বাদ। শরীর মন সব বিস্বাদে ভরা। অবশ্য এই বিস্বাদ তাঁর নতুন নয়। শরীরের বিস্বাদ হয়তো সাময়িক কিন্তু মানসিক বিস্বাদ চিরন্তন। বলতে গেলে বহু বছর যাবৎ এই বিস্বাদের সঙ্গে বাস করতেই তিনি অভ্যস্ত। শুধু ডিগ্রির তফাত ঘটে মাঝে-মাঝে। মাঝে-মাঝে বাড়ে আর মাঝে-মাঝে কমে।

যেমন আজ। আজ সকাল থেকেই শরীর প্রতারণা করছিল তাঁর সঙ্গে, কিন্তু ফোনটা পেয়ে থেকে মনটাও যেন বিষের টুকরো হয়ে আছে। যেখানে ছুঁচ্ছেন সেখানেই ব্যথা, সেখানেই বিস্বাদ।

অসুখবিসুখ বড়ো একটা হয় না, জ্বর যে শেষ কবে হয়েছিল মনেই পড়ে না, আজকের স্বাদটা জ্বরের মতো। গাড়ি চালাতে-চালাতে হাত ছেড়ে নিজের তাপ নিজেই পরীক্ষা করে নিচ্ছিলেন, প্রায় ধাক্কা লেগে গিয়েছিল একটা পোস্টের সঙ্গে, ক্ষিপ্র হাতে সামলে নিয়ে বেগ কমালেন। কুয়াশার মতো ছেয়ে থাকা ঝাপসা মনখারাপ করা ভাবটা আরো প্রবল হয়ে উঠলো।

সেবার ক্যালিফর্নিয়ায় কোনো-একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়ে একটা ইটালিয়ান ফিল্ম দেখে খুব অভিভূত হয়েছিলেন। এই বিস্বাদেরই ছবি। ইংরাজিতে যাকে বলে বোরডম। নায়ক ছিল মার্চেল্লো আর নায়িকা সোফিয়া লোরেন। ছবির টুকরো-টুকরো কতগুলো দৃশ্য এখনও জাজ্জ্বল্যমান। বোরডমে ভুগতে-ভুগতে লোকটা শেষে কী যে করল আর করল না ঠিক নেই কোনো। ছবির নায়কটিকে নিজের সঙ্গে আইডেনটিফাই করে বেশ উত্তেজিত বোধ করেছিলেন তিনি। সেই রাত্রে ঘরে ফিরে আর ঘুমুতে পারেননি। আর সেই রাত্রেই হঠাৎ ভীষণ জ্বর এসেছিল। সকালে উঠেই হাসপাতাল। সপ্তাহখানেক পড়ে থাকতে হল বিছানায়।

বলতে গেলে দেশ ছাড়ার পরে সেই জ্বরই বোধহয় প্রথম ও শেষ।

কিন্তু জ্বরে যত না ভুগেছিলেন, বোরডমে ভুগেছিলেন তার চেয়ে বেশি। বিরস মুখ দেখে নার্স জিজ্ঞেস করেছিল, গাল ফ্রেন্ড চাই কি না। এত হাসি পেয়েছিল!

আচ্ছা, ইংরিজিতে ওরা যাকে বোরডম বলে, আমরা কি তাকেই বিস্বাদ বলি? ডক্টর রায়ের চিন্তা আবার বিস্বাদ আর বোরডমের গবেষণায় সক্রিয় হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন, বিস্বাদ আর বোরডম একই কি না অথবা আলাদা। যদি আলাদাই হয় তবে বোরডমের প্রতিশব্দ কী?

বিস্বাদ, বিস্বাদ, বিশ্রী-লাগা মন-খারাপ, ক্লান্তি--কোনটা এর সবচেয়ে কাছাকাছি শব্দ? কোনটা? খানিক আগের ঐ ইংরিজি বাংলা তারিখের মতোই এই গবেষণা তাঁর মাথাকে ক্রমাগত ঘুরপাক খাওয়াতে লাগল। আস্তে-আস্তে তিনি অস্থির বোধ করতে লাগলেন, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন।

নির্বেদ।

ইয়েস্। নির্বেদ। দ্যাট্‌স দা ওয়ার্ড, নির্বেদ। হঠাৎ শব্দটা পেয়ে গিয়ে গাড়ি চালানো ভুলে উৎসাহে তিনি দু হাত উপরে তুলে দিয়েছিলেন।

নির্বেদ। চমৎকার প্রতিশব্দ। শব্দটা কি আমি বানালাম নাকি ? কী কাণ্ড। তা হলে বাংলা জ্ঞান এখনও একটু-একটু জিইয়ে আছে মাথার মধ্যে ? এত খুশি লাগল সে কথা ভেবে যে একটা গানের লাইন পর্যন্ত মনে পড়ে গেল। 'যে ছায়ারে ধরবো বলে করেছিলেম পণ, আজ সে মেনে নিল আমার গানেরই বন্ধন।' বেসুরো গলায় একটু সুরও ভাঁজলেন।

কিন্তু আমার কলম ? কলমটা কই ? সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতটা বুক-পকেটে চেপে আঁৎকে উঠলেন। নিশ্চয়ই ফেলে এসেছেন। কোথায় ফেললেন ? এই কলম ছাড়া তাঁর চলবে কী করে ? অত্যন্ত প্রিয় কলম, এটাকে তিনি চোখে হারান। প্রিয় বলতে এই ধরনেরই দু একটা জিনিস এখনও অবশিষ্ট আছে জীবনে, এরা গেলে আর থাকল কী ? নির্বেদ এবং গানের সুব ভুলে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন তিনি। বাড়ির অর্ধেক রাস্তায় এসে আবার গাড়ি ঘোরালেন, আর ঘুরিয়েই পায়ের তলায় চোখে পড়ল কলমটি। কখন পড়ে গেছে নিচে।

আঃ। একটি আরামের নিশ্বাস বেরিয়ে এল তৎক্ষণাৎ। কলমটি তিনি বছর সাতেক আগে জার্মানিতে গিয়ে কিনেছিলেন। চমৎকার কলম। নামটিও সুন্দর, মঁব্লাঁ। দেখতেও সুন্দর। ঘন সবুজ গা আর মাথায় লাল টুপি। এটা দিয়ে না লিখলে তো তাঁর লেখাই হয় না।

॥ ৪॥

গাড়ি বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছল। দারোয়ান দৌড়ে এসে গেট খুলে দিয়ে সেলাম জানিয়ে পাশে সরে দাঁড়াল। গাড়ি গোল হয়ে ঘুরে বাংলোর বারান্দায় থামল।

পোর্টিকোতে আলো জ্বলছিল, গৃহসেবকেরা ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছিল মনিবের জন্য। এবার তারা ছুটোছুটি শুরু করল। বেয়ারা অকারণে এ-কাঁধের ঝাড়ন ও-কাঁধে নিল, গোয়ান পাচকটি অ্যাপ্রনের লাগানো বোতাম খুলে আবার লাগাল, ছোটো ছোকরাটা গাড়ি থেকে পোর্টফোলিও নামিয়ে ছুটে গেল দোতলায়।

অন্য দিন মিটিং থাকলে বা ডিনার থাকলে বা অন্য যে কোনো কারণে হোক দেরি হবে জানলে তিনি ওদের বলে যান। আজ ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা বলে গেলে লোকজনেরা অনেক শান্তিতে থাকতে পারে। কেননা, কখন আসবেন কখন আসবেন এই উদ্বেগ থাকলে তাদের পক্ষে ইচ্ছেমতো কিছু করাই সম্ভব নয়। গতিবিধি জানলে দরকারমতো কোথাও যেতে পারে, তাস খেলতে পারে, আড্ডা দিতে পারে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেকে পরিপূর্ণ স্বাধীন ভাবতে পারে।

দেখা গেল সেই কারণেই মনিবের জন্য আজ সবাই বেশ উদ্বিগ্ন। আসলে মনিবকে ওরা ভালোবাসে, মনিবের সুখসুবিধের জন্য ওরা স্বেচ্ছায় উৎসুক। ডক্টর রায়ও অবশ্য ওদের ভালোবাসেন, যত্ন করেন, খোঁজখবর নেন, নিজের লম্বা মাইনের বেশ বড়ো একটা অংশ ভাগ করে দেন সকলের মধ্যে। ভৃত্যেরা তাঁর কাছে ভৃত্য নয়, আত্মীয়, বন্ধু, সন্তান।

ঘরে ঢুকে সকলের দিকে তাকিয়ে তিনি সামান্য হাসলেন, তারপর সোজা চলে এলেন নিজের ঘরে। দু মিনিটে চা নিয়ে এলো আমজাদ আলি, খাবার নিয়ে এল, তিনি জলের মত এক কাপ পাতলা চায়ের সঙ্গে দুটো ওরিসুল খেয়ে মাথা টিপে বসে রইলেন।

ফোন ধরে, মিটিং করে দ্রুততম বেগে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি আসার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার তাঁর ব্যর্থতাবোধ তাঁকে আক্রমণ করেছে। তিনি ভেবে পাচ্ছেন না, কে না কে এক উদ্ধত যুবক তাঁর সন্তানের দাবি নিয়ে দু'চারটে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করা মাত্রই তিনি আচমকা তাকে খেতে বললেন কেন? দেখা করতে চাইলেই কি দেখা করা যায়? কেন দেখা করবেন? কী প্রয়োজন? কী বলবেন তিনি? এই এক রাগী অপাপবিদ্ধ ছোকরাকে তাঁর মতো বয়স্ক একজন পুরুষের কী বলবার থাকতে পারে? থাকলেই কি তা বলা যায়, না বলা উচিত?

তাঁর ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। তবু উঠলেন, ঘর সলগ্ন বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। ঠাণ্ডা জল গরম জলের কল খুলে, সল্ট ছিটিয়ে টবে অবগাহন করলেন। সেই

সময়ে তাঁর মন শূন্য ছিল, তিনি কিছুই ভাবতে পারছিলেন না।

একটু পরেই সচকিত হলেন। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে চুল মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এলেন বাইরে। ঘড়িতে দেখলেন আটটা বাজতে পাঁচ। আবার তাঁর শূন্য মনের যন্ত্রণাটা চঞ্চল হয়ে উঠল, এঞ্জিনগুলো গজরাতে লাগল, একটা যন্ত্রণাময় প্রতীক্ষায় ছটফট করতে লাগলেন।

বাড়িটি খুব সুন্দর। দেড় বিঘা জমির উপর বাগান আর লনে ঘেরা এ-রকম চারটি বাংলো আছে এই কম্পাউন্ডে। চারটি বাংলোই তাঁদের প্রতিষ্ঠানের কেষ্টবিষ্টুরা আলোকিত করে রেখেছেন। অন্য তিনজন খাস ইংরেজ, একমাত্র তিনিই ভারতীয়। যার যার বাংলোর সামনে পিছনে তার তার লন বাগান এবং সবজি-খেত। প্রতিষ্ঠানের মাইনে করা মালিরাই সে-সব রক্ষণাবেক্ষণ করে, বসবাসকারীরাও কিছু দক্ষিণা দিয়ে যার যার অংশে পছন্দমতো ফুল সাজায়।

বাড়িটিতে একতলা-দোতলা মিলিয়ে ঘরের সংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু প্রশস্ত। একতলায় খাবার ঘর, বসবার ঘর, রান্নাঘর, অতিথির ঘর ইত্যাদি মিলিয়ে হাত-পা ছড়ানো, দোতলায়ও তেমনি শোবার ঘরগুলো মস্ত বড়ো। বলতে গেলে নিচতলাটা ব্যবহারই করেন না ডক্টর রায়, তাঁর সবই দোতলায়। যেদিন কোনো পার্টি থাকে শুধু সেদিনই নীচের ঘরগুলো মুখর হয়ে ওঠে। হলের মতো বিরাট ড্রয়িংরুমটি ভরে যায় অতিথিতে, খাবার ঘরের প্রকাণ্ড টেবিল কাঁটা-চামচ-প্লেট এবং শৌখিন লেসের ঢাকনায় সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। নইলে ডক্টর রায় দোতলাতেই বসেন, খান এবং শোন।

দোতলার বসবার জায়গাটি তাঁর ভারি প্রিয়। ঝোলানো অর্ধচন্দ্রাকার তিন দিক বারান্দাটিতে বসলে মুহূর্তে মনের গ্লানি ফিকে হয়ে আসে, দূরে তাকিয়ে সমুদ্র দেখা যায়, তার অস্পষ্ট কল্লোলও শ্রুতিগোচর হয়। আর বাতাস একেবারে ছুটে এসে ঘা দেয় বাড়িটার দেয়ালে দেয়ালে। তাঁর পর্দা ওড়ে, ড্রেসিংগাউন ওড়ে, তিনি চুপচাপ দাঁড়ান আলোর তলায়, বসে-বসে বই পড়েন, সামনের টেবিলে বেয়ারা হুইস্কি সোডা রেখে যায়।

স্নান সেরে প্রস্তুত হয়ে তিনি তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলেন, রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রাঁধুনিটিকে সম্বোধন করে বললেন 'আমার সঙ্গে আজ একজন খাবেন, মুর্গি করো। ফ্রিজে আছে তো? আইসক্রিমও করো। আর ভাজা-টাজা— তুমি ভালো মনে কর। হ্যাঁ, শোনো, ভাত দরকার হবে, ভাত। যে আসবে সে ভাত খায়। ডিম মাংস সবজি সব মিলিয়ে ভালো করে চীনে ভাত করে দাও। তাড়াতাড়ি করো, চারটে গ্যাসই জ্বেলে দাও।'

রান্নাঘরের দরজা থেকে ড্রয়িংরুমে এলেন, এর-ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আলোগুলো জ্বেলে দাও সব। বারান্দা বাগান লন, বসবার ঘর, যতোগুলো আলো আছে, সব জ্বেলে রাখো। আর হ্যাঁ, একজন গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো গেটের ধারে। একটি অল্পবয়সী ছেলেকে দেখলেই জিজ্ঞেস করবে সে আমার বাড়ি খুঁজছে কি না। এলে, একেবারে উপরে, আমার বসবার বারান্দায় নিয়ে যাবে।'

বলতে-বলতে টুকটুক নিজেই আলোগুলো জ্বেলে দিলেন। বারান্দায় এলেন, বারান্দা থেকে

বাগানের গেট দিয়ে লনে ঢুকলেন। ঘুরে-ফিরে, ধীরে-ধীরে গেটের কাছেও এসে দাঁড়ালেন খানিকক্ষণ, তারপর কী ভেবে ফিরে গেলেন তাড়াতাড়ি। দোতলায় গিয়ে বারান্দায় বসলেন প্রতিদিনের মতো। হাতে বই, মাথার কাছে আলো।

সেখানে থেকেও তিনি রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন, অনন্ত আকাশ দেখতে পাচ্ছেন, আর দূরে দেখছেন বিশাল কালো জলরাশির অতল অন্ধকার। মধ্যে-মধ্যে উল্কার মতো ফসফরাসের ঝিলিক।

আবার মেঘ করল। চমকে গেলেন তিনি, আটটা বেজে আট। এলানো চেয়ারের আরামে রোজকার মতোই একখানা বই নিয়ে আধো-শোয়া হয়েছিলেন, দাঁড়ানো আলোর একাগ্র জ্যোতি তাঁর বইয়ের অক্ষরকে দীপ্তিময় করে তুলেছিল, কিন্তু তিনি মন দিতে পারছিলেন না।

যদি বৃষ্টি হয়? যদি ঝড় ওঠে? এই চিন্তায় বিদ্ধ হতে লাগলেন। অবশ্য বৃষ্টি হলে তাঁর কী? তিনি তো বাড়িতে পৌঁছে গেছেন, বাইরেও এমন কেউ নেই, যার জন্য এতো ভাবনা। এই প্রশ্ন তিনি নিজেকেই নিজে করেছিলেন, তেমন যুক্তিযুক্ত জবাব দিতে পারেননি। শেষে ভাবলেন, 'না, এ-রকম সময় অসময়ের বৃষ্টি আমি ভালোবাসি না বোধহয়।'

ভালোবাসেন না? বাসেন। নিশ্চয়ই বাসেন। বৃষ্টির ঋতু চিরদিন তাঁর প্রিয়। মেঘের আওয়াজ ছেলেবেলা থেকে তাঁকে পাগল করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে বৃষ্টির গান তাঁর সব চেয়ে বেশি ভালো লাগে। 'এ কী গভীর বাণী এলো ঘন মেঘের আড়াল ধ'রে সকল আকাশ আকুল ক'রে' অথবা 'এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে, সেই আগুনের কালো রূপ যে আমার চোখের পরে নাচে।' অথবা 'হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে, বেড়া ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে।' এইসব গান তো এখনও কণ্ঠস্থ। না-বলে অবশ্য মুখস্থ বলা ভালো। কেননা কণ্ঠে তাঁর গান নেই। সুর নামক পদার্থটি বড়ো বেশি দূরে তাঁর কাছ থেকে। তবু আকাশে মেঘ ডাকলেই তো তিনি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে গেয়ে ওঠেন এ-সব গান।

অর্থাৎ কোনোদিন গেয়ে উঠতেন, এখন নয়। এখন সবই অতীত। সবই ইতিহাস।

চোখ আবার ঘড়ির দিকে গেলো। আটটা পনেরো।

পা নাচাচ্ছিলেন তিনি, বইয়ে মনোযোগ-ভ্রষ্ট হয়ে অশান্তভাবে নড়াচড়া করছিলেন। বেয়ারা এসে দরজায় ছায়া ফেললো। ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে বসলেন, গম্ভীরভাবে নিবন্ত সিগারেট টান দিলেন।

'সাব।'

'বলো।'

'সোড়া হুইস্কি—'

'ও, সোডা হুইস্কি? না, এখন যাও।'

আবার ঢিলে হয়ে হেলান দিলেন চেয়ারে, পা নাচানোটা বেড়ে গেলো।

আটটা কুড়ি। পা নাচানো বন্ধ করে এবার তিনি চুল টানতে লাগলেন। খানিকবাদে বইটাও বন্ধ করে ঠাস করে রেখে দিলেন টেবিলে। কী ভেবে আলোটাও নিবিয়ে দিলেন।

কিন্তু কেন যে স্থির থাকতে পারছেন না কে জানে। আবার তাঁর ঘড়ি দেখার দরকার হলো, অন্ধকারেও জ্বলছিল কাঁটাগুলো, তাতে হলো না, টিপ করে আলো জ্বেলে নিলেন। আটটা তিরিশ। অর্থাৎ সাড়ে-আটটা।

'ইরেসপনসেবল!' অস্ফুটে উচ্চারণ করে অত্যন্ত রাগতভাবে অ্যাশট্রেতে সিগারেট ঘষটে দিয়ে তাকিয়ে থাকলেন সামনের দিকে।

কিন্তু সেভাবেও বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না। উঠে দাঁড়ালেন, আড়মোড়া ভাঙলেন, চলে এলেন রেলিংয়ের কাছে। দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে রাস্তাটা। মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটি পথিককে যাচাই করতে লাগলেন তীক্ষ্ণ চোখে।

নাঃ। ছোকরা আর এলো না। সত্যি সময়জ্ঞান বলে কোনো পদার্থ এদের নেই। আসবে এসো, না আসো তো এসো না। তা বলে অন্যকে এমন উদ্বিগ্ন করে রাখার কোনো অধিকার নেই তোমার।

রেলিংয়ের ধার থেকে তিনি ফিরে এলেন।

এর নামই সামাজিক অপরাধ। অন্যের কাজের ক্ষতি করা।

যাকগে, না এলো তো নাই এলো। বরং বাঁচা গেলো একদিক থেকে। এলে তিনি কী বলতেন তাকে?

'বেয়ারা।' পানীয়ের জন্য হাঁক দিয়ে উঠেছিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে পর্দা সরিয়ে মুখ বার করল সে। বিনীত স্বরে বলল, 'যে-বাবুর আসবার কথা ছিল, তিনি এসেছেন।'

প্রায় কেঁপে উঠেছিলেন ডক্টর রায়। হাতের সিগারেটটা পড়ে গেল,পায়ের চাপে নিবিয়ে দিতে দিতে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'কোথায়? কোথায়?'

'নিচে ড্রয়িংরুমে বসেছেন।'

'ড্রয়িংরুমে কেন? এখানে, এখানে নিয়েসো।'

বেয়ারা চলে গেল, তিনি তাড়াতাড়ি বসলেন। কিন্তু উঠলেন তক্ষুণি। হাঁটতে লাগলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন। আবার সিগারেট ধরালেন। কী যে করবেন ঠিক ভেবে পেলন না। তার মধ্যেই হুড়মুড়িয়ে একটি উদ্ধত যৌবন এসে বারান্দায় আবির্ভূত হলো।

যে-ছেলের মায়ের মুখটা তিনি অতি সন্তর্পণে অতি সংগোপনে অনেক চিন্তার মধ্যেও বারে-বারেই মনে আনতে চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ যেন তা প্রত্যক্ষ হয়ে তাঁর দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিল।

ছেলেটি এগিয়ে এসে ঘোষণা করল, 'আমি পুরন্দর।'

ডক্টর রায় চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। আমি সুদর্শন রায়।'

'আমিও বুঝতে পেরেছি।' পুরন্দর হাসল। কালো রংয়ের একটা চাপা প্যান্ট আর ছাপকা-ছাপকা একটা বুশশার্ট পরেছে, জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ, গালভরা দাড়ি আর মাথাভরা চুল ঈষৎ এলোমেলো। কোথাও এতোটুকু দ্বিধা আছে বলে মনে হলো না।

ডক্টর রায় বললেন, 'বোসো।'

'কিন্তু তার আগে কি আপনাকে আমার প্রণাম করা উচিত?'

স্মিতহাস্যে ডক্টর রায় বললেন, 'একেবারেই না।'

'যাক, এই একটা সামাজিকতা থেকে তা হলে বাঁচা গেল।'

'আমি সামাজিকতার কথা ভেবে বলিনি।'

'কী ভেবে বলেছেন?'

'ভেবেছি তোমার বিবেচনায় আমি নিশ্চয়ই প্রণম্য নই?'

'ঠিক! ঠিক ধরেছেন। আমি কখনোই আপনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি না।'

'অতএব চুকে গেল।' সহাস্যে দেশলাইয়ের বাকসের উপর তিনি সিগারেট ঠুকলেন, 'যিনি শ্রদ্ধেয় নন, তাঁকে প্রণাম করবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তার চেয়ে এসো—' হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'বিলিতি প্রথামত হ্যান্ডশেক করা যাক।'

'তাই ভালো।' হাতের সঙ্গে হাত মিলোলো পুরন্দর, আর যৌবনের তাপেই গলে গিয়ে ডক্টর রায় তাকে আলিঙ্গন করলেন।

'আমার দেরি দেখে নিশ্চয়ই ভাবছিলেন আসবো না?' পুরন্দর বসলো।

তিনিও বসলেন, হাসিমুখে বললেন, 'তা ভাবছিলাম।'

'আর মনে-মনে বলছিলেন বাঁচা গেল।'

'না।'

'তবে?'

'মনের সব কথা কি সকলকে বলা যায়?'

'না-বললেও বুঝতে পারছি, তেমন ব্যস্তও আপনি ছিলেন না।'

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে ডক্টর রায় বললেন, 'ছিলাম।'

'ছিলেন? কেন?'

'এই একটা কৌতূহল।'

'কৌতূহল? কীরকম?'

'যেমন তোমার, ঠিক তেমনি।'

'বাবা বিষয়ে ছেলের কৌতূহল আর ছেলে বিষয়ে তার বাবার কৌতূহল কি এক বস্তু?'

'কী জানি!' ডক্টর রায় অন্য দিকে তাকালেন।

'লোকেরা বলে স্নেহ নিম্নগামী, আপনি কি সেই প্রবাদটা বিশ্বাস করেন?'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নেই, শুধু জানবার আছে যে স্নেহাস্পদ মানুষটি কে?'

'এ-ক্ষেত্রে তো সেটা জানাই ছিল।'

'ছিলো নাকি?'

'ছিলো না?'

'বলো, কী খাবে? চা? কফি? না কি অন্য কোনো পানীয়?' ডক্টর রায় প্রসঙ্গটা সেখানেই শেষ করে দিতে চাইলেন।

পুরন্দর বলল, 'আপনার যা খুশি। খাওয়া নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই, গোটা কয়েক কথা বলতেই এসেছি আমি।'

'রাত্তিরে কটার সময় খাওয়া তোমার অভ্যেস?'

'আটটা ন'টা দশটা এগারোটা বারোটা-- ও-সব কিছুই ঠিক নেই, কিন্তু কথাটা হচ্ছে--'

'তুমি কি বরাবর এই বম্বেতেই আছ?'

'না, এসেছি। এবং এসেই--'

'কোথায় থাকো?'

'কলকাতায়। আমি আপনাকে যা বলতে চাইছি--'

'কী করো সেখানে?'

'পড়াই। তা হলো এই যে--'

'কলেজে না স্কুলে?'

'কলেজে। আমাদের পিতাপুত্রের জীবনে সত্যি বলতে--'

'বম্বেতে কোথায় আছ?'

'পান্থনিবাস বলে একটা শস্তা হোটেলে। যা উচিত ছিল সেটা হচ্ছে স্নেহবশে আমার কথাই আপনার মনে পড়া। তা কিন্তু হয়নি। উল্টো দিক থেকে আমিই আপনাকে অহরহ ভেবেছি, ভেবে-ভেবে--'

'ও, পান্থনিবাস? জানি। নতুন হয়েছে, তাই না?'

'হতে পারে। অথচ আমি আপনাকে দেখিনি, শুনিনি, চিনিনি, এবং সবচেয়ে যেটা বড়ো কথা, আমি আপনাকে জগতে আনিনি, আপনিই আমাকে এনেছেন--'

ছেলেটিকে প্রতিহত করতে না পেরে ডক্টর রায় এবার চুপ করলেন।

'ব্যাপারটা তবু অন্য রকম হলো কেন? আপনি আমার জন্য ব্যাকুল না হয়ে আমি কেন আপনার জন্য ব্যাকুল হলাম?' ভয়ানক উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে কথা বলছিল পুরন্দর, 'শুধু তাই নয়, টেলিফোনে আমার নিজের পরিচয় জানাবার পরেও আপনার স্বল্প বাক আমাকে শুধু আহতই করেনি, আমি তাজ্জব হয়ে ভেবেছি লোকটার কি সত্যি মন-প্রাণ বলে কোনো পদার্থ নেই? অবশ্য তা যে নেই সে তো আমার মায়ের অবস্থা দেখেই আমি জেনেছিলাম। তবু ভেবেছিলাম, মানুষ তার স্ত্রীর সম্পর্কে যতো নিষ্ঠুরই হোক, প্রকৃতির পরিহাসে আপন সন্তান বিষয়ে নিশ্চয়ই অন্য রকম হতে বাধ্য। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার প্রতীতী জন্মালো যে ব্যতিক্রম সর্বত্রই সম্ভব। তবু আমি এসেছি। যদিও মনকে চোখ ঠার দিয়ে বলেছি, এ আসা আমার আসা নয়, এ আমার যুদ্ধ-ঘোষণা, কিন্তু মনের অগোচর পাপও তো নেই, সুতরাং জানি সে-কথা যদি পঁচিশ পরিমাণে সত্যি হয়, বাকি পঁচাত্তর ভাগ আমার কাঙালপনা, যা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।'

এক তোড়ে এতো কথা বলে, একটু থামলো পুরন্দর। সে বড়ো-বড়ো নিশ্বাস নিচ্ছিল।

দুই হাতের পাতায মুখের ভার রেখে ডক্টর রায় বললেন, 'তুমি শান্ত হও, বিশ্বাস করো তোমাকে দেখার পরে আমার মনে কোনো গ্লানি নেই।'

'গ্লানি? গ্লানি কিসের?'

'সোজা ভাষায় আমার খুব ভালো লাগছে।'

'শুধু এই?'

'ফোনে তুমি যখন আমাকে তোমার পিতৃত্বের আসনে বসিয়ে সমস্ত অধিকারের দাবি নিয়ে তিরস্কার করছিলে, প্রাপ্য নয় জেনেও আমি তা লোভীর মতো গ্রহণ করছিলাম।'

'প্রাপ্য নয় মানে?'

'সব কথার মানে জানতে চেয়ো না, এসো আমরা অন্য বিষয়ে কথা বলি। তোমার মা কেমন আছেন?'

'আমার মা? আমার মাকে কি আপনার মনে আছে?

'জগতে এমন অনেক কিছু আছে যা ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না।'

হঠাৎ চুপ করে থেকে পুরন্দর ভালো করে তাকালো ভদ্রলোকটির মুখের দিকে। পিতা নামক সুবেশ সুন্দর মানুষটিকে সে দেখতে লাগলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে।

।।৫।।

বেশ লাগছিলো দেখতে। চলন-বলন চেহারা ভঙ্গি-সব, সব মনে এক মুগ্ধতার আমেজ এনে দিচ্ছিলো। তার বোধ হচ্ছিলো, কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে যার জন্য ভদ্রলোকটি ঠিক দায়ী নন। এবং এই মুহূর্তের মুখশ্রীতে যে বেদনা প্রতিফলিত তাও অসত্য নয়।

ডক্টর রায়ও দুই চোখ দূরে ভাসিয়ে দিয়ে অনেক কথাই চিন্তা করছিলেন। ভেবে পাচ্ছিলেন না একদিন যেজন্য সমস্ত জগৎ-সংসার ওলোটপালট হয়ে গেল, সমস্ত জীবন একটা যন্ত্রণার কুণ্ডে পরিণত হলো, আপন হাতে যার জন্য তিনি বুক থেকে তাঁর কলজে উপড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, আজ কেন সেই কারণগুলো এমন অর্থহীন, এমন পলায়মান। তিনি হৃদয়ের মধ্যে ভারি মধুর একটি স্নেহ অনুভব করছিলেন ছেলেটির জন্য। ছেলেটির রাগ অভিমান তিরস্কার, বিশ্বাসের সরলতা, সব-কিছু তাঁকে মায়াবী করে তুলছিল, তাঁর ভাল লাগছিলো এই একটি তপ্ত জীবন্ত অস্তিত্বের মুখোমুখি বসে থাকতে। পিতৃত্বের আস্বাদে তিনি বস্তুতই সিক্ত হচ্ছিলেন। তাঁর নিঃসঙ্গ প্রৌঢ়ত্ব—

'আপনার বাড়িটি ভারি সুন্দর।' পুরন্দরের জেহাদ-ঘোষিত গলা ঈষৎ কোমল শোনালো।

'উঁ?' তিনি চমকে তাঁর চিন্তার জগৎ থেকে ফিরে এলেন। মৃদুহাস্যে বললেন, 'তোমার ভালো লাগছে?'

'লাগবে না!'

'বম্বেতে ক' দিন থাকবে তুমি? এখানে চলে এসো না।'

'এখানে?'

'দোষ কী?'

'পিতা হয়ে পুত্রের প্রতি এই ভদ্রতার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে এই আমন্ত্রণের কথা আমি মনে রাখবো। আপাতত আমার মেয়াদ অত্যন্ত সংকীর্ণ।'

'কলকাতাতেই ফিরে যাচ্ছ? কবে?'

'আমার জাহাজ পরশু বেলা দশটায় ছেড়ে যাবে।'

'জাহাজ?'

'আমি একটা বৃত্তি নিয়ে বিদেশে যাচ্ছি।'

'বিদেশে!' হঠাৎ কেমন একটা বিচ্ছেদের কষ্ট উপলব্ধি করলেন ডক্টর রায়। চুপ করে থেকে বললেন, 'কোথায়?'

'আমেরিকা। হিউস্টনে।'

'ও।' একটু থেমে, 'কী করবে?'

'কী আর। যা সবাই করে।

'পি-এইচ ডি?'

'তাই তো ভাবছি।'

'কী বিষয় ছিলো তোমার?'

'অর্থনীতি।'

'অর্থনীতি? ইকনমিক্স?'

'শুনেছি সে-বিষয়ে আপনি পয়লা নম্বর ছিলেন।'

'কার কাছে শুনেছ? ডক্টর রায় উৎসুক হলেন।'

'লোকপরম্পরায়।'

'ও'। জবাব শুনে যেন একটু স্তিমিত হলেন। আবার উৎসুকভাবে বললেন, 'বিষয়টা তোমাকে কে নির্বাচন করালো?'

'আমি নিজে।'

'তুমি নিজে?'

'সম্পূর্ণভাবে।'

'ও।'

'পাস-টাস করে বেরুবার পরে শুনলাম আপনার মাথার ছিটেফোঁটা আমার মাথার মধ্যে ঢুকছে।'

'কে বললো?' আবার তাঁর দুই চোখে আগ্রহের আলো জ্বলে উঠলো।

পুরন্দর মৃদু হেসে বললো, 'এক্ষেত্রেও লোকপরম্পরা শব্দটি প্রযোজ্য।'

'ও।' ডক্টর রায় বেগে পা নাচাতে লাগলেন।

'অমি শুনেছিলাম আপনি বহুকাল যাবৎ লন্ডনপ্রবাসী।'

'এও কি লোকপরম্পরায় খবর?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতা এসে বড়ো হতে হতে দেখলাম, চারদিকে অনেক লোক, এবং লোকেরা সকলের সব খবরের জন্যই সমান উৎসাহী। অবশ্য আমিও আপনার খবর জানবার জন্য সেই উৎসাহে সমানে পাল্লা দিয়েছিলাম।'

'কী জানলে?'

'জানলাম, স্ত্রীকে ত্যাগ করে আপনি বিদেশে চলে গেছেন।'

'ও।'

'সেখানেই বাড়ি-টাড়ি কিনে--' পুরন্দর এতোক্ষণে কী যেন খেয়াল করে রঙিন পর্দা ঢাকা ঘরগুলোর দিকে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠলো, রূঢ় গলায় বললো, 'আর সব কোথায়?'

হাসলেন ডক্টর রায়, 'লোকেরা বলে দেয়নি সে-কথা?'

'না।'

'তাহলে ব্যক্তিগত বলে সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে আমাব জন্য?'

'নিশ্চয়ই। ক্ষমা করবেন, আপনার সেই ব্যক্তিগত জীবনটার কথা এতোক্ষণ আমার একেবারেই মনে পড়েনি।'

'মনে পড়লে কী করতে?'

'আসতাম না। আমি শুধু আমার বাবা ভেবেই এমন ছিটকে চলে এসেছি, যদি মনে পড়তো-'

'কী আশ্চর্য! অন্য কারো বাবা হলেই বা তোমার আপত্তিটা কোথায়? লোকেদের তো ভাইবোন থাকে, না কি থাকে না?'

পুরন্দরের ক্রোধ দেখে তিনি কৌতুক বোধ করছিলেন।

'না, এক্ষেত্রে আমার পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমি চলি।'

'আরে বোসো বোসো। আমার সঙ্গে খাবার কথা আছে না তোমার?'

'আমি খাবো না।'

'এ তো ভারি মেজাজি ছেলে দেখছি। শোনো—'

'বলুন।'

'এ-রকম রাগ করে চলে যাচ্ছো কেন?'

'রাগ করার কোনো প্রশ্নই নেই। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতোটুকু? আপনার যারা স্বজন, তারাই বরং এই আপ্যায়নের জন্য রাগ করবেন আপনার উপর।'

'আমার স্বজন? কে বলো তো?'

'নিশ্চয়ই আপনার বিদেশিনী স্ত্রী এবং তাঁর সন্তানেরা।'

'দুঃখিত। সেই শুভ সংবাদটি তোমাকে আমি দিতে পারলাম না।'

'মানে?'

'অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আমার স্বজন আমি ছাড়া কেউ নেই।'

'এখানে নেই, সেখানে আছে। কারো সঙ্গেই আপনার প্রতারণা করা উচিত নয়।'

চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিলেন ডক্টর রায়, গভীর গলায় বললেন, 'যৌবনে আমি একটি বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম, তাছাড়া আর কোথাও নোঙর গাড়িনি। লোকেরা সব সময় সব কথা সত্য বলে না। অন্তত অঞ্জলির সেকথা বিশ্বাস করা উচিত হয়নি।'

বেয়ারা ট্রে ভর্তি পানীয় এনে নামালো টেবিলের উপরে। সঙ্গে কিছু খুচরো খাবাব। পুরন্দর কফি নিল, ডক্টর রায় তাঁর অভ্যাস মতো হুইস্কিতে সোডা মিশোলেন। তারপর অনেকগুলো নিঃশব্দ মুহূর্ত গড়িয়ে গেল দুজনের মাঝখান দিয়ে।

।।৬।।

অনেক পরে পুরন্দর বললো, 'আপনি যা ভাবছেন তা নাও হতে পারে।'

'আমি কী ভাবছি?' বহুদিনের প্রলেপিত ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে রক্ত ঝরছিলো ডক্টর রায়ের হৃদয়ে, তিনি চেষ্টা করেও অভ্যাসমতো আজ আর তাঁর অতীতকে দূরে ঠেলে রাখতে পারছিলেন না।

'আমি আমার মার বিষয়ে বলছিলাম—'

'কী?'

'বললেন না এ-কথা আমার মার অন্তত বিশ্বাস করা উচিত হয়নি?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি আপনার বিষয়ে কী বিশ্বাস করেন বা করেন না, তা কেউ জানে না। আমিও না। আপনাকে নিয়ে কখনো কোনোদিন একটি বাক্যও তিনি বিনিময় করেন না কারো সঙ্গে।'

'ও।'

'আমি ভেবে পাই না, আমার মায়ের মতো অমন একজন মানুষ সারাজীবন কেন এতো কষ্ট পেলেন। কী তাঁর অপরাধ ছিলো।'

ডক্টর রায় চুপ করে থাকলেন।

'আপনার সাবালক পুত্র হিসেবে আজ সেই কৈফিয়তের দাবিটা কি আমার পক্ষে খুব অসঙ্গত।'

'আমার সাবালক পুত্র?' মন্ত্রমুগ্ধের মতো মুখে-মুখে উচ্চারণ করলেন তিনি।

'শুনেছি আমার মাকে আপনি পছন্দ করে নিজেই বিয়ে করেছিলেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডক্টর রায় বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কী ভেবে পছন্দ করেছিলেন?'

'পছন্দ কি কেউ ভেবে-চিন্তে করে?'

'ঘরে তিনি নির্যাতিত, অবহেলিত। অবস্থায় আপনার সমাজের তুলনায় অনেক নিচের মানুষ। সম্ভবত সেটাকেই আপনি করুণা করেছিলেন।'

'করুণা?' টকটকে চোখে তাকালেন, গম্ভীর গলায় বললেন, 'এ-প্রসঙ্গ থাক।'

'কেন থাকবে?' প্রতিহিংসার সুর বেরলো পুরন্দরের গলায়, 'নিজের অন্ধকার দিকটা দেখতে বিবেকে বাধে বলে?'

'বিবেক? কী জানি।' ডক্টর রায় অন্তঃস্তলে তাকিয়ে খুঁজলেন। ভাবতে চেষ্টা করলেন তারপর তিনি কী করেছিলেন। 'সবচেয়ে আশ্চর্য কী জানেন?' পুরন্দরের কালোপক্ষ্ম বড়ো-বড়ো চোখের

দৃষ্টিতে ছায়া ঘনালো। একটা অক্ষম রোষে ছটফট করে উঠলো বললো, 'যিনি আমাব সমস্ত দুঃখের মূল তাঁর উপর আমার যথোচিত রাগ নেই।'

রাগ! যথোচিত রাগের অভাবে কি ডক্টর রায়ও এই মুহূর্তে অসহায় বোধ করছেন না? কিন্তু একদিন তো সেই রাগে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ করে ফেলেছিলেন, গলা কাটতে গিয়েছিলেন ব্লেড দিয়ে, বেরিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। যাবার আগে তাঁর ভাঙা মোটা পুরুষ গলা চিৎকার করছিল, 'ননা, ন্না, ন্না। এ আমি সহ্য করতে পারবো না, আমি কোনো কথা শুনবো না, আমি চাই না এ-অবস্থায় কেউ আমার বাড়িতে থাকুক।'

'রাগ তো নেই-ই, বরং ছেলেবেলা থেকে একটা অভাববোধ সর্বদা আমাকে আকুল করে রেখেছে।'

'অভাববোধ? কিসের অভাববোধ?'

'আপনার।'

'আমার?'

'আপনার। শুধু আপনার অভাবে আমি কাঙাল হয়ে থেকেছি।'

'কিন্তু আমাকে তো তুমি চিনতে না।'

'কিন্তু জানতাম।'

'কী জানতে?'

'জানতাম আপনি আমার বাবা। প্রতি পদক্ষেপে যার নাম আমাকে ব্যবহার করতে হয়।'

'আমার নাম?'

'উপায় কী বলুন?'

'কেন?'

'পুরুষশাসিত সমাজে মায়ের কি কোনো মূল্য আছে? মায়ের মর্ম কে বোঝে?'

'তুমি প্রতিবাদ করতে পারতে।'

'কী বলতাম?'

'বলতে আমার বাবাকে আমি চিনি না, তিনি আমার কেউ না, আমার মা-ই আমার সব।'

'হ্যাঁ, সেটাই আমার উচিত ছিলো। কিন্তু একটা শিশু যখন ইস্কুলে ভর্তি হতে যায়, তখন কি সে এই তর্ক তুলতে পারে?'

'তার মা পারে।'

'মা?' নিশ্বাস নিলো পুরন্দর, 'স্বামীকে অস্বীকার করবেন এমন শক্তি তিনি আজো সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি। আপনার বিষয়ে তাঁর দুর্বলতা তর্কের অতীত। আপনি জানেন কী-ভাবে আমার শৈশব কেটেছে। কী ভীষণ অন্ধকারে সাঁতার কেটে-কেটে আমি বড়ো হয়েছি। আপনার উপর জেদ, রাগ, অভিমান, ভালোবাসার প্রাবল্য, প্রেম, সবটা মিলিয়ে মার মনে এমন অদ্ভুত এক নিঃশব্দ জগৎ তৈরি হয়েছে যে সেখানে তাঁর সন্তানেরও প্রবেশ-পথ বন্ধ।

'তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা অনমনীয়, সহ্য করবার ক্ষমতা তুলনাহীন, নিজের ব্যর্থতাকে সাংঘাতিক আত্মনির্যাতনের চাবুক মেরে-মেরে তিনি সজীব রেখেছেন, তাঁর প্রতিশোধের এই আশ্চর্য কৌশল দেখলে আপনি তাজ্জব হয়ে যাবেন। কিন্তু আমার উপর তাঁর প্রতিক্রিয়া কখনোই সুখের হয়নি। নিজের দুঃখ নিয়ে তাঁর সেই নিথর নিশ্চল দম-আটকানো চুপ করে থাকার অসম্ভব ক্ষমতা আমাকে সব সময়েই এক ভয়ংকর যন্ত্রণায় দগ্ধ করেছে। অনেকদিন পর্যন্ত আমি জানতাম না, তিনি সধবা না কুমারী। এ-ও জানতাম না আমি তাঁর গর্ভজাত সন্তান অথবা পালিত পুত্র।'

ডক্টর রায় বুকের ভিতর থেকে আওয়াজ বার করলেন, 'তাহলে আমার নাম তুমি জানলে কী করে?'

অপ্রয়োজন-বোধে পুরন্দর সে-কথার জবাব দিল না, সনিশ্বাসে বললো, 'আপনি তো শুধু তাঁকেই ভাসিয়ে দেননি, আপনার নিজের সন্তানকেও কষ্টের চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছেন। এ-কথা তো আপনার অজানা ছিল না যে স্বামী-পরিত্যক্তা অবস্থায় বিমাতার সংসারে মরে গেলেও তিনি আশ্রয়ের জন্য যাবেন না, আর এ-কথাও অবিসংবাদিত সত্য যে স্বামী বর্তমানে কোনো হিন্দু মেয়ের দ্বিতীয় বিবাহ কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। বিশেষত আমি তখন তাঁর পেটে। তাছাড়া আপনার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং ভালোবাসা প্রচণ্ডভাবে অন্ধ। তাঁকে গৃহহীন করতে আপনার অন্তরে কি এতোটুকুও কম্পন উঠলো না? একটা মনুষ্যত্ব বলেও তো কথা আছে? আমি শুনেছি আপনি *তখন কোনো শ্বেতাঙ্গিনীর প্রণয়ে—'*

অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর রায়, দাঁতে দাঁতে চেপে কী বলতে গিয়েও কঠিন সংযমে শান্ত করলেন নিজেকে। স্থিরগলায় বললেন, 'না, তোমার মাকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের প্রতি আমার কখনো কোনো দুর্বলতা ছিল না, এখনো নেই। সবই ভাগ্য!'

'ভাগ্য!' বিদ্রোহীর ভঙ্গি করলো পুরন্দর, 'আমি বিশ্বাস করি না ভাগ্য বলে কোনো কথা আছে। সবই আমাদের কৃতকর্ম। মনকে চোখ ঠার দেবার জন্যই আমরা সব সময় ভাগ্যের দোহাই দিয়ে থাকি। আমার মা-ও তাই করেন। আমি রেগে যাই। আমি তাঁর হাতের লোহা কতদিন টান মেরে খুলে দিয়েছি, কতোবার বলেছি, কী জন্য তুমি একজন অবিবেচক নিষ্ঠুর মানুষকে মনের মধ্যে জীইয়ে রাখতে একটা লোহার বালা পরে কয়েদি হয়ে আছ? মা শোনেন না, আপনার বিষয়ে কোনো বিপরীত কথা বললে তাঁর মুখে রক্ত উঠে আসে, অত শান্ত সংযত মানুষও যে কী পরিমাণ উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তার পরই বলেন, কারো কোনো দোষ নেই, সবই আমার ভাগ্য! আমি আপনাকে কী বলবো, এই যে আপনার প্রতি আমার এই এক অহেতুক আকর্ষণ, মনে হয় তাও আমার মায়েরই নিঃশব্দ প্রভাব। এ আমার মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া সংক্রমিত রোগ। কিন্তু আপনি একটা কী! আপনি একটা কী!'

বলতে-বলতে বহুকালের সঞ্চিত অভিমান থেকে এক বিক্ষুব্ধ বিকৃত আওয়াজ বেরিয়ে এলো পুরন্দরের গলা থেকে। উৎসারিত ঘৃণার সঙ্গে বললো, 'বাংলাদেশের সুযোগ্য সন্তান আপনি, জন্মেছিলেন রুপোর চামচে মুখে নিয়ে, পৈতৃক প্রাসাদে বসে বিবাহের দ্বারা স্ত্রীর উপর শুধু বাসনাই চরিতার্থ করেছেন, আর কিছু নয়। তারপরেই মানুষটা ফুরিয়ে গেছে, পুরনো হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছেন আপনার তথাকথিত উচ্চসমাজে এবং আপনার বিলাসী জীবনে, সেই দুঃখিনী মেয়েটি

কোনোদিক থেকেই সমকক্ষ নন, তাই—'

'শাট আপ্।' এতোক্ষণের সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে সহসা চেঁচিয়ে উঠলেন ডক্টর রায়। তাঁর মাথা ফেটে যাচ্ছিলো। তিনি দু'হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে থরথরিয়ে উঠলেন। তারপরেই হাত বাড়িয়ে হাত ধরলেন পুরন্দরের, রুদ্ধস্বর বললেন, 'এসব কথা থাক পুরন্দর, এ-সব কথা থাক। যা অতীত তাকে অতীতের গর্ভেই লুকিয়ে থাকতে দাও। তুমি আমার বন্ধু হয়ে কথা বলো, সমকক্ষ হয়ে কথা বলো, তোমার পিতৃসম্বোধন আজ আমার হৃদয়কে বড়ো বিচলিত করেছে, আমি তোমাকে হারাতে চাই না।'

পুরন্দর দীর্ঘশ্বাস ফেললো, হাসলো ঠোঁটের কোণে, বললো, 'হ্যাঁ, আপনার পক্ষে যা অতীত, তা নিশ্চয়ই অতীত, নিশ্চয়ই গত, কিন্তু আমি কী করবো? আমি কেমন করে চুপ করে থাকবো? আমার পক্ষে তো তা নয়। আমার উত্তেজনা আপনি মার্জনা করুন, হয়তো আপনার সঙ্গে আজ আমার যেমন প্রথম দেখা, তেমনি শেষ দেখাও। আমি কিছুতেই না বলে পারছি না, নিজের পিতার মুখোমুখি বসে বন্ধুর ভঙ্গিতে একটু আধটু গল্পগুজব করে, ভালো বাসনে ভালো খেয়ে, ভালো বাড়ির আরাম শুঁকে নিয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে ফিরে যাবো, এর তুল্য অপমান আর আমি কিছুই ভাবতে পারি না। বরং যে-অতীত অনেকদিন আমি ভুলে ছিলাম, সে-অতীত আজ এই মুহূর্তে আমাকে নতুন করে বেদনার স্রোতে ভাসিয়ে নিচ্ছে। আপনার বাড়ি ঘর মান সম্মান সম্পদ— সমস্ত কিছুর দিকে তাকিয়ে আমার মার জন্য আমার বুক নতুন করে শেলবিদ্ধ হচ্ছে। আপনি কি জানেন, আপনার স্ত্রীকে কীভাবে জীবিকা অর্জন করতে হয়েছে? কীভাবে মানুষ করতে হয়েছে একটা শিশুকে ? কী না করেছেন? ঘরে-ঘরে বাচ্চা পড়িয়ে তাদের অভিভাবকদের হাজারো বায়না মিটিয়ে, ফরমাস খেটে, টিফিনের ছুটিতে ইস্কুলের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কাছে ঘরে তৈরি খাবার বিক্রি করে, কতো অসম্মান অপমানের কাঁটায় রক্তাক্ত হতে হতে কী ভীষণ হাড়ভাঙা পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে কেটেছে তাঁর দিন আর রাত ! একটা গুদোম-ঘরের ঠাণ্ডায় আমাকে তপ্ত রাখতে লেপ কম্বল কাঁথা সব-কিছু দিয়ে ঢেকে নিজে মরে গেছেন শীতে। সেখানে আলো ছিল না, জল ছিল না, একটা বাথরুম পর্যন্ত না। ভোর হতেই আলোর জন্য আমাকে একটা কাঠের বাক্সে বসিয়ে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে আসতেন বাইরে, আমি রোদ খেতাম, আর তিনি চোখের মাথা খেয়ে অন্ধকারে বসে বসে আমার রান্না রাঁধতেন, টিফিনে বিক্রির খাবার তৈরি করতেন, বাসন মাজতেন, বিছানা ঝাড়তেন, ঘর ঝাঁট দিতেন, শিশুর পরিচর্যার সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন। এই করে করেই আমাকে সুখ দিয়েছেন, স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন, শিখিয়েছেন পড়িয়েছেন, নিজেও বি এ পাস করে টিলে তার উঁচুতে বেঁধেছেন।'

॥৭॥

পুরন্দরের হাত ধরে একই ভঙ্গিতে বসে ছিলেন ডক্টর রায়, অঞ্জলির দুঃখ তাঁর কাছে অভিন্ন ছিলো না, তাঁর বুকের শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে নিজের দুঃখের সমুদ্রও উথলে উঠছিলো।

আর কেউ না জানুক তিনি তো জানেন, সমস্ত জীবন ভরে ওই একটি মেয়েকেই ভালোবেসে এসেছেন তিনি, আর তার বিচ্ছেদ তাঁকে আজ পর্যন্তও কোন অতলে তলিয়ে রেখেছে। সারাটা রাত পথে পার্কে মাঠে ময়দানে ঘুরে, পুলিশের তাড়া খেয়ে, শরতের হিমে ঠাণ্ডা লাগিয়ে যখন একটা ঝড়ে বিধ্বস্ত গাছের মতো ফিরে এসেছিলেন সকালবেলা, তখন তাঁর মন যুক্তিতর্কের অধীন ছিলো, তিনি ভেবে দেখেছিলেন শুধু পৌরুষের অহংকারই সব নয়, কিছু শিক্ষা-সংস্কৃতির অহংকারও তাঁর থাকা উচিত ছিলো।

সত্যি, পুরুষ পুরুষই। যতো আধুনিকই হোক, যতো শিক্ষিত মার্জিতই হোক, তার অধিকারবোধের উগ্রতা জন্তুর মতো। অথচ কোনো কারণ নেই। সমাজব্যবস্থার অন্যায় সুযোগ ছাড়া একে আর কী বলা যেতে পারে?

প্রথম যৌবনে একবার তিনিও বেশ্যাবাড়ি গিয়েছিলেন, এবং সেটা স্বেচ্ছায়। বিলেতবাসের ষোলো মাসে তাঁর নারীসংসর্গও ঘটেছিলো। ঘটেছিলো বলাই উচিত। তার কারণ, বাড়িউলির সদ্যযুবতী মেয়েটি বড়ো গায়ে-পড়া ছিলো। যখন-তখন এসে টোকা দিত দরজায়, যেমন-তেমন বেশে এসে হাজির হতো। নির্জন ঘরে পায়ের উপর পা তুলে বসে সিগারেট খেতে-খেতে বলতো, 'দোষ কী? এ হচ্ছে ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো একটা স্বাভাবিক বৃত্তি। ঈশ্বরের অভিপ্রেত ব্যাপার। তুমি এতো পিউরিটান কেন?'

মেয়েটি সুন্দরী ছিলো, স্বভাবটিও ভারি উচ্ছল। যে-ছেলেটির সঙ্গে তার ভালোবাসা ছিলো, দু বছর মেলামেশা করার পরে সে অন্য একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে। বস্তুত সেই বিরহ অথবা বিরক্তির সময়টাতেই তিনি গিয়ে ওদের ঘরে ভাড়াটে হয়েছিলেন। পাশাপাশি ঘর, ঘরটি মন্দ ছিলো না, সাজানো গুছোনোও ছিলো বেশ কিন্তু একই বাথরুম, একই সিঁড়ি আর একই রান্নাঘর। মেয়েটি তাঁকে অনেকদিন রান্না করে দিত, প্রায়ই ঘর ঝেড়ে মুছে ফিটফাট করে রাখতো, কাপড় জামা গুছিয়ে দিত ক্লসেটে। অলস বাঙালি ছেলে হয়ে তিনি নির্বিবাদে সেই সাহায্য গ্রহণ করতেন এই করতে-করতেই সাহস বেড়ে গেল ওর, সময়ে-অসময়ে ঘরে আসবার ছাড়পত্র পেয়ে গেল।

একটা পার্টি ছিলো একদিন, ভারতীয় বন্ধুরাই তার উদ্যোক্তা ছিলো, খুব খাওয়া-দাওয়া হলো, মদ্যপানও কম হলো না। যখন ঘরে ফিরলেন, রাত হয়েছে অনেক। তার উপর টিপটিপ বৃষ্টি পড়ে জমে যাচ্ছিলেন ঠাণ্ডায়। কোট, ওভারকোট, ওভারশু, দস্তানা, সমস্ত ভেদ করে শীতের সৈন্যরা তলোয়ারের খোঁচা মারছিলো দেহে, বেশি পান করে অনভ্যস্ত পাও খুব সঠিক ছিলো না। এই অবস্থায় যখন দরজার ফুটোয় চাবি লাগাতে গলদঘর্ম হচ্ছিলেন খুট করে পাশের ঘর থেকে এলো মেয়েটি, হাসতে-হাসতে বললো, 'যা অবস্থা দেখছি, সারারাতেও তালার ফুটো তুমি খুঁজে পাবে না, সরো, আমি খুলে দিচ্ছি।'

মেয়েটির গায়ে টুকটুকে রংয়ের আলখাল্লার মতো পা পর্যন্ত একটা ড্রেসিং গাউন ছিলো, চুলগুলো সোনার সুতোর মতো ছড়িয়ে ছিলো পিঠে, কোনো নাম-না-জানা সুগন্ধ ঘিরে ছিলো তাকে, সে তাঁর গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে ঈষৎ নিচু হয়ে খুলে দিল লক, নিচু হবার দরুন, লবির উজ্জ্বল আলোয় ঢিলে ড্রেসিং গাউনের তলায় তার ফুটফুটে শাদা শরীর দেখা যাচ্ছিলো স্পষ্ট। তিনি তাকিয়ে ছিলেন। মেয়েটি আলতোভাবে বাঁ হাতে পিঠ ছুঁয়ে ঘরে নিয়ে এলো, বললো, আজ আমার এক বন্ধু আমাকে খুব ভালো এক বোতল ফরাসি ওয়াইন দিয়ে গেছে, খাবে নাকি? যা দেখছি, শীতে তো জমে গেছ, পয়সা ফ্যালো, আগুন করি, আর ওয়াইন নিয়ে আসি, গরম হও।'

নেশার দস্তুরই তাই, খেলেই খাবার ইচ্ছে দুর্নিবার হয়ে ওঠে। মাথা ঝোঁকে বললেন, 'না, না, ওসব ওয়াইন-ফোয়াইনে হবে না, জিন থাকে তো নিয়েসো।'

'অলরাইট।' ঢিমে আগুনে কাঠ গুঁজে জিন নিয়ে এলো সে। খানিক বাদে বললো, 'গা গরম করে দেবো নাকি? একা বিছানায় আমার ঘুম আসছে না, পাশ ফিরলেই বরফ।'

'হ্যাঁ দাও।' নেশা তখন তাঁর মাথায় চড়ে গিয়েছে, তিনি নিজেই ওর গাউনটা খুলে দিলেন। সুগঠিত শাদা পুতুলটিকে নিয়ে চলে এলেন বিছানায়।

অবশ্য ঐ একদিনই। অঞ্জলির কথা ভেবে পরের দিন তাঁর মন-খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। তারপর চেষ্টাচরিত্র করে সাতদিনের মধ্যে বাড়ি বদলে ফেললেন। কেননা তিনি বুঝেছিলেন, মেয়েটির ভাষায় এই ক্ষুধা প্রকৃতই একটি স্বাভাবিক বৃত্তি, এবং হাতের কাছে খাদ্য থাকলে তিনি অবশ্যই প্রলুব্ধ হবেন। এবং মেয়েটি যে-রকম বেপরোয়া, একটা বিপদে ফেলতেই বা বাধা কী?

এর পরে ধুলোর মতো ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, সেই ময়লা, (যদি তাকে ময়লা বলা যায়)— ভুলেও গিয়েছিলেন। মনে পড়লো হঠাৎ। মাঠে বাটে রাত কাটিয়ে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে মনে পড়লো। আর সেই সময়েই তিনি স্থির করলেন, ভালো করে কথা বলবেন অঞ্জলির সঙ্গে, কী সে বলতে চায়, শুনবেন।

ভোরের গন্ধ মেখে বাড়িটা একা-একা দাঁড়িয়েছিলো, দরজায় দুধের বোতল বসানো ছিলো, বারান্দায় খবরের কাগজ পড়ে ছিলো। সবই রোজের মতো। তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত বিব্রত বিধ্বস্ত দেহে-মনে আস্তে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছিলেন, বসার ঘরের সোফার উপর বসে ছিলেন হাতের ভারে মাথা রেখে। অনেক পরে ভাঙা-ভাঙা গলায় ডেকেছিলেন, 'অঞ্জলি।'

কেউ জবাব দেয়নি। তিনি আবার ডেকেছিলেন, আবার ডেকেছিলেন, আবার ডেকেছিলেন, তারপর চেঁচিয়ে প্রতিধ্বনি শুনেছিলেন।

অঞ্জলির অনলস নিপুণ হাতের সাজানো-গুছোনো ঘরগুলো হা-হা করছিলো। তার পরিত্যক্ত সমস্ত জিনিসগুলো একটা হৃদয়বিদারক ঠাট্টার মতো তাকিয়ে ছিলো তাঁর দিকে। তিনি শাড়ি জামা জুতো প্রসাধন সব-কিছু ছুঁয়ে-ছুয়ে দেখছিলেন। তারপর ভয় পেয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি কোথায়? কোথায় গেলে? কোথায় গেলে?'

দিল্লি শহরে খুঁজতে বাকি রাখেননি কোথাও। তারপর চলে গেলেন কলকাতায়। কলকাতাতেও ছিলো না অঞ্জলি। তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে সবাই বলেছিলো, 'ব্যাপার কী?'

ব্যাপার যে কী, তা-ই বা তিনি এদের কেমন করে বোঝাবেন? পাগলের মতো আবার ফিরে গিয়েছিলেন দিল্লি। বম্বেতেও চলে এসেছিলেন। ওর মামা-মামী ছিলেন, মনে হয়েছিলো সেখানেও পাওয়া যেতে পারে।

মামা-মামী অনেক কথা বললেন, তার মধ্যে প্রধান তাঁদের ভাবী পুত্রবধূর কথা, বিলেত যাবার আগে সে যে দু'সপ্তাহ থেকে গেছে তাঁদের সঙ্গে, সে যে কতো ভালো, কতো মিষ্টি সে সব শুনতে শুনতে ঝিম ধরে গেল তাঁর। এবং সেখানেই প্রথম শুনলেন, সীতেশ খুব ভালো একটা চাকরি পেয়েছে লন্ডনে, চার বছরের চুক্তিতে, আর সেজন্যই সে তার ভাবী বধূকে নিয়ে যাচ্ছে, অথবা এঁরাই গরজ করে পাঠাচ্ছিলেন।

বললেন, 'চার বছর তো সোজা সময় নয়, একা-একা থাকবে কী করে?'

তিনি বলেছিলেন, 'আপনাদেরও কষ্ট হবে খুব।'

ওঁরা বললেন, 'জীবন তো এখন ওদেরই, ভবিষ্যতের লম্বা রাস্তা এখন ওদেরই সামনে। যা ওদের ভালো, আমাদেরও তাই ভালো।'

তিনি সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, 'তা তো বটেই, আর চার বছর সময় এমনিই বা কী?'

সীতেশের বাবা বললেন, 'মাইনে খুবই বেশি, খুবই ভালো কাজ, চার বছরে সমস্ত অভাব অনটনের আসান করে ফিরতে পারবে বলে মনে হচ্ছে। আমরা তো খুব বৃদ্ধ নই, নিশ্চয়ই চার বছর টিকে থাকতে পারবো।'

তিনি বলেছিলেন 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

সীতেশের মা যত্ন করে আদর করে খাওয়াতে-খাওয়াতে বললেন, 'অমি জানি, তোমার চেয়ে বড়ো বন্ধু কেউ নেই সীতেশের, আর এখন তো আমাদের জামাই, আমাদের পরম স্নেহের ধন। কতো যে ভালো লাগছে তোমাকে দেখে। কেবলই মনে হচ্ছে, যদি অঞ্জলিকে নিয়ে আসতে, এই আনন্দ আজ সম্পূর্ণ হতে পারতো।'

অঞ্জলিকে যে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সে-কথা কেমন করে বলবেন? মাথা নিচু করে জবাব দিয়েছিলেন 'আবার আসবো একসঙ্গে।'

জানতেন আর তা কখনোই সম্ভব হবে না, তবু বলেছিলেন। কিছু বলতে হবে বলেই শুধু নয়, বলতে তাঁর ভালো লেগেছিলো। দোষ-গুণ ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ সব কিছুর বিনিময়েই তখন তাঁর মন অঞ্জলিকে ফিরে পাওয়ার জন্য শিশুর মতো কাঁদছিলো।

যুগপৎ সেই হাহাকারের বেদনা এবং লজ্জা শেষে তাঁকে একদিন দেশান্তরী করলো। তাঁর মনে হলো এখান থেকে, এই পরিচিত দেশ পরিবেশ থেকে পালাতে পারলে তিনি বাঁচেন।

বয়স্ক নির্বান্ধব বাবার জন্য কষ্ট হচ্ছিলো তাঁর। বিদেশে যাবার সময় দেখা করে যাননি, অঞ্জলির চলে যাবার ব্যাপারটা তখনো কিছু জানতেন না তিনি, এবং পাছে জেনে ফ্যালেন সেই ভয়েই লুকিয়ে পালিয়ে বিদায় না নিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

গিয়ে অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে কাছে নিয়ে যেতে, তিনি যাননি। এই ছেলেটির মতো তিনিও লোকপরম্পরায় শুনেছিলেন, 'পত্নীকে ত্যাগ করে তিনি 'বিদেশী পেত্নী'র কণ্ঠলগ্ন হয়েছেন। বাবা এই ভাষাতেই চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে। আর তার অনতিকাল পরেই খবর গিয়েছিলো হার্ট অ্যাটাকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

'জন্মেছিলাম দার্জিলিং শহরের এক নেপালি বস্তিতে।'

পুরন্দরের গাঢ় গলা আবার আঘাত করলো তাঁর স্নায়ুতে, 'সেই বস্তিবাসীরাই ছিলো আমাদের স্বজন, দশ বছর বয়সে আমাকে উচ্চশিক্ষা দিতে কলকাতায় নিয়ে এলেন মা। নিয়ে এলেন না বলে অকূলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন বলাই উচিত। কিন্তু তিনি জানতেন না হাওড়ার বস্তি আর কাকঝোরার নেপালি বস্তির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। শস্তা ভাড়ার জন্যে সেখানেই একটি ঘর নিয়ে একটি রাতও তিনি দুই চোখের পাতা এক করতে পারেননি। আমার মায়ের তখন কতো বয়েস বলুন? আশে-পাশে হাঙর কুমিরে থিকথিক করতো রাত হলে। দশ বছরের বালক আমি, আমিও ভয়ে কাঁপতাম, আমিও বুঝতে পারতাম এমন একটা কিছু হতে যাচ্ছে যার মতো ভয়ংকর আর কিছুই ঘটতে পারে না একজন মেয়ের জীবনে। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে যেখানে এলাম, সেই ভদ্র পাড়ায় একখানা ভদ্র রকমের ঘরে থাকার জন্য মাশুল গুনতে মাকে যে অন্তহীন কাজের চাকায় ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে যেতে হয়েছে আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'পুরন্দর,' অস্থিরভাবে উঠে রেলিংয়ের ধারে গিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন ডক্টর রায়, ভেজা-ভেজা গলায় বললেন, 'আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, এখন তিনি কোথায়?'

'আমাকে জাহাজে তুলে দিয়ে যেতে আমার সঙ্গে এসেছেন।'

'পান্থনিবাসেই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কি জানেন, তুমি এখানে এসেছ?'

'না, তিনি কল্পনাও করতে পারছেন না আমি কোথায় এসে কার সঙ্গে মুখোমুখি বসে আছি।'

‘কী বলেছ তাঁকে?’

‘বলেছি বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে।’

‘ভালোই বলেছ, এখন তো আমরা বন্ধুই, কী বলো?’

একটু হাসলো পুরন্দর, ‘কল্পনায় কিন্তু আমার বাবা এ-রকমই বন্ধু ছিলো আমার।’

ডক্টর রায় হাসলেন, ‘আমরা কল্পনায়ও এ-রকম ছেলেই আমার আকাঙ্ক্ষিত ছিলো। তোমাকে দেখে আমার নিজের এই বয়েসটা মনে পড়ে যাচ্ছে। তোমার একজন মামার সঙ্গে তখন আমি একাত্ম ছিলাম।’

‘আমার মামা?’

‘তোমার মায়েরও সে একমাত্র বন্ধু ছিলো।’

‘কী নাম?’

‘সীতেশ, সীতেশ মজুমদার। ঈশ! কী ভাবে মারা গেল!’

‘সীতেশ! হ্যাঁ আমি শুনেছি তাঁর কথা। তিনিও তো ইংলন্ডে ছিলেন।’

‘পাঁচ বছর বাদে ফিরে এসে, নিজের মা-বাবার সঙ্গে মিলিত হয়ে সে যথার্থই সুখী হয়েছিলো। আমি সেই সময়ে বিদেশে। তোমার মাকে সে অত্যন্ত ভালোবাসতো। আমাদের এই বিচ্ছেদে সে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলো এবং একমাত্র তার কাছেই আমি আমাকে সম্পূর্ণভাবে উদঘাটিত করতে পেরেছিলাম। বম্বে থেকে স্ত্রীকে নিয়ে সে কলকাতা যাচ্ছিলো, প্রধান উদ্দেশ্য তার বোনকে খুঁজে বার করা, অবশ্য চাকরির ব্যাপারও ছিলো। কিন্তু গিয়ে আর পৌঁছতে পারেনি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি, আর সেই খবর শুনে বম্বেতে তার মা শোক সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিলেন। নিঃসঙ্গ রুগ্‌ণ পঙ্গু বাবা শেষে মারা গেলেন হাসপাতালে।’ আমি ফিরে এসে ওদের বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলুম, শুনলুম সেই বাড়িটা দিদি দান করে দিয়েছেন অনাথ শিশুদের জন্য।’

‘ওঁর দিদি ছিলেন একজন?’

‘এখনও আছেন, নিশ্চয়ই, ঠিক কোথায় আমি জানি না। আচ্ছা, তুমি একটু বসবে? আমি আসছি।’

ডক্টর রায় পর্দা সরিয়ে শোবার ঘরে এলেন। বিছানার পাশে টেলিফোনটার দিকে তাকালেন। তারপর গাইডটা হাতে নিয়ে পাতা উল্টোতে লাগলেন। নিচু হয়ে রিসিভারটা কানে তুললেন, কিন্তু একটা জায়গায় এসে তাঁর পৃষ্টা উল্টোনো বন্ধ হলো, নির্দিষ্ট নম্বরটা বোধহয় পেলেন তিনি। ডায়েল করতে তাঁর আঙুল কাঁপছিলো, ছাপ্পান্ন বছরের শান্ত হয়ে আসা নিস্তেজ হৃৎপিণ্ডটা এতো জোরে লাফাচ্ছিলো যে মনে হলো ফেটে যাবে।’

॥ ৮ ॥

একটা বই পড়তে-পড়তে পান্থনিবাস হোটেলের একলা ঘরে অঞ্জলি দেবী ছেলের জন্য হঠাৎ ভারি উদ্বেগ অনুভব করলেন। হাতের মণিবন্ধে ঘড়ি দেখলেন, দশটা দশ। কী কাণ্ড! এত দেরি হবার কথা নয়। বলছিল, এক বন্ধুর খোঁজ পেয়ে দুপুরে তাকে ফোন করেছিল, রাত্রি আটটায় সে যেতে বলেছে, খেতেও বলেছে।

তিনি বলেছিলেন, 'বম্বে তোর অজানা অচেনা শহর, রাতবিরেতে খেয়ে আসতে-আসতে দেরি হয়ে যাবে না?'

পুরন্দর বলল, 'বন্ধু মস্ত লোক, সাহেব মানুষ, ইংরিজি মতে ডিনার খায়, টেবিলে সাড়ে-আটটায় হাজিরা না নিলে সুট্য বুট টাই তো সবই বৃথা।'

'অত স্যুট বুট টাইওলা বন্ধু তোর কে?'

হাসতে-হাসতে পুরন্দর বলল, 'আছে, আছে, সবাইকেই কি তুমি চেনো নাকি?'

'পরশু সকালে জাহাজ, এখন তোর খুব নিয়ম-মতো থাকা দরকার।'

'ভেবো না, আমি দেখা করেই চলে আসবো, খাবো না।'

'বললি যে খেতে বলেছে।'

'বড়োলোক মানুষ, কারো সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেই ওরা খেতে বলে। ওটা কথার কথা। বিলিতি নিয়ম।'

'তবে যাচ্ছিস কেন?'

'দরকার আছে।'

তবু তিনি বললেন 'সারাদিন তো ঘোরা-ঘুরি পরিশ্রম, কাল আবার অরিয়েনটেশনের ব্যাপার—'

'সে তুমি ভেবো না।' ঘন চুল টেনে আঁচড়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলো।

কোথায় গেলো? কে ওর স্যুট বুট টাইওলা বন্ধু? আজ সারাক্ষণই যেন কেমন উন্মন, জিজ্ঞেস করলে ভালো করে জবাব দিচ্ছিল না।

বই ভাঁজ করে অঞ্জলি দেবী জানালায় এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। তাঁর কপাল ভালো না, দুঃখের জন্যেই জন্মেছেন তিনি, পুরন্দরই এক ফোঁটা রেখা, কে জানে কখন মুছে যায়।

শিহরিত হয়ে যুক্তকর কপালে ঠেকালেন। ভগবানকে ডাকলেন, 'ঈশ্বর, তুমি ওকে নিরাপদে

রেখো।'

নেপাল ডাক্তারকে মনে পড়লো, তিনি বলতেন, 'সব বিষয়ে এত শক্ত মন তোমার, অথচ ছেলের বিষয়ে এত বিচলিত কেন?'

অস্বীকার করে কী লাভ, সত্যিই তিনি পুরন্দর বিষয়ে বড় বেশি দুর্বল, কিছুই তো পেয়ে ধরে রাখতে পারেননি, ওকেও পারবেন এমন বল তাঁর বুকে কোথায়?

দার্জিলিং থাকতে একবার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছিল পুরন্দরের, নেপাল ডাক্তারই চিকিৎসা করেছিলেন, বলেছিলেন 'এ তুমি কোথায় শুনেছ যে উপোস করলে ভগবান সন্তুষ্ট হন? নিজেকে কষ্ট দিয়ে-দিয়ে তুমি তোমার আত্মাকে বিনষ্ট করছ, অথচ আত্মাই ভগবান।'

সেই সময় পুরো ছত্রিশ ঘণ্টা তিনি জল খেয়েছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল পুরন্দরের জ্বর না-ছাড়লে এই অনশনেই প্রাণত্যাগ করবেন।

ডাক্তার হিসেবে হাতযশ ছিল নেপাল সেনের, নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল, শুধু খ্যাপা ছিলেন একটু। আজ এখানে, কাল সেখানে, উপার্জনের যেন কোনো তাগিদই ছিল না। কলকাতা থেকেও যে সমস্ত পাট তুলে ছেলেদের সঙ্গে বচসা করে চলে এসেছিলেন, তাও তাঁর খ্যাপামিরই ফল। নিজেই গল্প করতেন, 'স্ত্রীর মৃত্যুর পরে আমার আর কিছুই ভালো লাগত না। এই দার্জিলিং শহর আমার স্ত্রীর শৈশবের লীলাভূমি, এই শহরেই তিনি বড়ো হয়েছিলেন, বিয়ে হয়েছিল, মারা গিয়েছিলেন, সেজন্যই এই শহর আমার মন টানলো, আমিও এখানেই মারা যেতে এসেছি। ছেলেদের সঙ্গে তাই নিয়েই মন-কষাকষি। তারা আমায় একা থাকতে দিতে চায় না।'

পুরন্দরকে আপ্রাণ যত্নে নেপাল ডাক্তারই সারিয়ে তুলেছিলেন সেবার। ভালোবাসতেন খুব, কত আদর করতেন। এই ডাক্তারের সাহায্যেই পুরন্দর ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই অঞ্জলি দেবীর।

দার্জিলিং যাবার অল্প দিনের মধ্যেই একদিন পথে দেখা হয়ে গিয়েছিল এঁর সঙ্গে। যেতে-যেতে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'আরে, দ্বিজেনবাবুর মেয়ে না? তোমার নাম অঞ্জলি না?'

তিনি দোকান থেকে খাবার কিনে ফিরছিলেন, পরিচিত লোক দেখে থতমত খেয়ে গেলেন। তাঁর অজ্ঞাতবাস যে এইভাবে ধরা পড়ে যাবে কে জানত? আর এমন মানুষের কাছে, যিনি তাঁদের নাড়িনক্ষত্র জানেন, বাড়ির উল্টো দিকে যাঁর ডাক্তারখানা, অসুখে-বিসুখে সব সময়েই যাঁর গতিবিধি। তাঁর সেই অসুখের সময়ও তো এই ডাক্তারই চিকিৎসা করেছিলেন।

'তুমি এখানে কোথায়?'

'একটা স্কুলে পড়াই, কাকঝোরাতে থাকি।' অঞ্জলি দেবী ঢোঁক গিললেন।

'তোমার স্বামী এখানে? কী আশ্চর্য। আর আমি জানি না? লোকের মুখে-মুখে কত গল্প শুনলাম বিয়ের।'

অঞ্জলি দেবী এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি এবার যাই কাকাবাবু, ইস্কুল আছে।'

'আমিও তো কাকঝোরা যাচ্ছি, আমার রোগী আছে সেখানে। চলো, আলাপ করে আসি জামাইয়ের সঙ্গে। বিয়েতে তো ছিলুম না, জামাই আমার দেখা হয়নি। তার বাপ হল ডাক্তার

কুলের মুকুটমণি, আর জামাইও তো দারুণ উপযুক্ত ছেলে—' আপন মনেই কথা বলে যাচ্ছিলেন। অঞ্জলি চুপ করে থেকে বললো, 'আমার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।'

'কী!'

'আপনি চলুন, আমার ঘর দেখে আসবেন, আমি একাই আছি।'

একথা শুনে এত দমে গেলেন যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হল না। চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন ধীরে-ধীরে। পরে নিশ্বাস নিয়ে বললেন, 'ভালো মানুষের ভালো কপাল সহ্য হয় না।'

মানুষটি সত্যি বড়ো হৃদয়বান ছিলেন। সত্যিই উঁচু দরের। দার্জিলিং ত্যাগ করার সময়ে কিন্তু দেখা হল না, খেয়ালি মানুষ, কোথায় চলে গিয়েছিলেন। মাঝে-মাঝেই এ-রকম যেতেন। সাধুসঙ্গ ধরেছিলেন শেষের দিকে।

কিন্তু পুরন্দর আসছে না কেন? ভারি অন্যায়। এ-ভাবে বিদেশে বিভুঁয়ে—

যদি সেই সময়ে নেপাল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা না হতো সারাটা জীবন এক ভুলের বোঝা বয়ে বয়ে কেটে যেতো দিন। কী ভয়ংকর!

কী ভয়ংকর হতো সেই বোঝা।

অথচ সেই ভুলের জন্যই তো একদিন সব হারাতে হল। ঘর সংসার, সম্মান, প্রতিপত্তি—সব, সব।

কিন্তু না, এ-সব কিছুই তিনি চাননি, তিনি শুধু সুদর্শনকেই চেয়েছিলেন, যার প্রার্থনায় তিনি সততই ঐকান্তিক ছিলেন। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো যার জন্য তাঁর অন্য কোনো দিকে তাকাবার সময় ছিল না।

দোষ দেবেন কাকে? সবই অদৃষ্ট! প্রথম থেকেই তাঁর দুরদৃষ্ট তাঁকে শনি হয়ে তাড়া করেছে, নইলে মা-ই বা অকালে মারা যাবে কেন? এবং এ-কথা আজ তিনি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেন, ছেলেরা কখনো নিঃস্বার্থ হয়ে ভালোবাসতে জানে না। হয়তো বা ভালোবাসতেই জানে না। নিজেকে ছাড়া কারো কথাই তারা ভাবে না। ভাবতে শেখেনি। মেয়েদের মতো সেই সহজাত সূক্ষ্ম আত্মত্যাগের বৃত্তি দিয়ে তাদের ধরাধামে পাঠাননি বিধাতা। অথবা চিরদিন মেয়েদের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অভ্যাসে ভুলে গেছে সেই ভালোবাসা। মায়ের মৃত্যুর পরে নিজের সুখসন্ধানে তাই বাবার ভালোবাসাতেও ভাটা পড়েছিল।

সুদর্শন, তুমিও নিজেকেই ভালোবাসতে, শুধু সেই ভালোবাসায় ইন্ধন জোগাবার জন্যই তোমার প্রেমিকার প্রয়োজন হয়েছিল, বিবাহ করে স্ত্রীর প্রয়োজন হয়েছিল, যে সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকবে তোমার সুখসুবিধার জন্য, সেবাশুশ্রূষার জন্য, সঙ্গ দেবার জন্য, দৈহিক বাসনা মেটাবার জন্য। সব পুরুষের মতো, তোমার ভালোবাসাতেও কোনো ত্যাগ ছিল না, মার্জনা ছিল না। আর পাঁচজনের মতো তুমিও তেমনিই সংকীর্ণচেতা ছিলে। অথচ একটি মেয়ে ভেবেছিল, ঈশ্বরেরও ছিদ্র আছে, তোমার নেই। মেয়েরা বড়ো মূঢ়, স্বামীকে তারা বড়ো বেশি উঁচু আসনে বসিয়ে ভোগনৈবেদ্য দেয়। শারীরিক বলে বলীয়ান ছাড়া আর কী গুণ আছে তাদের?

অথচ পুরুষ ত্যাগী, পুরুষ কর্মী, পুরুষ মহৎ এই চিৎকারের কোনো বিরাম নেই মনুষ্যসমাজে। কবে কোন এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে কার সঙ্গে যেন বেড়াতে গিয়েছিলেন, দরজায় লেখা দেখেছিলেন, 'স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ।' সন্ন্যাসীটিব জন্য রীতিমতো অনুকম্পা বোধ করেছিলেন তিনি।

এই নিয়ে একদিন তর্কও হয়েছিলো সীতেশদার সঙ্গে। অঞ্জলি দেবী বলেছিলেন, 'যদি কোনো পুরুষ কামিনী ত্যাগ করাটাকেই তার জীবনের মহৎ কর্ম হিসেবে গণ্য করে, তা হলে তার প্রথম শর্ত কি এই হবে না যে স্ত্রী এবং পুরুষ তার চোখে শুধু মানুষ হিসেবেই গণ্য, স্ত্রী পুরুষ হিসেবে নয়? ''স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ'' লিখে কি তিনি এটাই প্রমাণ করেননি যে তখনো তিনি তার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি?

সীতেশদা হেসেছিল, বলেছিল, 'পুরুষের বিরুদ্ধে তোমার আর কী কী যুক্তি আছে শুনি?'

তিনি বলেছিলেন 'যুক্তি কেন? আমার তো কোনো বিরোধিতা নেই? যা মনে হল তাই বললাম। তবে পুরুষের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ নিয়ে এত প্রচারের অর্থটা একটু ভেবে দেখো। যে সত্য কথা বলে তার কি চেঁচিয়ে জানাবার দরকার থাকে কোনো? যার লোভ নেই সে সংসারের মধ্যে বাস করেও লোভহীন। আর যে সচ্চরিত্র সে সহস্র স্ত্রীলোকের সংস্রবেও অবিচলিত।'

'প্রবন্ধ লেখো, প্রবন্ধ লেখো।' সীতেশদা ঠাট্টা করে সেই তর্ক সেখানেই শেষ করে দিয়েছিল। কিন্তু তবু তিনি এ-কথা না-ভেবে পারেননি, মানুষ তো একদিন স্ত্রীলোকের শরীর বেয়েই জগতে এসেছে? প্রথম খাদ্য সবই তো শিশুর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া, প্রথম নিবাসও মায়ের কোল, প্রথম ভালোবাসাও মা। তবে কেন 'নারী নরকের দ্বার' এই গর্জনে পুরুষকুল এমন চীৎকৃত?

সুদর্শন, তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আমি বুঝিনি তুমিও সেই পুরুষ নামক মনুষ্যের ব্যতিক্রম নও। হ্যাঁ, সেটাই আমার ভুল হয়েছিল।

অবশ্য ভুল না-হলেও বা কী হতো? জেনে-শুনে তিনি কেমন করে প্রবঞ্চনা করতেন তাকে? এটা তো ভুলের কথা নয়, বিবেকের কথা, সততার কথা, মনুষ্যত্বের কথা। ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ? ছি।

অঞ্জলি দেবীর চোখ আবার ঘড়ির দিকে গেল, সাড়ে-দশ। কী কাণ্ড! এ কি কলকাতা যে যখনই ফিরুক, জানা আছে সে কোথায় আড্ডা দিতে যায়, কে তার প্রিয় বন্ধু। সাড়ে-দশটা রাত, কিছু রাতও নয় সেখানে। তা বলে এই অচেনা শহর বম্বেতে? এখানে এই তো সে প্রথম এল, পথঘাটও সে চেনে না ভালো করে। তবে সে কোথায় গেল?

ঘরের দরজা খুলে পর্দা সরিয়ে তিনি বাইরে তাকালেন, বাইরে নয়, দু-পাশের সারি-সারি বন্ধ ঘরের মাঝখানে। আলো-জ্বলা লম্বা গলি চলে গেছে সোজা, তারই এ-মাথা ও-মাথা দেখলেন তিনি, তাঁর চিন্তা ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছিল।

এই ছেলে পরশু-দিন জাহাজে ভাসবে। ভাবতেই চোখের কোল বেয়ে জল আসে। এই হচ্ছে

আজকাল। কিছুতেই সামলাতে পারছেন না নিজেকে। তাঁর পঁচিশ বছর আট মাসের ছেলে, যে-ছেলেকে অবলম্বন করে দুঃখের সমুদ্র পার হচ্ছিলেন ধীরে-ধীরে, বুক ফেটে যায় তার জন্য। যেদিন ও জন্মাল, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলেছিলেন, এই আমি তীর দেখতে পেলুম। নেপাল ডাক্তার বলেছিলেন, 'আর ভাবনা নেই, তোমার দুঃখহরণ এসে গেছে।'

প্রসব করিয়ে তিনি হাত ধুচ্ছিলেন তখন, মনবাহাদুরের স্ত্রী তাঁকে সাহায্য করছিল, আর মনবাহাদুর ছুটোছুটি করছিল এটা-ওটা আনতে।

সেদিন ওদের ভূতপুজো ছিল, গাঢ় অমাবস্যার রাত, ব্যথা উঠেছিল সকাল থেকেই। তিনি বুঝতে পারেননি। প্রায় দিন দশেক বাদে কোথা থেকে নেপাল ডাক্তার এসে হাজির। বললেন, 'ভুটান গিয়েছিলুম, এক মস্ত বড়ো সাধু এসেছে সেখানে, একশো তিপ্পান্ন বছর বয়েস।' তারপরই তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কী? শরীর খারাপ নাকি? ব্যথাট্যথা ওঠেনি তো? শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, এদের ভূতপুজোর ভূত বোধ হয় আজই এসে যাচ্ছে। কী কাণ্ড, সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে এলুম হিমালয়ে, তা ভগবান এখানেও গেরো পাকিয়ে রাখলেন। তুমি শুয়ে পড়ো, আমি একটা রুগী দেখার কাজ সেরে আসছি।'

অঞ্জলি দেবী ভয় পেলেন, শুয়ে পড়লেন তাড়াতাড়ি। মনবাহাদুরেব বউ এসে গেল কাজকর্ম সেরে, হেসে বললো, 'বহুৎ আচ্ছা লেড়কা হোবে তোমহার, আজ দেওতার পূজা আছে।'

সেই দেওতার পূজার দেওতা তাঁর এই পুরন্দর।

তখন কিন্তু ব্যথায় কাতব হতে-হতে তিনি সেই দেওতার কথা ভাবছিলেন না. ভাবছিলেন সুদর্শনকে। বিয়ের মাস তিনেক পরে একদিন সে বলেছিল, 'এই শোনো, আমাদের কিন্তু একটু সাবধান হওয়া দরকার।'

না-বুঝে তাকিয়ে থেকে অঞ্জলি বলেছিলেন, 'সাবধান! কিসের সাবধান?'

'নিশ্চয় এক্ষুনি ছেলেমেয়ে চাও না?'

'ওহ্।' তিনি আরক্ত হয়ে স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়েছিলেন, তারপর ভীষণ বোকার মতো একটা প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা, বাচ্চা পেটে এলে মাস গোনে কী করে?'

হো-হো করে হেসে উঠেছিল সুদর্শন। অঞ্জলি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

'খুকু, তোমার বয়েস কত?' সুদর্শন গালে গাল ঘষেছিল।

বয়েস যা-ই হোক, সত্যিই অঞ্জলি সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তাঁর বিমাতার বছর-বছর বাচ্চা হয়েছে বটে— কিন্তু কী করে তিনি মাস গুনে ঠিক রেখেছেন এটা তখন ভাবেননি, যদিও ভাবা উচিত ছিল। এ-কৌতূহল একজন মেয়ে হিসেবে তাঁর সহজাত হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

বোধহয় যে-বয়সে কৌতূহল সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে, সর্বত্রগামী হতে চায়, সেই বয়েসটা দুঃখের ভারে এমন নিপীড়িত ছিল যে দিনগত পাপক্ষয় ছাড়া তাঁর চেষ্টা আর কোনোদিকে ধাবিত হয়নি।

মেয়ে-বন্ধুদের মধ্যেও এমন কেউ ঘনিষ্ঠ ছিল না যার সঙ্গে এই ধরনের কোনো আলোচনার প্রশ্ন ওঠে। তাছাড়া এই শিশু জন্মানো ব্যাপারটার উপরই হয়তো মনের অবচেতনে একটা বিবমিষার সৃষ্টি হয়েছিল। মনোরমার গর্ভে বাবা কী ভাবে বীজ অঙ্কুরিত করছেন, এটা জেনে থেকে অদ্ভুত, অস্বাস্থ্যকর একটা বিতৃষ্ণায় রেখেছিলেন।

তাই হয়তো এই দরজাটা একেবারেই বন্ধ রেখেছিলেন।

যে-কারণেই হোক, তার এই নির্বোধ সারল্য সুদর্শনের কাছে তখন খুবই মধুর মনে হয়েছিল, আদরে প্রেমে ভরে দিয়ে সে ছড়া বানালো 'খুকুরানী মিষ্টিমণি—এ-সব কথা কী? যে শুনবে সে-ই বলবে আস্তো ন্যাকামি।' দুই চোখে সে ভালোবাসার আলো জ্বালিয়ে ধরলো, 'কেমন? ভালো হয়নি পদ্যটা?'

'বাজে।'

'বাজে? তা হলে শোনো, কানের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে সে বীজমন্ত্র দিল। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি শিহরিত হয়ে বললেন 'সত্যি! আজ্ঞে হ্যাঁ, এ-ভাবেই মাস গুনতে হয় বোকা মেয়ে। এর চল্লিশ সপ্তাহের মধ্যে শিশুর জন্ম হয়।' স্ত্রীকে শিক্ষিত করে সগর্বে হাসতে লাগলো সুদর্শন, অঞ্জলি শাদা হয়ে গেলেন। তাঁর মুখে কোনো কথা সরলো না, চেষ্টা করেও স্বামীর আদরে কোনো সাড়া দিতে পারলেন না। ভিতরটা এমন দপদপ করছিল যে মনে হচ্ছিল শুনতে পাচ্ছে সুদর্শন। তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বাথরুমে চলে গেলেন। দুই হাতে মুখ ঢেকে কেঁপে-কেঁপে কাঁদতে লাগলেন।

তাঁর এই অদ্ভুত ব্যবহারে অবাক হয়ে সুদর্শন দরজা ধাক্কাতে-ধাক্কাতে বলল, 'এই কী হলো তোমার? অঞ্জু, শোনো দরজা খোলো। রাগ করলে নাকি? অঞ্জু, অঞ্জু--'

॥ ৯ ॥

আসলে যদ্দিন থেকে তাঁর নারীত্বের উন্মেষ হয়েছে তদ্দিন থেকে একটা অসুখে ভুগছিলেন তিনি সেটা যে আদৌ অসুখ তা অবশ্য অনেক দিন পর্যন্ত বুঝতে পারেননি। বারো বছর বয়সে প্রথম ঋতুমতী হন। ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিলো। মনে করেছিলেন, কী যেন এক সাংঘাতিক ব্যাধিতে ধরলো তাঁকে। বিমাতার সংসারে সেটাকেও একটা প্রচণ্ড অপরাধ বলে মনে হয়েছিলো দুঃখে, লজ্জায়, ত্রাসে কী যে করবেন, কোথায় লুকোবেন, ভেবে-ভেবে তাঁর ঘুম হয়নি।

স্কুলে গিয়ে ক্লাসের মেয়েদের মুখে-মুখে তাকিয়ে এর সমাধান খুঁজেছেন। সকলের চেহারা নির্ভয়, সকলেই হাসিখুশি সুখী। কাকে আর তা হলে জিজ্ঞাসা করা যায়?

তিন-চার দিনের মধ্যেই সেরে গেল তারপর। বাঁচলেন। ভাবলেন, এই যে দিনে রাতে

ভগবানকে ডাকছি, তিনিই শুনতে পেয়ে সারিয়ে দিলেন অসুখটা। কিন্তু আবাব যেন করে শুরু হলো। আবার তিন-চার দিন। তারপর আবার। আবার এবং প্রত্যেকবারই প্রত্যেকবারেব চেয়ে কিছু বেশি। তখন আর তিনি পারলেন না। একটি মেয়েকে ডেকে, টিফিনের সময় লুকিয়ে তেঁতুলতলার নির্জনে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'কল্যাণী, আমার বোধহয় একটা সাংঘাতিক অসুখ করেছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, বারে-বারেই কেমন এমন হচ্ছে।'

'কী হচ্ছে? ক্লাসের মধ্যে কল্যাণীই সবচেয়ে বড়ো মেয়ে। বিপদে-আপদে মেয়েবা কল্যাণীবই শরণাপন্ন হয়। তার বুদ্ধিকে তারা সমীহ করে, জ্ঞানী বলে ভাবে। কল্যাণীও যথাসম্ভব সেই ভাব বজায় রেখে চলে।

মাথা নিচু করে অঞ্জলি তাঁর সমস্যার কথা বললেন। শুনে ঠিকই বিজ্ঞের মতো হাসলো কল্যাণী, পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো, 'ও, এই তোর অসুখ? শোন বোকা, মেয়েরা বড়ো হলে সকলেরই ও-রকম হয়।'

'তোমারও হয়?'

'নিশ্চয়ই। আমার মা বলেছেন, ওরকম না-হলেই অসুখ।'

'তা বলে যখন খুশি তখনই হবে?'

'তা কেন? প্রত্যেক মাসে হবে। তুই দেখিস, তারিখ মনে রেখে দেখিস, সত্যি কি না। আমারও তো প্রথম বারে কী ভয়, কী লজ্জা। মা টের পেয়ে সব বলে দিলেন।' এর পরে সে, তার মা তাকে যা বলেছেন, তা-ও বললো তাঁকে।

আর সবই ঠিক, কিন্তু কল্যাণীর কথামতো অঞ্জলি দেবী কখনোই মাসে-মাসে হননি। নোটবুকে তারিখ লিখে দেখেছেন, ক্যালেন্ডারের পাতায় দাগ কেটে দেখেছেন, সব সময়েই দেড় মাস দু'মাস কেটে যাবার পরে হঠাৎ একদিন অসময়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। বয়েস বাড়তে-বাড়তে অসুখটাও আর বেড়েছে বই কমেনি। ষোলো সতেরো আঠেরো, এ-রকম বয়সে পৌঁছে তিন মাস চাব মাস পর্যন্ত বন্ধ থেকেছে কোনো-কোনো সময়। কিন্তু যখন হয়েছেন, মারাত্মক ভাবে হয়েছেন। একদিন আধদিন শয্যা থেকে ওঠারও ক্ষমতা থাকেনি। আর তা-ই নিয়েই সংসারের কাজ, টিউশনি, কলেজ, সব করতে করতে তাঁর মনে হয়েছে এই বুঝি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, বুঝি এখুনি হার্টফেল করে বা যাবেন।

এই অবস্থায় বলবাব মতো মানুষ একমাত্রই তাঁর বিমাতা মনোরমা। বলতে গিয়েওছেন একবার। কিন্তু তখুনি পিছিয়ে আসতে হয়েছে। কাছে গেলেই কিছু একটা ফরমাশ করেছেন অথবা পুরনো কোনো অভিযোগের জের টেনে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিয়েছেন অথবা এমন কোনো করেছেন যার পরে অনেক চেষ্টায় সঞ্চিত সাহস তাঁর মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়েছে। আর বলবেন কে? সীতেশদাকে তো আর বলা যায় না? বাবাকেও না।

রাস্তার ওপাশে সামান্য একটু হাঁটলেই নেপাল সেনের ডাক্তারখানা। সেখানে ভিতরের ঘরে রোগীও দ্যাখেন তিনি। সকালে-বিকেলে নিয়ম করে আসেন। ঘণ্টা দুই করে বসেন। অঞ্জলি যেতে-আসতে তাকিয়ে দ্যাখে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রাম রাস্তায় যাবার ওইটাই একমাত্র পথ। কতোদিন

তাঁর চলার গতি শ্লথ হয়ে গেছে সেখানে এসে, কতোদিন দাঁড়িয়ে পড়ে ভেবেছেন কারো সাহায্যের দরকার কী? ঐ তো বসে আছেন ডাক্তার, পরিচিত মানুষ, মনোরমার জন্য কতোবার বাবা ডেকে নিয়ে এসেছেন বাড়িতে, নিজেই যাই না, গিয়ে বলি না আমি বড়ো কষ্ট পাচ্ছি, আমাকে একটু দেখুন, একটা ওষুধ দিন, অন্তত এটা তো জানা যাবে রোগটা গুরুতর কিছু কি না। অথবা কোনো রোগই কি না।

এ-সব ভেবে যেতে-যেতে নিজের অজ্ঞাতেই কতোদিন থেমে পড়েছেন সরু রোয়াকটার কাছে, দু'সিঁড়ি উঠে মস্ত খোলা দরজায় চোখে পড়েছে নিবিষ্ট হয়ে কাজ করছেন ডাক্তার, বেঞ্চিতে বসে আছে অপেক্ষমান রোগীরা, তারই মধ্যে তাঁকে লক্ষ্য করেছেন নেপাল সেন, কাঁচা-পাকা মাথাটা নড়ে উঠেছে, সহাস্যে বলেছেন, 'কী? কী খবর? ভালো তো সব?'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ। ভালো আছি, কাকাবাবু।' চমকে উঠেছেন তিনি, তৎক্ষণাৎ তাঁর কুমারী লজ্জা তাঁকে ঘিরে ধরেছে, তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছে অসম্ভব। অন্তত এ-বিষয়ে নিজের চিকিৎসা নিজে করানো যায় না। ডাক্তার তার পরেও আলাপ করেছেন, 'কেমন লাগছে কলেজে?'

'ভালো। খুব ভালো।'

'পাড়ার তো গৌরব তুমি। আমি তো সক্কলকে বলি, ইচ্ছে থাকলেই সব হয়। নইলে দ্বিজেনবাবুর মেয়ে কী করে এতো ভালো ফল করে পরীক্ষায়।'

অঞ্জলি তাড়াতাড়ি বলে উঠেছেন, 'আমি অ্যানাসিন নিতে এসেছি, কাকাবাবু।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে যাও।' নিতাই কম্পাউন্ডারকে হাঁক দিয়েছেন তিনি।

ব্যাগ খুলে পয়সা দিয়ে অ্যানাসিন নিয়ে ফিরে এসেছেন অঞ্জলি।

কিন্তু সে-সব দিনের যন্ত্রণা ছিল অন্যরকম। তার সঙ্গে আজকের জীবনেরও যেমন কোনো মিল নেই, এই মুহূর্তের এই সাংঘাতিক সন্ত্রাসেরও কোনো তুলনা নেই। সুদর্শনের কথা শোনা মাত্র তাঁর বুকটা হিম হয়ে গেল। যতোদূর স্মৃতি যায় ভাবতে চেষ্টা করলেন শেষ তারিখটা ঠিক কবে গেছে। কদ্দিন থেকে বন্ধ হয়েছে এবার? বিয়ের আগে থেকেই? অথবা পরে?

আসলে বিয়ের পরে এমন একটা ঐশ্বরিক আনন্দের স্রোতে ভাসছিলেন যে সেই প্রবাহ তাঁর পার্থিব জীবনের দুঃখবেদনার জগৎটা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। জোরে একটা পতন ঘটলো। একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে তিনি জেগে উঠে চোখ মেলে তাকালেন। এবং অনুভব করলেন শৈশবের নির্যাতন, যৌবনের অশান্তি, মাস্টারমশায়ের অধঃপতন—সব মিলিয়ে এ বয়েস পর্যন্ত যত কষ্ট ভোগ করেছেন, এই কষ্টের তুলনায় তা নগণ্য। কেননা তারিখটি তাঁর মনে পড়েছে। মনে পড়েছে যেদিন থেকে তিনি তাঁর কুমারী সত্তা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তারপর থেকেই তিনি—

কিন্তু সত্যিই কি মাস্টারমশায় সেদিন তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছিলেন? অঞ্জলির প্রবল বাধার কাছে সেদিন কি তিনি এক মুহূর্তের জন্যও জয়ী হতে পেরেছিলেন? তাঁর সমস্ত চেষ্টা কি ব্যর্থ হয়নি? অন্তত অঞ্জলির নিজের তো সেই রকমই ধারণা ছিল।

নিশ্চয়ই ভুল ধারণা। নিশ্চয়ই যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত মন, বিপর্যস্ত শরীর নিশ্চয়ই এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল সেখান থেকে কোনো বোধ আর কর্মক্ষম ছিল না। তাই তিনি বোঝেননি।

অঞ্জলির আরো মনে বড়ল, ঠিক তার আগের দু'মাস খুব নিয়মিতভাবে হয়েছিলেন। খুশি হয়ে ভেবেছিলেন এতকালের রোগ বুঝি এতদিনে ছাড়লো আমাকে। যদি তাও না হতো তবু আশা থাকতো কিছু। কিন্তু এখন? এখন তিনি কী করবেন? কী করা উচিত? নিজের নিরাপত্তার জন্য শেষে কি তিনি সুদর্শনকে ঠকাবেন?

বিয়ের মাস দু'য়েক পরেই ভেবেছিলেন এই অস্বাভাবিক অসুখটার কথা নিশ্চয়ই তিনি বলবেন সুদর্শনকে। কিন্তু তাঁর চাপা এবং লাজুক স্বভাব সর্বদাই তাঁর ইচ্ছেব প্রতিবন্ধক হয়েছে। কিছুতেই বলে উঠতে পারেননি। শেষে এ-কথা ভেবেই চুপ করে ছিলেন যে একদিন তো নিজে থেকেই প্রকাশিত হবে, তখন যা করার সুদর্শন করবেই। কিন্তু তার ফলাফল যে এ-ও হতে পারে সে-কথা তো তাঁর স্বপ্নেও ছিল না।

একটা হৃদয়বিদারক অশান্তিতে দগ্ধ হতে লাগলেন তিনি। তাঁর খাওয়া গেল, ঘুম গেল, সুখশান্তি আনন্দ সব ছেড়ে গেল তাঁকে। তিনি শুধু নিঃশব্দে একটি ভয়ংকর দিনের অপেক্ষায় কম্পমান হয়ে রইলেন। তারই মধ্যে ক্ষীণ আশা, যদি বা বরাববের মতো বন্ধ থেকে থেকে হয়ে পড়েন একদিন।

কিন্তু দিনের পর দিন চলে গেল, সেই প্রত্যাশিত দিন আর এলো না। তিনি একথাও ভেবেছিলেন যদি আমার অভ্যন্তরে কোনো প্রাণের উদগম হয়ে থাকে, আমার শরীর তো সেটা বুঝতে পারবে? এ-বিষয়ে মনোরমাকে স্মরণ করলেন, তাঁর অসুস্থতার কথা ভাবলেন, নিজের সঙ্গে কোথাও মেলাতে না পেরে এক ঝলক আশা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আঁকড়ে রইলো তাঁকে।

অবশেষে সেই সম্বলটুকুও আর অবশিষ্ট রইলো না। তিনি সাত মাসে উত্তীর্ণ হলেন এবং তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন চেঁচিয়ে উঠল সুদর্শন, 'আরে! এ কী ব্যাপাব? কই, আমাকে তো বলোনি? আমি আরো কত কিছু ভাবছি। ভাবছি, কেন এমন বিষণ্ণ, এমন নিরুৎসাহ। তাই বলো, আসলে শরীর খারাপ ছিলো। কী কাণ্ড, কী কাণ্ড। দাঁড়াও এক্ষুনি আমি ডক্টর পাকড়াশিকে কল দিচ্ছি। না, এ ভীষণ অন্যায়। কেন বলোনি?'

তারপরেই একগাল হেসে ঠাট্টা করল, 'হিসেবটা ঠিক রাখতে পেরেছ তো? না কি আবার বলে দিতে হবে?'

সুদর্শন তার আপন আনন্দে বিভোর। যদিও বলেছিল এত তাড়াতাড়ি পিতা হবার সাধ নেই তার কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, খুশি আর ধরছে না।

'ঈশ, কী মজা! কী মিষ্টি একটা বাচ্চা হবে। তোমাকে মা বলবে, আমাকে বাবা বলবে। সে হবে আমাদের; সম্পূর্ণভাবে আমাদের, তোমার আর আমার শিশু।'

শুনতে-শুনতে হঠাৎ একটা চিৎকার করে বুকের দরজাটা খুলে দিতে ইচ্ছে করে অঞ্জলির। এই

মিথ্যা আর তার সহ্য হয় না।

ডাক্তার এসে গেলেন, দেখে-শুনে বলে গেলেন, বাচ্চা বেশ বড়োসড়ো হয়েছে, চমৎকার শোনা যাচ্ছে প্রাণস্পন্দন, মা-ও খুব ভালো আছেন, কোনো চিন্তা নেই।

এর পর আর সুদর্শনকে পায় কে ? কখন যেন দুই বাবাকেই চিঠি লিখে জানিয়ে দিলো শুভ সংবাদটা। তারপর ঠিক করতে বসলো, তার সন্তানের জন্মস্থান কোথায় হবে। কলকাতা অথবা দিল্লি? একবার ভুরু কুঁচকে বলে, কলকাতাতেই যাওয়া উচিত। বাঙালি শিশুর জন্মস্থান বাঙলা ছাড়া অন্য কোথাও হওয়া ঠিক নয়। তারপরেই বলে, দিল্লিতেই হোক। দিল্লি হল রাজধানী। তাছাড়া আমার পক্ষে এখন তোমাকে একদিনের জন্য ছেড়ে থাকাও অসম্ভব। ছুটিও তো নিতে পারছি না। তারপরের চিন্তা, কোন নার্সিংহোমে রাখলে তার স্ত্রী সবচেয়ে বেশি আরামে থাকবে। কোন নার্সিংহোমের দাম সবচেয়ে বেশি। দিনের মধ্যে আশিবার সে দুটো আঙুল তুলে ধরছে চোখের সামনে, নাড়িয়ে-নাড়িয়ে বলছে, 'ধরো দেখি একটা, দেখি আমাদের পুত্র আসছেন না কন্যা আসছেন। তুমি কি চাও? ছেলে? না মেয়ে? আমি মেয়ে চাই।'

সুদর্শনের উৎসাহ-উদ্দীপনা অঞ্জলির বুকে মৃত্যুশেল হানে। তিনি আবার তাঁর হিসেবের অঙ্কে পিছন ফিরে তাকান, আবার তিনি স্পষ্ট দেখতে পান শেষ তারিখটি। ছ'মাসের বিবাহিত মেয়ে নিজের অভ্যন্তরে সাত মাসের শিশুকে অনুভব করে মনে-মনে আর্তনাদ করেন।

শেষে যেন তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেল। আর তিনি পারলেন না। নিষ্ঠুর চোখে রাত্রিযাপন করতে-করতে একদিন বিবেকের তাড়নায় সোজা হয়ে উঠে বসলেন, স্বামীকে ঠেলা দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'একটা কথা।'

হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে সুদর্শন বালিশে মাথা ঘষলো, জড়ানো গলায় বলল, 'পরে শুনবো, এখন এসো ঘুমুই।'

'না, শোনো।'

'এতো জরুরি?'

'খুব। খুব।'

চোখ খুলে তাকালো সুদর্শন। বেড-সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়েছেন অঞ্জলি।

'কী ব্যাপার? এ কী, এ-রকম দেখাচ্ছে কেন তোমাকে ? কী হলো? শরীর খারাপ লাগছে?'

'না।'

'তবে?'

'কিন্তু আমার কোনো হাত ছিলো না সুদর্শন, আমার কোনো হাত ছিলো না।' সুদর্শনের বুকের উপর ভেঙে পড়লেন কান্নায়।

'কী মুশকিল! হলো কী বলো দেখি?' উঠে বসল সে, মুখটা তুলে ধরলো অঞ্জলির।

'আমি ভীষণ একটা সত্য গোপন করেছি তোমার কাছে।'

'কী সত্য?'

'আমি—আমি—'

'অঞ্জু, সোনা, লক্ষ্মীমণি, কেন অমন করছো?'

'সুদর্শন, তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই।'

'তাই নাকি?' হেসে চুম্বন করল সে।

'তোমাকে ছাড়া আমি জানি না।'

'সাংঘাতিক আশ্চর্য খবর তো।'

'আমার হৃদয় মন শরীর সব একমাত্র তোমার, তোমার।'

'সোনামণি, তুমি শান্ত হও,' হাত বাড়িয়ে মাথার কাছের টেবিলের উপর প্যাকেট থেকে সে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালো, 'তুমি শান্ত হয়ে বলো তোমার কী হয়েছে।'

'আমি— আমি—'

'বলো।'

'যা হয়েছে তা আমার দোষে হয়নি, আমার ভাগ্য আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।'

'তোমার দোষ-গুণ সব নিয়েই তো তুমি, সব নিয়েই তো তুমি আমার, আমি তোমার। অঞ্জু, আমার কাছে তোমার কোনো দোষই দোষ নয়।'

অঞ্জলি বড়ো-বড়ো নিশ্বাসে বললেন, 'বিয়ের মাসখানেক আগে একজন আমাকে বলাৎকার করেছিল।'

'ক্‌কী!' খাড়া হয়ে বসলো সুদর্শন।

'আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারিনি সেই পশুশক্তি থেকে।'

'এ সব— এ সব তুমি কী বলছ।'

'আমি বলছি, আমি জানি না এই শিশু কার।'

'মানে?'

'আমার যদ্দিন বিয়ে হয়েছে, তার একমাস আগে থেকেই আমি —' চুপ করলেন অঞ্জলি দেবী। দাঁতের চাপে তাঁর ঠোঁট কেটে গেল।

সুদর্শন সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে সরে বসে বললো, 'তা হলে এতদিন কেন বলোনি সে কথা?'

'তোমাকে পেয়ে আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম। আমার সব দুঃখ মুছে গিয়েছিল। আমার নারীত্বের এই অসম্মানও আমার মনে ছিলো না।'

'ছিলো। ইচ্ছে করে বলোনি। ইচ্ছে করে লুকিয়েছ।'

সুদর্শনের চোখ মুখ সম্পূর্ণ অন্য চেহারা নিল। অঞ্জলির মুখের দিকে না-তাকিয়ে বললে, 'কী করে জানবো, সেটা তোমার স্বেচ্ছাকৃত নয়।'

'স্বেচ্ছাকৃত! কী আমার স্বেচ্ছাকৃত?'

'আমি বিশ্বাস করি না, কোনো অনিচ্ছুক মেয়েকে কোনো পুরুষ ততোদূর নিয়ে যেতে পারে—'

'ছি ছি!'

'তুমি আমাকে প্রতারণা করেছো। ঠকিয়েছো।'

॥ ১০ ॥

অঞ্জলি দেবীর চোখের জল তখন শুকিয়ে গিয়েছিলো, শুধু অন্তরে-বাইরে ভীষণ এক ঝড়ের দাপট তাঁকে নিয়ে লোফালুফি খেলছিলো। একটা অসহনীয় যন্ত্রণায় অনেকক্ষণ লুটিয়ে রইলেন মেঝেতে, তারপর আস্তে-আস্তে উঠলেন, আস্তে-আস্তে তিনিও কখন খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন পথে, একটা দমকা হাওয়া ঠাস করে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

কিন্তু কী আশ্চর্য। তার ছ সপ্তাহের মধ্যেই খুব সুন্দর এক সকাল তার সত্যের সমস্ত ঔজ্জ্বল্য নিয়ে প্রতিভাত হলো দার্জিলিং শহরে। দুঃখিনী অঞ্জলি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভাগ্যের পরিহাস উপলব্ধি করে। কিন্তু তখন আর কী বা করণীয় ছিল।

সেই নাটকে নেপাল ডাক্তারই সূত্রধর হয়েছিলেন। দেখা হবার পর থেকে তিনি প্রায় নৈমিত্তিক অতিথি হয়ে উঠেছেন তখন। কেননা, একজন মরণাপন্ন রোগীকে উপলক্ষ করে প্রত্যেক দিন তাঁকে আসতে হত কাকঝোরা। যাবার পথে অঞ্জলিকে হাঁক দিয়ে যেতেন। সব সময়েই হাতে করে কিছু-না-কিছু নিয়ে আসতেন, বলতেন, 'নাও ধরো, রোগীর বাড়ি থেকে দিয়ে গেছে।' ফলই আনতেন বেশি, মাঝে-মাঝে কেক বিস্কুটও আনতেন। অঞ্জলি সেই স্নেহের দান গ্রহণ না-করে পারতেন না। তারপর যতটা পারেন প্লেটে সাজিয়ে তাঁকেই বসে-বসে খাওয়াতেন। বাকিটা পাড়ার নেপালি বাচ্চাদের ভোগে লাগতো।

সেদিনও তেমনিই থলি-ভর্তি কী সব নিয়ে এসে হাঁক দিলেন, 'আমার মেয়ে কই গো?'

হাসিমুখে ঘর থেকেবেরিয়ে অঞ্জলি দেবী বললেন, 'আসুন, কাকাবাবু।'

'কেমন আছো, বলো আগে।'

'ভালো।'

'সেই কোমর-ব্যথাটা কমেছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'পায়ের ফোলাটা?'

'হ্যাঁ।'

থলিটা বাড়িয়ে ধরলেন, 'এই দ্যাখো এক রোগী কী মস্ত এক মাছ দিয়ে গেলো, বলছে জলপাইগুড়ি থেকে তাদের মেয়ে নিয়ে এসেছে। বললুম, আমি বাউল মানুষ আমাকে আবার এ-সব কেন? শোনে না। তারপর ভাবলুম যাকগে, আমারও তো মেয়ে জুটেছে একজন। যাই সেখানেই নিয়ে যাই। রাঁধো। সর্ষেটর্ষে দিয়ে খুব কটকটে করে রাঁধো। একটা বাঁধাকপি এনেছি, তরকারিটা আমি বান্নাব, দেখা যাবে কে কত পটু। আলগা উনুন আছে তো? আমাকে দাও, ধরিয়ে আনি। তারপর বাইরে রোদ্দুরে বসে রাঁধব। তোমার মনবাহাদুর দম্পতি কোথায়। ডাকো তাদের,

তারা দু'জনও আজ নিমন্ত্রিত। দিব্যি বনভোজন হয়ে যাবে একখানা।

ডাক্তারের এই রকম বনভোজনের বন্দোবস্তটা বোধহয় অঞ্জলির নীরন্ধ্র অন্ধকার জীবনে একটু আলোর রেখা এনে দেবার প্রায়াস! অঞ্জলি কৃতজ্ঞ বোধ করে।

রান্না করতে-করতে কথায়-কথায় সেদিনই আসল তথ্য উন্মোচিত হলো। নেপাল ডাক্তার পুরনো কথা বলতে খুব ভালোবাসতেন। যা স্মৃতি, তা-ই তখন তাঁর কাছে আদরণীয়। সেই রকমই কোনো স্মৃতিরোমন্থনের সূত্রে বললেন, 'আমি কিন্তু জানতুম না তুমি দ্বিজেনবাবুর প্রথম পক্ষের মেয়ে।'

অঞ্জলি বললেন, 'ও'।

'সেই যে তোমার অসুখ করলো, তোমার বাবা গিয়ে আমাকে ডেকে আনলেন, তখনই বুঝতে পারলুম এরই নাম বিমাতা।'

অঞ্জলি মাথা নিচু করে রইলেন।

'তুমি তো তখন অজ্ঞান, এসে দেখি প্রায় ঠাণ্ডা। নাড়ি নেই, প্রেশার নেই, চোখ দুটো মরা মাছের মতো শাদা, রক্তের ঢল বয়ে যাচ্ছে বিছানায়—'

'রক্ত?'

'সাংঘাতিক। বললুম, কোথাও পড়ে-টড়ে গিয়েছিলো কি? পেটে কি কোনো আঘাত লেগেছে? ওরে বাবা, তোমার মা মহিলাটি যেভাবে ফোঁস করে উঠলেন, আমি তো অবাক? দ্বিজেনবাবু লজ্জায় লাল। বললেন, চুপ করো, চুপ করো— কার কথা কে শোনে। সমানে চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'কেন চুপ করব? চুপ করে থাকলেই কি দোষ দোষ নয়? কোথায় তুমি দেখেছো, মেয়েরা রাত নটায় বাড়ি ফেরে! কোথায় ছিলো এত রাত পর্যন্ত শুনি? এসেই তো দেখলাম ঘরে গিয়ে শুলেন। আর চেহারা কী? বাপের জন্মে এমন দেখিনি। আমি রেগে গিয়ে বললুম, দেখুন আমি ডাক্তার, রোগীর উপর এখন সবচেয়ে বড়ো অধিকার আমার। দয়া করে আপনি অন্য ঘরে গিয়ে বিলাপ করুন। আমাকে ভাবতে দিন কী ভাবে এর জীবনরক্ষা হবে। তোমার বাবাকে বললুম, যদি মৃত্যু চান, সে আলাদা কথা, নইলে দয়া করে ছুটে গিয়ে আমার ডাক্তারখানা থেকে এই ওষুধ আর এই ইনজেকশন নিয়ে আসুন। ইমিডিয়েটলি এই হেমারেজ বন্ধ করা দরকার, নইলে কোনোরকমেই বাঁচানো সম্ভব নয়। তিনি অবশ্য খুব বিচলিত হলেন। হাজার হোক বাপ তো! শেষে কত কাণ্ড করে সেই হেমারেজ বন্ধ করা হল। তিন দিনের ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে তুমি প্রথম চোখ খুলে তাকাতে পারলে। পরে আমার মনে হয়েছিলো, তোমার বোধহয় অনিয়মিত হবার ধাত ছিল। তাদেরই অনেক দিন বাদে-বাদে হঠাৎ ওরকম হয়ে পড়ে। তাই কি?'

পলকহীন চোখে শুনতে-শুনতে ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন অঞ্জলি দেবী।

অস্ফুটে বললেন, 'হ্যাঁ, কাকাবাবু।'

'চিকিৎসা করাওনি কেন?'

এ-কথার জবার দিলেন না তিনি। তাঁর শরীর থেকে আস্তে-আস্তে সমস্ত ক্লেদের বোঝা যেন

গলে-গলে ঝরে পড়ছিল, তিনি মুক্তির স্বাদ অনুভব করছিলেন, অলৌকিকভাবে মনে হচ্ছিল, মাস্টারমশায় বুঝি সত্যিই তাঁর কুমারীত্ব এইভাবে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

তবে সেই তিনদিন কি তার এক মুহূর্তের জন্যও জ্ঞান ফিরে আসেনি? নইলে এত বড়ো ঘটনার একফোঁটাও মনে নেই কেন তাঁর?

সব জেনে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিলো সুদর্শনকে। চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করেছিল, 'সুদর্শন, এ-সন্তান তোমার, তোমার সত্যি তোমার। আমি ভুল বলেছিলাম।'

তারপরেই শক্ত হয়ে গেলেন। মনে হলো মাস্টারমশায় আমার শরীরের অবমাননা করেছেন, কিন্তু সুদর্শন আমার আত্মাকে অপমান করেছে। না, আমি তাকে কখনো-কোনোদিন ক্ষমা করবো না। না। না। না।

বালিশ ভিজে গিয়েছিলো চোখের জলে, বুক থেকে উঠে আসছিল শব্দ, 'তবু তুমি আছো, আছো, তোমার সন্তান হয়ে তুমি আছো আমার মধ্যে, এইখানে আমি জিতে গেছি তোমার ওপর। এই আমার শেষ সান্ত্বনা।

'আপনার ফোন।'

উদ্বিগ্ন হয়ে অঞ্জলি দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে গলির এ-মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, একটি বেয়ারা খবর নিয়ে এলো।

'আমার ফোন?' কেঁপে গেলেন তিনি, 'কোথায়?'

'আপিসরুমে।'

ব্যস্ত ব্যাকুল পায়ে ছুটে এসে রিসিভার কানে তুলে বললেন, 'হ্যালো। পুরন্দর?'

পুরন্দরের বদলে একটি ভারি সম্ভ্রান্ত গলা ভেসে এলো, 'অঞ্জলি?'

'ক্‌কে?'

'আমি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

'আমার সঙ্গে?'

'ছাব্বিশ বছর ধরে আমি এই দিনটিরই অপেক্ষা করছিলাম।'

'এ-সব কী বলছেন?'

'নীরবে নির্জনে অনেকবার মার্জনা ভিক্ষা করেছি, একবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে চাই ক্ষমা করো।'

'আমি—আমি তো এখানে কাউকে চিনি না।'

'পশুর মতো আচরণ করেছিলাম, প্রায়শ্চিত্তও অনেক করেছি, এবার একটু বিশ্রাম চাই।'

'কিন্তু আপনি, আপনি—'

'আমি সুদর্শন। আমার গলা তুমি বুঝতে পারছো না?'

'অঞ্জলি দাঁতে দাঁত আটকে বললেন, 'না।'

'হ্যাঁ, পারছো। আমি জানি, পারছো। আমি জানি, আমাকে তুমি ভোলোনি।'

কী আস্পর্ধা লোকটার! অঞ্জলি দেবীর ইচ্ছে করলো —কী ইচ্ছে করলো? না, তা তিনি

জানেন না। শুধু ফোনটা ছেড়ে দিতে গিয়েও হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভেবে পেলেন না জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে আছেন। জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখছেন, না কি সত্যিই ঘুমের স্বপ্ন।

'তোমার ছেলেটিকে আমি বারান্দায় বসিয়ে রেখে ফোন করছি।'

'আমার ছেলে?'

'তার নাম পুরন্দর। বলো, ঠিক কি না?

'পুরন্দর? পুরন্দর কী করছে ওখানে? কেন গেছে? কে তাকে নিয়ে গেলো?'

'ব্যস্ত হোয়ো না। সে নিজেই এসেছে।'

'আপনি অনুগ্রহ করে ফোনটা একটু দিন তাকে।'

'না। সেও যেমন তোমাকে লুকিয়ে এখানে এসেছে, আমিও তেমনি তাকে লুকিয়ে ফোন করছি।'

'কিন্তু কেন? কেন গেলো সে?'

'অধিকারের দাবি নিয়েই এসেছে।'

'আপনার সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক!'

'কিছু না। কিন্তু তুমি তো পিতা হিসেবে আমার নামই ব্যবহার করেছো দেখছি।'

সহসা একটা হিম প্রবাহ বয়ে গেলো অঞ্জলি দেবীর সারা শরীরে। সহসা মনে হলো, তাঁর নিজের যে-ভুলে তিনি যাবজ্জীবন নির্বাসিত হয়ে আছেন, সুদর্শন কি পিতা হয়ে তাঁর সন্তানের প্রতি আবার সেই ভুলের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নতুন করে সর্বনাশ করলো? প্রায় আর্তের মতো বলে উঠলেন, 'আপনি তাকে কী বলেছেন? কী বলেছেন?'

'কী তোমার মনে হয়?'

'ও ছাড়া আমার কেউ নেই, কিছু নেই, আমার সেই অবশিষ্ট আলোটুকুও কি আপনি শেষে নিবিয়ে দিলেন?'

'অঞ্জলি, তোমার ছেলেটি ভারি সুন্দর, আর সুকুমার। ওর মুখের আয়নায় কতোকাল পরে আমি তোমাকে দেখলাম। কতোকাল পরে।'

'শুধু আমাকে?'

'আর কাউকে আমি দেখতে চাই না। ও তোমার ছেলে সেটাই আমার কাছে বড়ো কথা।'

'আপনি কি নিজের ছায়াও দেখতে চান না?'

'তা আর কে না চায় বলো? হলে তো আমার ছেলেও হতে পারতো?'

'আপনি কি অন্ধ?'

'সেদিন আমি অন্যায় করেছিলাম, আমার পুরুষ নামের অযোগ্যতাই প্রমাণ করেছিলাম। অথচ কী এসে যায় বলো আজ তোমার ছেলে আমাকে তিরস্কার করতে এসেছে। তার মায়ের প্রতি অন্যায়ের তিরস্কার, সন্তানের প্রতি কর্তব্যহীনতার তিরস্কার। এর চেয়ে বড়ো প্রহসন আর কী হতে পারে—'

'আপনি কি তা অস্বীকার করেছেন!' অঞ্জলি দেবী ছটফট করে উঠলেন।

সামান্য এককোঁটা হাসি ভেসে এলো, 'ভয় পেয়ো না, আমি ততোটা ছোটো নই। তাছাড়া

আমার এই নিঃসঙ্গ নিঃসন্তান প্রৌঢ় জীবনে—'

'নিঃসন্তান!'

'এই যুবকটির অধিকারবোধ আমাকে অদ্ভুত এক নতুন জীবনের স্বাদ এনে দিয়েছে, হয়তো এর নাম বাৎসল্য। অঞ্জলি, যৌবনের ঈর্ষার বয়েস আমি পেরিয়ে এসেছি। জন্মদাতা না-হয়েও তোমার ছেলেকে আমি নির্দ্বিধায় নিজের ছেলে বলে ভাবতে পারছি।'

'কিন্তু—'

'কৈফিয়ত দিয়ো না। আমি জানি মেয়েদের উপর আমাদের এই বিচারবিবেকহীন সমাজ কী ভীষণ নিষ্ঠুর। একটি শিশুর পিতৃপরিচয় যে কতো জরুরি এদের কাছে তা আমার অজানা নেই। সুতরাং ছেলের কল্যাণ ভেবে আমার নাম ব্যবহার করাতে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ নেই আমার। কেনই বা থাকবে? আমাকে পিতা ভেবে যার হৃদয় অভিযোগে অভিমানে শতধা হয়ে যাচ্ছে, আমি ছাড়া তার পিতা আর কে হতে পারে?'

'হা ঈশ্বর!'

'ক্ষোভে দুঃখে হতাশায় জেদে আমার নিরপরাধ স্ত্রীকে কঠিন কথা বলে সেদিন আমি নিজেকেই আঘাত করেছিলাম। নইলে যে আমার প্রতি মুহূর্তের কামনার ধন, যাকে ছাড়া আমার সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, কেমন করে তাকে অত দুঃখ দিতে পেরেছি? আমি ভেবে দেখেছি সেদিনের সেই সত্য আমাদের কোনো মঙ্গলের রাস্তায় নিয়ে যায়নি। আমরা শুধু কাঁটার উপরে হেঁটে-হেঁটেই ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। তাই আজকের এই মিথ্যাকেই আমি শতগুণে শ্রেয় মনে করে—'

'মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়—' আপিস-ঘরের মস্ত কাউন্টারে থরথর করে উঠলো অঞ্জলির গলা 'কখনো কোনো মিথ্যের সঙ্গে আপোষ করে আমি এখানে এসে পৌঁছাইনি। আমার ছেলেকে আমি তার নিজের পিতার পরিচয়েই মানুষ হতে দিয়েছি—'

'কী বললে!'

'আপনি কি তাকাননি তার মুখের দিকে ? তার চুল, চোখ, হাত পা মাথা কিছুই কি চোখে পড়েনি আপনার? আপনি কি নিজের প্রতিমূর্তিও নিজে চিনতে পারেননি? আপনি একটা কী! আপনি একটা কী!'

'কী বলছো! কী বলছো! কী বলছো তুমি!' যেন একটা প্রচণ্ড ঢেউ গড়িয়ে এসে ফাটলো এপিঠে।

অঞ্জলি দেবী ঝুঁকে পড়ে রেখে দিলেন ফোন। তিনি আর পারছিলেন না।